নিজেকে দেখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

NIJEKE DEKHA

By Sunil Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৯

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯

মুদ্রাকর : দুলাল জানা। নিউ গঙ্গামাতা প্রিণ্টিং। ১৯ডি. গোয়াবাগান স্ট্রিট, কল-৬

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

অনেক দিন পর

১

ঘুম ভাঙলো বিউগ্‌লের শব্দে। চমকে ধড়মড় করে উঠে এলাম বিছানা থেকে। ঘড়িতে সকাল ছটা। জানলার কাচে প্রচুর আলো, পাহাড়-চূড়ায় তাড়াতাড়ি ভোর হয়। বিউগ্‌লের শব্দ শুনে প্রথমেই আমার মনে হল, তাহলে কি একটা মিছিল বেরিয়েছে? কাল বিকেল থেকেই বিরাট ধরনের কোনও জয়োল্লাস কিংবা গোলমালের প্রতীক্ষা কিংবা আশঙ্কা করছিলাম যেন। কিন্তু সে-সব কিছুই না। পাশেই একটা ইস্কুল, সেখানকার ছেলেরা এই সাত-সকালে বিউগ্‌ল বাজানো শিখছে, অন্যদিকে পাকদণ্ডি বেয়ে উঠে আসছে ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা। রাস্তায় শুরু হয়ে গিয়েছে লোক-চলাচল। সামনের জলাপাহাড়ে চলছে ঐরাবতের মতন মেঘেদের বপ্রক্রীড়া, আকাশে ঠাণ্ডা আলো, একটা শান্ত, স্নিগ্ধ সকাল। কিছুই অস্বাভাবিক নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে আছে মানুষ, এই প্রভাতের প্রসন্নতার সঙ্গে শিক্ষার্থী শিশুদের বিউগ্‌লের ফুঁ-ও একটুও বেমানান লাগে না। আজকাল সুসংবাদ বড় দুর্লভ। বরং বিপরীতটাই বেশি। প্রতিদিন বাড়ি ফেরার পথে মনে হয় বাড়ির সবাই ঠিকঠাক আছে তো? কিছু গণ্ডগোল ঘটেনি? প্রবাসে গেলেও গলায় কাঁটা ফোটার মত উৎকণ্ঠা থেকে যায় দেশের জন্য। আমি সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে গিয়েছিলাম, অনেকদিন খবরের কাগজ পড়িনি, ফিরে আসার পরই কয়েকজনের মুখে শুনলাম, দার্জিলিঙ-সমস্যা মিটে গিয়েছে! প্রথমে বিশ্বাস করতেই চাইনি। কোনও সমস্যাই কি মেটে? ছোট্ট কিংবা নিরীহ ধরনের কোনও সমস্যার বীজ রাষ্ট্রনায়কদের অবহেলায় দু-চার বছরে মহীরুহ হয়ে ওঠে, চতুর্দিকে তার ডালপালা ছড়াতেই থাকে, এই রকমই তো এখন চলছে ভারতবর্ষ জুড়ে। গত দু'বছরে আমাদের অনেকেরই মনে গভীর নৈরাশ্য দানা বাঁধছিল, মনে হচ্ছিল, আবার বুঝি বঙ্গভঙ্গ আসন্ন, দার্জিলিঙ কালিম্পঙের মতন সুন্দর শৈলশহর অনধিগম্য হয়ে যাবে। হঠাৎ এরই মধ্যে পাহাড়ি গোর্খাদের নেতা সুবাস ঘিসিং গোঁ ছেড়েছেন, তিনি পার্বত্য পরিষদ মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। তাহলে তো বোমা-বন্দুক, বিধ্বংসী আগুন আর কুকরির ঝলসানি থেমে যাওয়ার কথা। যারা দাবি আদায়ের জন্য প্রাণ দিচ্ছিল

কিংবা অন্যের প্রাণ নিচ্ছিল, তারা কি খুশি হয়েছে? সেইসব দেখার কৌতূহলেই দার্জিলিঙ ছুটে আসা।

শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে প্রথমে খটকা লেগেছিল। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে, দু' চারটি মাত্র সরকারি কিংবা সিপাহিদের গাড়ি বিপরীত দিক থেকে আসছে, পথচারীও বিশেষ চোখে পড়ে না। অথচ আগে যতবার এসেছি, এই রাস্তায় প্রচুর যানবাহন ও মানুষজন দেখেছি। ফাঁকা রাস্তা গাড়ি চালাবার পক্ষে সুবিধেজনক, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে ঝলমল করছে গাছপালা, দু পাশে ফুটে আছে অজস্র বুনোফুল, কিন্তু সে সৌন্দর্যের দিকেও বেশিক্ষণ আকৃষ্ট হতে পারি না। মানুষ মানুষকেই ভয় পায়, আবার মানুষ মানুষকেই চায়।

কার্শিয়াঙের কাছাকাছি এসে দৃশ্য বদলে গেল। বেশ কিছু গাড়ি যাওয়া-আসা করছে, বাস ভর্তি মানুষ, জিপ কিংবা ট্রেকারে ভর্তি যুবকের দল, দোকান-পাট সব খোলা। মনে হল যেন, সমতলের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও ততটা স্বাভাবিক না-হলেও পাহাড়ি এলাকার মধ্যে জীবন-যাপনের ব্যস্ততা ঠিকই চলছে। ছোট রেল প্রায় এক বছরের বেশি বন্ধ, তাই ট্যাক্সি-ট্রাকে গাদাগাদি করে অনেককে যেতে হচ্ছে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে।

চা খাওয়ার জন্য থামা হল কার্শিয়াঙ ট্যুরিস্ট লজে। চমৎকার কাঠের বাড়িটি, টেবিলের পাশেই অনেকখানি চোখ জুড়োনো নিসর্গ। বছর তিনেক আগে পর্যটন দফতরের কর্তাদের সঙ্গে আমরা কয়েকজন এসেছিলাম এখানে। উপরতলায় রেস্তোরাঁ। নীচের তলায় রাত্রিবাসের জন্য কক্ষ। এই নবনির্মিত লজটি নিয়ে পর্যটন দফতরের বেশ গর্ব ছিল। শোনা গেল, আন্দোলনের তীব্রতার সময় এই বাড়িটিকে পুড়িয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু একেবারে রাজপথের উপরেই বলে সেটা সম্ভব হয়নি। এখনও বালির বস্তার আড়ালে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে এক রাইফেলধারী সৈনিক। দিনকাল এমনই পড়েছে যে, কোথাও চা খেতে গেলেও রাইফেল-বন্দুক দেখতে হয়। তাতে চায়ের স্বাদ একটু কমে যায় না?

রেস্তোরাঁটি পরিচ্ছন্ন কিন্তু ফাঁকা। আর একটিমাত্র টেবিলে যে ব্যক্তিটি বসে আছেন, তিনি স্থানীয় এস ডি ও, আমার সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পরিচয় নেই, কিন্তু আমার সহযাত্রী তাপস মুখার্জিকে দেখে তিনি উঠে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তরুণ বয়স্ক অবাঙালি এই রাজপুরুষটির চেহারায় এখনও কলেজীয় যুবকের আদল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির চেয়েও তিনি কাছাকাছি এক জায়গার বিরাট ধসের ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন। তবু

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা এসেই যায়। তাপসবাবুর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, জঙ্গি জি এন এল এফ নেতা ঘিসিং যুদ্ধং দেহি মনোভাব ছেড়ে হঠাৎ পার্বত্য পরিষদ গঠনের প্রস্তাবে রাজি হলেন কেন? রাজপুরুষটি হেসে বললেন, দ্যাট ইজ আ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন!

আমার যাত্রা শুরু। কার্শিয়াঙের আগে ও পরে বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা বেশ খারাপ, কয়েকদিন আগেও ধসের জন্য এই রাস্তা বন্ধ ছিল, এখনও মেরামতির কাজ চলছে, দু-এক জায়গায় গাড়ি চলে বেশ সন্ত্রস্ত ভাবে। এক জায়গায় রাস্তার মাঝখানে বেশ বড় একটা গর্ত, তাপসবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি মৃদু গলায় বললেন, মাইন পোঁতা ছিল। কয়েক জায়গায় এ রকম মাইন বিস্ফোরণ হয়েছে।

তাপস মুখার্জি একজন শান্ত ধরনের সাহসী মানুষ। তাঁর জন্ম দার্জিলিঙে। তিন পুরুষ ধরে এই শহরে বাস, নেপালি বলতে পারেন মাতৃভাষার মতন, তবু এই আন্দোলনের মধ্যে তাঁকে একবার প্রায় মৃত্যুমুখে পড়তে হয়েছিল, এক শীতের রাত্রে একদল উগ্রপন্থী গোর্খা তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে চোখ বেঁধে নিয়ে যায়, তারপর শেষ পর্যন্ত তিনি কিভাবে রক্ষা পেলেন, সে এক রোমহর্ষক কাহিনী, কিন্তু তাপসবাবু সে ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চান না, এখনও পাহাড়ের যত্রতত্র তাঁর অবাধ গতি। দার্জিলিঙের কাছাকাছি এসে আবার মনে পড়ল, এই শহরে আমি শেষবার এসেছিলাম উনিশশো পঁচাশি সালে, দার্জিলিঙ শহর স্থাপনের দেড়শো বছর পূর্তি উৎসবে যোগ দিতে। সে বার লেখক ও সঙ্গীত-শিল্পীদের একটি বড় দল এসেছিল, উৎসবে গোর্খা লেখক ও শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সে বারে আমরা ঘিসিংকে দেখিনি, সে-রকম কোনও আন্দোলনেরও চিহ্ন ছিল না, তবে কী রকম যেন একটা আলগা আলগা ভাব ছিল, গোর্খা লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের আড্ডা হল না, বন্ধুত্ব হল না। আমাদের দিক থেকেই কোনও ত্রুটি হয়েছিল? আমরা দার্জিলিঙে অতিথি, সেখানকার অধিবাসীরাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এটাই রীতিসম্মত নয় কি? পরে শুনেছিলাম, সেই উৎসবে সমতলের লোকদের যোগ দেওয়াটাই নাকি গোর্খারা অনেকে পছন্দ করেননি। এটা একটা অদ্ভুত কথা!

সেই সময়েই সমরেশ বসু অসুস্থ হয়ে পড়লেন হঠাৎ। অসম্ভব মনের জোরে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠে নিজের পায়ে হেঁটেই দু-দিন বাদে বেরিয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে। মাত্র এই তো সেদিনের কথা। এখন আর তিনি

নেই, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সে বারে দার্জিলিঙে প্রচণ্ড ভিড় দেখেছিলাম। ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির কাছে দার্জিলিঙ-কালিম্পঙ বরাবরই অবশ্য দ্রষ্টব্য, গ্রীষ্মকালে ও পুজোর ছুটিতে শুরু হত দার্জিলিঙ-অভিযান। ইদানীং শীতে-বর্ষাতেও আনাগোনা শুরু হয়েছিল। আমি একবার জানুয়ারি মাসেও এসে যথেষ্ট পর্যটক দেখেছি, শুধু সাহেব-মেমরাই নয়, বাঙালিরাও ঠাণ্ডা বাতাস ভালোবাসতে শিখেছে। বর্ষাকালেও পাহাড়-বনরাজি বড় নয়নাভিরাম। এক একবার দার্জিলিঙে এসে এত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে যে মনে হত, তা হলে আর দার্জিলিঙে এলাম কেন, গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিলেই হত! ম্যালের শৌখিন পোশাক পরা জনতাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

এ বার সেই ম্যাল পুরোপুরি ফাঁকা। বসবার বেঞ্চিগুলো সব কটাই উধাও। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিসের সামনে অনেকবার বোমাবাজি হওয়ার খবর শুনেছি, এখন সেখানে দু'জন জলপাই-রঙের পোশাক পরা প্রহরী নিথরভাবে দণ্ডায়মান। খানিকটা দূরে একটা গাছতলায় প্রায় গাছেরই সঙ্গে মিশে আছে চার-পাঁচজন বি এস এফ-এর জওয়ান। দু-জন মাত্র ঘোড়াওয়ালার মধ্যে একজন নিজেই নিজের ঘোড়া চালিয়ে এল এক পাক। খদ্দের না পেলেও ঘোড়াদেরও তো ব্যায়াম দরকার। দোকানগুলি খোলা, কিন্তু অন্য বারের মতন কেউ ডাকাডাকি করছে না আমাদের, কেউ চোখে চোখ ফেলছে না, কথা বলছে না একটাও। কী ব্যাপার, এরা কি এখনও আমাদের শত্রুপক্ষ মনে করছে নাকি? ম্যাল থেকে ঘড়ি-গম্বুজ পর্যন্ত হেঁটে এলাম একবার। রাস্তার পাশে সোয়েটার, শাল, টুপি খেলনাপাতি সাজিয়ে পসারী-পসারিণীরা বসে আছে ঠিকই, কিন্তু কেউ আমাদের সম্ভাব্য ক্রেতা হিসাবে গ্রাহ্যই করল না।

স্থানীয় অধিবাসীরা কেউ কেউ যাতায়াত করছে ম্যালের উপর দিয়ে, নিঃশব্দে। যেন কথা বলা নিষিদ্ধ। চারদিকে একটা থমথমে ভাব। স্বতন্ত্র গোর্খাল্যাণ্ডের বদলে দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য পরিষদ পেয়ে এরা অখুশি? তার কোনও প্রকাশ্য চিহ্ন এখনও দেখিনি। মধুর অভাবে গুড় পেয়েও সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে? দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি কতদিন লোকে সহ্য করতে পারে! কিন্তু সাধারণ মানুষ মুখ খুলতে রাজি নয় মনে হচ্ছে।

কফি-তেষ্টা মেটাতে স্টেপ অ্যাসাইডের দিকের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। বাইরের চত্বরে কয়েকজন বৃদ্ধ ও অন্যান্য নারী পুরুষ নিজেদের মধ্যে কী যেন কথা বলছিলেন, হঠাৎ থেমে গেলেন আমাদের দেখে। চেয়ে

রইলেন আমাদের মুখের দিকে। কোনও প্রশ্ন নয়, কোনও মন্তব্যও নয়। এতে খানিকটা অস্বস্তি লাগে, আমরা কি এখানে অবাঞ্ছিত? দোকান খুলে রেখেছে, যে-কেউ তো সেখানে আসতে পারে। কিন্তু খদ্দের দোকানে ঢুকলে সামান্য অভ্যর্থনাও করবে না? একজনের চোখে চোখ রেখে সরাসরি প্রশ্ন করলুম, কফি মিলেগা? তিনি নিস্পৃহভাবে বললেন, হাঁ, মিলেগা!

দোকানের ভিতরে আর কেউ নেই। আমরা জানলার ধারে টেবিলে বসার পর কাউন্টার থেকে একটি কিশোর উঠে এল। ভাবলেশহীন মুখ। যেন সে কিছুতেই হাসবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। তাকে কফি এবং কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার বুঝিয়ে দেওয়ার পর সে যেন হঠাৎই অসাবধানে বলে ফেলল, ঠিক আছে। ঠিক হ্যায় বলেনি, ঠিক আছে! তার মুখে এই সামান্য বাংলা শুনেই যেন গলে গেলাম একেবারে! সে অবশ্য বিল মেটাবার সময় টিপ্সের পয়সাটা গ্রাহ্যও করল না, টেবিলের উপরেই পড়ে রইল প্লেটে।

সারাদিন দার্জিলিঙ শহরে ঘোরাঘুরি করার পর মনে হল, এখানকার অবস্থা স্বাভাবিকই তো হয়ে গিয়েছে। সর্বত্র যাওয়া-আসার কোনও অসুবিধা তো নেই। একটা যে থমথমে ভাব দেখছি, সেটা অনেকটাই হয়ত আমার কল্পনা। পার্বত্য পরিষদ নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে কেউ কোনও উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে না বটে, তা তো হতেই পারে, এর ফলাফল কী হবে, তা বুঝে নেওয়ার সময় নিচ্ছে।

সন্ধেবেলাতেই খবর পাওয়া গেল, চকবাজারে দুটি দোকান লুট হয়েছে।

২

ঘুম পর্যন্ত এসে আমরা ওপরের রাস্তা ধরলাম টাইগার হিলের দিকে। ছেলেবেলায় ঘুম নামটি শুনলেই একটা অদ্ভুত আবেশ বোধ হতো। ছোট ট্রেনে আসতে আসতে আমরা স্টেশনের নামগুলি মুখস্ত রাখতাম এইভাবে ছড়া বানিয়ে। কার্শিয়াঙ-টুং, সোনাদা-ঘুম! সেই ট্রেনের লাইনে এখন মর্চে পড়ে গেছে, ঘুম স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে গুচ্ছের সি আর পি। এক ঝাঁক পায়রার মতন হঠাৎ বৃষ্টি এসেই আবার উড়ে চলে গেল।

টাইগার হিলের রাস্তা বিষম খাড়াই, গাড়ি উঠছে গোঁ গোঁ শব্দ করে। জোড়-বাংলোর পর জনবসতি আর নেই বললেই চলে। দু'একটি বাড়ির সামনে কর্মরত নারী পুরুষরা মুখ ফিরিয়ে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছে। রাস্তার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে কাঠকুড়ানি কামিনরা, যেন অনেকদিন তারা

কোনও গাড়ি দেখেনি। আমাদের দার্জিলিঙ শহরের বাইরে কিছুটা ঘোরাঘুরির প্রস্তাবে তাপস মুখার্জি প্রথমে একটু খুঁত খুঁত করছিলেন, চিন্তিত ছিলেন আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে, শেষ পর্যন্ত নিজেই মত বদল করে জোগাড় করে আনলেন গাড়ি। এখানে বৃষ্টিতে সদ্য স্নান করা দু'পাশের সবুজ বনানীর মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধতা রয়েছে, এমন একটা শান্তির ভাব যে, কোনও বিপদের কথা মনেই আসে না।

একদিন আগেই সন্ধেবেলা দুটি দোকান লুঠ এবং কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে গুম করার কথা শোনা গেলেও পরদিন সকালবেলা আবার দোকান-বাজার ঠিকই খুলেছে, সব কিছুই আপাত স্বাভাবিক। কপালে সবুজ ফেট্টি বাঁধা জি এন এল এফ-এর যুবা কর্মীদের যেমন অনেক জায়গায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়, সেইরকমই তারা নাকি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দাম কেউ বেশি বাড়ালে সেই সব দোকানদারদের শাসায়, ধরে নিয়ে গিয়ে চড়-চাপাটি দেয়, কিছু কিছু লুটপাটও হয়। সেইসময় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছু কিছু চরিত্র অরাজকতার সুযোগ নিয়ে পেশী ও কুকরির প্রদর্শন করতে পারে, লোকজন ভয়ে দৌড়োদৌড়ি করে। তবু, এই সব ছোটখাটো বিপদের পটভূমিকাতেও জীবনের স্রোত থেমে থাকে না।

অবশ্য এরকম দু'একটি ঘটনার কথা আমি শুনেছি মাত্র, চোখে দেখিনি।

টাইগার হিলে আমি কখনও বিখ্যাত সূর্যোদয় দেখতে যাইনি। তবে একটা রাত্রি কাটিয়েছিলাম ওখানকার চমৎকার টুরিস্ট বাংলোতে। বছর তিনেক আগের কথা। সেবার সঙ্গে ছিলেন কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এবং পর্যটন কর্পোরেশনের ডিরেক্টর আদিনাথ ভট্টাচার্য। জানুয়ারি মাস, আকাশ ঝকঝকে নীল, পাহাড়গুলি যেন নিজেদের দৈর্ঘ্যের চেয়ে দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। এখানকার টুরিস্ট লজে ম্যানেজারের নাম তামাং, তিনি একজন প্রাক্তন সৈনিক, রাত্তিরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসে হাত সেঁকতে সেঁকতে তিনি আমাদের অনেক ভূতের গল্প শোনালেন। ওরকম শীতের রাতে ভূতের গল্পই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। ভোর হবার আগেই প্রকৃতি প্রেমিক সমরেন্দ্র ছুটলেন খানিকদূরের প্যাভিলিয়নে চড়ে আকাশের লাল বলটি লাফিয়ে ওঠার দৃশ্য দেখার জন্য, ফিরে এসে ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি একটি গম্ভীর-সুন্দর কবিতাও লিখে ফেললেন, আমি অবশ্য তখনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি। সেবারে ঐ টুরিস্ট লজে বেশ কিছু নেপালি

ছেলেমেয়ে দেখেছিলাম। ওরা সূর্যোদয়ের দেশের মানুষ, তাই বুঝি অন্য দেশে এসেও ওরা সূর্য দেখার সুযোগ ছাড়ে না।

আমাদের গাড়ি যখন টুরিস্ট বাংলোর দিকে বাঁক নিচ্ছে, তখন দেখি টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। সে সম্ভবত আমাদের গাড়িটাকে পুলিশের গাড়ি ভেবেছিল। টুরিস্ট বাংলোটি দেখেই আমি একবার চোখ বুজলাম। ঘটনাটি আগেই শোনা ছিল, তবু স্বচক্ষে দেখার অভিঘাত অনেক তীব্র হতে বাধ্য। সেই টুরিস্ট লজটি এখন ভূতপূর্ব টুরিস্ট লজ। কিছুদিন আগে সেটিকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার কঙ্কাল। এখানে দমকল আসার প্রশ্নই ওঠে না বোধ হয়, তাই আগুন তার ইচ্ছে মতন বাড়িটাকে খেয়েছে, শুধু পাথরের দেয়াল-গুলি হজম করতে পারেনি। ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না, এখানে যে বাড়ি-টিতে আমি থেকে গেছি, কত গল্প, কত হাস্য পরিহাস হয়েছে, এখনও তার পারিপাশ্বর্ব একই রকম রয়েছে। শুধু বাড়িটি নেই। সামনের বারান্দাটা ছিল পুরো কাচে ঢাকা, তার ওপর নানা রকম প্রজাপতি ও পতঙ্গ এসে বসতো, এখন চতুর্দিকে ছড়ানো কাচের টুকরো। পাথরের খাঁচাটার একটা অংশে আঙুল দেখিয়ে আমি বলি, ঐ যে, ঐ ঘরটায় আমরা শুয়েছিলাম। সেটাকে ঘর বলে চেনার কোনও উপায় নেই। রাশি রাশি কাপ-প্লেট অর্ধেক ভাঙা হয়ে পড়ে আছে। যারা আগুন দিয়েছে, তারা লুট করতে আসেনি, ধ্বংস করতেই এসেছিল।

স্বাতী দুঃখিতভাবে প্রশ্ন করলো, এমন সুন্দর বাড়িটি ওরা পোড়ালো কেন? গোর্খাল্যান্ড হলেও তো বাড়িটা ওদেরই কাজে লাগতো। আবার ওদেরই তো এখানে নতুন বাড়ি তৈরি করতে হবে।

আমি ও তাপস চুপ করে রইলাম। এইসব প্রশ্নের উত্তর হয় না। কলকাতায় একসময় যখন তখন ট্রাম-বাস পোড়ানো হতো কেন, পঞ্জাবের উগ্রপন্থীরা কেন নিরীহ বাসযাত্রী বা পুজা প্যান্ডেলের লোকজনদের হত্যা করছে? আমাদের দেশে প্রতিবাদের ভাষাই হলো হিংসা এবং ধ্বংস।

কাছেই ফুটে আছে অজস্র ঘাস ফুল। দু'তিনটি অতি শিশু ছাগল ছানা তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। অদূরের ঝাউবনে শোনা যাচ্ছে বাতাসের শব্দ, কী অপূর্ব উজ্জ্বল আজকের সকালটি। দগ্ধ বাংলোটির দিকে পেছন ফিরে আমরা চিরকালীন সুন্দরকে দেখি।

দার্জিলিঙ শহরের মধ্যেই সার্কিট হাউস এবং একটি পি ডবলু ডি-র বাংলো ঝলসানো অবস্থায় রয়েছে। ঘুরতে ফিরতে সার্কিট হাউসটিকে

কয়েকবার দেখেছি। আর দার্জিলিঙ জেলায় মধ্যে দূরে দূরে অনেকগুলি বাংলো, যেখানে পুলিশ সহজে পেঁছোতে পারে না। সেগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেরকম আর একটি বাংলোও দেখতে গেলাম।

দার্জিলিঙ শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে, মিরিকের পথে একটি জায়গায় নাম লেপচা জগত, (আসল নাম নাকি লাপচে জগত) সেখানকার বাংলোটি ব্রিটিশ আমলের। দুর্গম পাহাড়ে একটা চিত্তহারী স্থান খুঁজে বার করার কৃতিত্ব ছিল সাহেবদের। একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এই বাংলোটি এমনই এক জায়গায়, যার সামনে উপত্যকা, বিপরীত দিকে দেখা যায় পুরো দার্জিলিঙ শহর, আরও দূরে কালিম্পং ও সিকিম। এখানেও আমি আগে এসেছি একাধিকবার। এই বাংলোটি সম্পর্কে একটা কাহিনী আছে। একবার এক ইংরেজ এই বাংলোতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে যান, সর্বক্ষণই বৃষ্টি পড়ছিল, এমন একটানা বৃষ্টি তিনি আগে কখনও দেখেননি। বাংলোর ভিজিটার্স বুকে তিনি সেই বৃষ্টির বর্ণনা লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর তাঁর ছেলে এসেছিলেন এখানে। পুরনো খাতা উল্টেপাল্টে তিনি তাঁর বাবার লেখাটা দেখতে পান। সেই লেখার নীচে পুত্র তাঁর মন্তব্য লিখলেন, ফাদার ইট ইজ স্টিল রেইনিং হিয়ার।

ফায়ার প্লেসের চিমনি দুটি ছাড়া এই বাংলোর আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। ধ্বংসকারীরা চৌকিদারদের ঘরগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। শুধু এক কোণে রান্নাঘরটি কোনওক্রমে অবশিষ্ট আছে। সামনের চত্বরে একজন প্রৌঢ় টাঙ্গির মতন একটা অস্ত্রে ধার দিচ্ছিল। তার পাশে কয়েকটি বাচ্চা কাচ্চা আর একটি লোমশ কুকুর। আমাদের দেখে সে টাঙ্গিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে। সে আসলে একজন নিরীহ লোক, এই প্রাক্তন বাংলোটির চৌকিদার। বাংলোটি আর না থাকলেও তার চাকরিটি তো আছে, তাকে এখানে ডিউটি দিতেই হবে। কিন্তু বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে তার এখানে থাকার খুবই কষ্ট, কোনক্রমে রান্না-ঘরটিতে মাথা গুঁজে আছে। সে কথা বলার লোক পায় না, আমাদের কাছেই তার অভিযোগ জানিয়ে কিছু প্রতিকার চাইল। হায়, আমরা শুধু দর্শকমাত্র!

গাড়িটাকে দূরে রেখে আমরা বনপথ দিয়ে অনেকটা হেঁটে এসেছিলাম, ফেরার পথে একবার মনে হলো, হঠাৎ যদি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গোটা চার পাঁচেক মানুষ আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে কী হবে? জায়গাটা অসম্ভব নির্জন বলেই এরকম গা ছমছমে কল্পনা মাথায় আসে। কিন্তু সেরকম

কোনও ঘটনা ঘটলো না। তবু আমি বলবো, রাজনৈতিক ভাবে হামলা বন্ধ হলেও এখনই চট করে কারুর ঐ লেপচা জগত বন-বাংলোর দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না, গুণ্ডা-বদমাসের উপদ্রব তো হতেই পারে।

এ কথা ঠিক, অনেকের মুখেই শুনেছি, আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনও নেতাদের নির্দেশ ছিল সাধারণ মানুষ, বাঙালি অবাঙালিই কারুকেই মার-ধোর, খুন জখম করা চলবে না। লড়াই হয়েছে জি এন এল এফের সঙ্গে পুলিশ ও সি আর পির। এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দল সি পি এমের সঙ্গে। পাহাড় অঞ্চলে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন বলা যেতে পারে। সি পি এম কর্মীদের অদম্য সাহস ও আদর্শের জোরের প্রশংসা শুনেছি সর্বত্র। প্রায় সব গোর্খাই যখন সুবাস ঘিসিং-এর দলের সমর্থক, তখনও যে-সব গোর্খা সি পি এম দল ছাড়েনি, তারা সামাজিক ভাবে ধিক্কৃত হয়েছে, বাঙালির পা-চাটা কুকুর বলে অনেকে তাদের গায়ে থুতু দিয়েছে। কেউ কেউ খুনও হয়েছে, তবু তারা অনমনীয় থাকতে পেরেছে।

দার্জিলিঙে গত বছর দু'এক ধরে কোনও টুরিস্ট আসে না। বন্ধের জন্য, ধসের জন্য পর্যটকেরা নানা রকম অসুবিধেয় পড়েছে বটে, কিন্তু তাদের ওপর কোনও আক্রমণ হয়নি কখনও। সুবাস ঘিসিং-এর জনপ্রিয়তার একটা প্রধান সূত্রই হলো বাঙালি-ই বিরোধিতা। বাঙালিদের নামে ছড়ানো হয়েছে প্রচুর ঘৃণা, কিন্তু তাঁর দলে যে শৃঙ্খলা আছে তা মানতেই হবে। দার্জিলিঙের স্থানীয় বাঙালি কিংবা কাজের বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর কোনও শারীরিক অত্যাচার করা হয়নি, কোনো বাঙালিকেই দার্জিলিঙ ছেড়ে যাবার হুমকি দেওয়া হয়নি।

শুধু, কিছুদিন আগে স্থানীয় এক বাঙালি যুবককে কয়েকটি নেপালি ছেলে এসে কুপিয়ে মারে, তার বৃদ্ধ বাবা বাধা দিতে এলে তাকেও খুন করা হয়। এই নৃশংস কাণ্ডটি ঠিক কী কারণে ঘটেছিল, তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেও পাইনি।

৩

ম্যালে কয়েকজন ছাত্রর সঙ্গে দেখা। দার্জিলিঙ সরকারি কলেজের বাঙালি ছাত্র, বছর তিনেক ধরে এখানে আছে, আন্দোলনের পুরো চেহারা-টাই তারা দেখেছে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম তারা কাছাকাছি জলপাই-গুড়ি-শিলিগুড়ি থেকে এসেছে, কিন্তু সেরকম উল্লেখ করতেই তারা জানালো না, না, আপনাদের সাউথ বেঙ্গল থেকেও অনেকে আসে, কলকাতা, সোদপুর, চুঁচুড়ো···। আমি যে সাউথ বেঙ্গলের লোক বা কলকাতা নগরীটি সাউথ বেঙ্গলে, তা এতদিন খেয়াল করিনি। আমরা কথায় কথায় উত্তরাঞ্চলকে বলি নর্থ বেঙ্গল, সুতরাং সাউথ বেঙ্গলও তো থাকবেই। আমরা যেমন বলি বম্বে মেল, তেমনি বম্বের লোকেরাও একটা ট্রেনকে বলে ক্যালকাটা মেল, এটা প্রথমবার শুনে খুব অবাক লেগেছিল। ছাত্ররা সাহিত্য বিষয়ে উচ্ছ্বাস দেখাতে চাইলেও আমি তাদের প্রথমেই প্রশ্ন করি, এই গণ্ডগোলের মধ্যে তোমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি তো? তারা সকলেই একবাক্যে জানাল যে তাদের কোনও বিপদে বা ঝামেলায় পড়তে হয়নি। তবে লম্বা লম্বা বন্ধের সময় কলেজ বন্ধ থেকেছে পড়াশুনোর কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে কখনও কোনও আশঙ্কা ঘটেনি। অবশ্য সন্ধে ছ'টার পরে তারা পারতপক্ষে কেউ রাস্তায় বেরোয় না। একজন হাসতে হাসতে বলল, আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর এমন কড়া ডিসিপ্লিন চাপিয়েছি যে আমাদের বাবা-মায়েরাও এতটা আশা করতে পারবেন না, সন্ধের পর আর কিছুই করার থাকে না বলে আমরা শুধুই পড়াশুনো করি।

ক্লাস ধরবার তাড়া ছিল বলে ওরা চলে গেল। ওদের কাছ থেকে খবর পেয়ে আরও একদল ছাত্র বিকেলবেলা দেখা করতে এল হোটেলে। তাদের দাবি, তাদের মেসে একবার যেতে হবে। আমারও আড্ডায় অনুৎসাহ নেই। হস্টেলে থাকার বদলে বাঙালি ছাত্ররা ছোট ছোট দল করে বিভিন্ন জায়গায় মেস বানিয়ে আছে। ঘর ভাড়া-এখন সুলভ। অধিকাংশ হোটেল বন্ধ হয়ে আছে, সেই সব হোটেলের মালিকরা সাগ্রহেই ছাত্রদের মাসিক হিসেবে ঘর ভাড়া দিতে রাজি, ছাত্ররা নিজেরাই রান্নার ব্যবস্থা করে নেয়।

পরের দিন সেই মেসবাড়ির আড্ডায় গিয়ে দেখি কয়েকটি ছাত্রীও এসেছে। তারা অবশ্য হস্টেলেই থাকে। ছাত্রীরা নিজের উদ্যোগে আলাদা মেস করে

থাকার মানসিকতা সারা দেশেই কোথাও এখনও আসেনি বোধহয়। এই ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্ন, খোলামেলা ব্যবহারে কিছুক্ষণ বেশ সুন্দর সময় কাটল, যদিও আড্ডা-গল্প-কবিতা পাঠের মাঝে মাঝে সমসাময়িক সংকটের কথা এসেই পড়ে। একটি ছেলে বেশ জোরাল গলায় গোর্খা আন্দোলনের সমর্থনে একটি কবিতা শোনালো। এই আন্দোলনকে সে বিপ্লব আখ্যা দিয়েছে। তার টগবগে যৌবনদীপ্ত চেতনা কাছাকাছি আর কোনও বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে সম্ভবত এটাকেই আঁকড়ে ধরতে চায়।

কলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কেউ কেউ পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি সমর্থন করেছেন, দু এক জায়গায় দেওয়ালে বাংলো-ইংরাজিতে উগ্র ঘোষণাও দেখেছি। সুবাস ঘিসিং কি সে কথা জানেন না? না হলে তিনি কলকাতায় আসতে ভয় পান কেন? ভয় কিংবা লজ্জা কিংবা অবজ্ঞা, যাই হোক, শ্রীযুক্ত ঘিসিং কলকাতাকে এড়িয়ে চলেন, ঘুরিয়ে নাক দেখাবার মতন তিনি দিল্লি যাবার জন্য আর পাঁচ জায়গা ছুঁয়ে যান কিন্তু কলকাতায় পা দেন না। কলকাতা শহরে তিনি জীবনে কখনও এসেছেন কি না সে সম্পর্কেও কেউ নিশ্চিত নয়। গত সপ্তাহে মনে হয়েছিল, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, ঘিসিং কলকাতায় এসে হিল কাউন্সিলের চুক্তিতে সই করে দেবেন। তিনি দিল্লি থেকে চলে এলেন কিন্তু কোথায় গেলেন তা জানা যায়নি প্রথম দিন। তারপর শোনা গেল তিনি কলকাতায় না পৌঁছে পাটনায় বসে আছেন। পাটনাতেই যখন এলেন, তখন দার্জিলিঙ ফিরলেন না কেন? এই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা। সাধারণ মানুষ যেন আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না, কবে সই হবে? কবে সই হবে?

সমতলের একটা ভুল ধারণা দার্জিলিঙে এসে ভাঙল। কলকাতায় অনেকেই বলাবলি করে যে দু বছর ধরে দার্জিলিঙে কোনও টুরিস্ট যাচ্ছে না। এরপর আর কত দিন আন্দোলন চালাবে? না খেয়ে মরবে যে! অথচ দার্জিলিঙে দেখছি, একটা-দুটো টুরিস্ট পেলেও তাদের সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের কোনও আগ্রহ নেই। পর্যটক না আসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হোটেল-ওয়ালা আর দোকানদারেরা, তারা কেউ স্থানীয় নেপালি নয়। ধনী ব্যবসায়ীদের নানাদিকে ডালপালা ছড়ানো থাকে, দু তিন বছরে তারা কুপোকাত হয় না। ঘোড়াওয়ালা ও কুলিশ্রেণীর লোকরা এক জায়গায় কাজ না পেলে অন্য জায়গায় চলে যাবে সর্বত্রই দিনমজুরদের যা নিয়তি। তা ছাড়া রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তারা কোনও ক্রমেই পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং টুরিস্টরা এসে

হঠাৎ নবাবি ভাব দেখিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয় বলে তাদের ওপর শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের খানিকটা বিরক্তির ভাব থাকারই কথা। কলকাতার বাঙালিবাবুরা পাহাড়ে গিয়ে সমস্ত গোর্খা-নেপালিদেরই দারোয়ান শ্রেণী মনে করে বহুকাল ধরে অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করেছে, সে কথাও তো ভুললে চলবে না।

এখন ওখানকার কোনও কলেজের এক তরুণ গোর্খা লেকচারার যদি উগ্রভাবে পৃথক গোর্খাল্যান্ড দাবি করেন, তা হলে তিনি টুরিজমের ব্যাপারে তোয়াক্কা করবেন না, কারণ এতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। বরং গোর্খাল্যান্ড স্থাপিত হলে যখন চাকরি-বাকরিতে গোর্খাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হবে, কলেজের উঁচু পদ থেকে বাঙালিরা সরে যাবে, তখন তিনিই হয়ে যেতে পারেন হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট কিংবা প্রিন্সিপাল! এর সঙ্গে জাতীয়তাবাদের মাদক তো আছেই!

দুপুরবেলা খেতে বসে পাশের টেবিলে এক বাঙালি দম্পতিকে দেখতে পাই, তাদের সঙ্গে একটি বারো-তেরো বছরের কিশোর। কিশোরটির প্যান্ট-শার্টের সঙ্গে টাই, পরিপাটি চুল আঁচড়ানো, তার বাবা-মা তাকে বেশি বেশি খাবার দিচ্ছেন। একটি বাৎসল্যের ছবি, বোর্ডিং স্কুলে পড়া সন্তানকে দেখতে এসেছেন জনক-জননী। স্কুলগুলি আবার খুলেছে বলে তাঁরা খুশি। অন্য একটি টেবিলে এক যুবতী তার শিশুকে জোর করে খাওয়াচ্ছে ফ্রুট স্যালাড, দুরন্ত শিশু বারবার টেবিল ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়। যুবতীটির স্বামী সমতলের একজন ব্যাঙ্ক অফিসার, বিশেষ করে তাঁকে আসতে হয়েছে দার্জিলিঙ, স্বামীকে তাঁর পত্নী একলা ছাড়তে চাননি। দার্জিলিঙে বহিরাগত বলতে প্রধানত এই ধরনের মানুষই। বিদেশী পর্যটকও চোখে পড়ে না বিশেষ। আমি তো ঘুরে ফিরে একটি শ্বেতাঙ্গ দম্পতিকেই দেখতে পাচ্ছি। এরই মধ্যে এক ফাঁকে একবার দেখতে গিয়েছিলাম ঘুম-এর তিব্বতি মন্দিরটি। সেখানকার ভিজিটারস বুকটা দেখলাম কৌতূহলবশত, গত চার দিনে পাঁচ জন মাত্র দর্শনার্থীর নাম, তার মধ্যে একটি বিদেশীর এবং বাকিদের মধ্যে কেউ বাঙালি নয়। এই বিখ্যাত মনাস্টারির এমন দশা। আমি অল্প বয়েসে বয়েজ স্কাউট হিসেবে এসে-ছিলাম এখানে, তারপর অনেকবার দার্জিলিঙ ঘুরে গেলেও ঘুমে আসা হয়নি। ছেলেবেলায় এই মনাস্টারিটিকে যেন আরও বিরাট, আরও অনেক রহস্যময় মনে হয়েছিল। কেন যে ছেলেবেলার সেই চোখটা হারিয়ে যায়।

এক সন্ধেবেলা একটি নেমন্তনের আসরে ডাক পেয়ে গেলাম দৈবাৎ।

বেশ কিছু সরকারি অফিসার সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী সেখানে উপস্থিত এবং তাঁদের অনেকের স্ত্রী। রীতিমতন একটা পার্টি, কিন্তু সেখানে একজনও নেপালি-গোর্খা নেই। দেখে খটকা লাগে। নেপালি-গোর্খাদের সঙ্গে অন্যদের সামাজিক মেলামেশা কি একেবারেই বন্ধ? বিচ্ছেদ কি একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে? ফাটল আর কোনও দিন জোড়া লাগবে না? চরম গন্ডগোলের মধ্যেও বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখানে নির্বিঘ্নে রয়ে গেছেন, তাঁদের কারুর কারুর অভিমত এই যে গোর্খা হিল কাউন্সিল হচ্ছে এই আন্দোলনের জয়ের প্রথম ধাপ। এরপর ওরা আলাদা রাজ্য না নিয়ে ছাড়বে না। এবং সেই সম্ভাবনায় এদের যে কিছু অসুবিধে ঘটবে, তাও মনে হলো না।

এই আসরেই দেখা হয়ে গেল ডি আই জি রমেশ হান্ডার সঙ্গে। এর নাম ও বীরত্বের কাহিনীগুলি শুনলে মনে মনে ছবি তৈরি হয় এক জবরদস্ত পুলিশ সাহেবের, দশাশই চেহারা, বেড়ালের ল্যাজের মতন গোঁফ, চোখে কটমটে দৃষ্টি, গলায় বজ্রের আওয়াজ। আদতে ইনি একজন নম্র, লাজুক ধরনের মানুষ চাপা গলায় কথা বলেন। গোঁপ-টোপ কিছু নেই, মুখ-চোখে কোনও টেনশানের ছাপও নেই। বলাই বাহুল্য, ইনি একজন অসম-সাহসী পুরুষ। সংকটের সময় ইনি নিজেই বহু অভিযান পরিচালনা করেন, একবার সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েও একটুও নিরুদ্যম হননি, তাঁর চলাফেরাও নিয়ন্ত্রিত হয়নি। হান্ডার সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ পূর্ব পরিচয় ছিল, আমরা পাশাপাশি বসে গল্প করলাম বেশ খানিকক্ষণ, দার্জিলিঙ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললাম না, সর্বক্ষণ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ওঁর নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না। আমারও তেমন মাথাব্যথা নেই। আমরা অন্যান্য গল্প, চেনা লোকদের ঘটনা নিয়ে হাস্য-পরিহাস করলাম প্রাণ খুলে।

এক সময় পার্টি ছেড়ে আমি চলে এলাম বাইরে। কাচের জানলার ওপাশে রাতের দার্জিলিঙ ঈষৎ ঝাপসাভাবে দেখা যায়। নিঃশব্দে সরু সরু বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে মিটিমিটি আলো। কোথাও কোনও শব্দ। এই শহরে আরও অনেকবার আসব নিশ্চয়ই। গোর্খারা নিজস্ব হিল কাউন্সিল গঠন করে এই অঞ্চলের উন্নতি করুক, স্থানীয় লোকদের প্রাধান্য স্থাপিত হোক, সে তো খুব ভাল কথা, কিন্তু বাঙালি মানস থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না। এবার মেঘ-বৃষ্টির জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে দেখা হল না, পরের বার দেখা হবে।

সত্যের আড়ালে

১

রজতের সঙ্গে ঊর্মি'র যেদিন প্রথম পরিচয় হয়, সেদিনটার কথা আমার আরও স্পষ্ট মনে আছে। আমিই রজতকে ডেকে এনেছিলাম।

ঠিক এক বছর তিন মাস সতেরো দিন আগে। আমার চোখের আড়ালে জ্বল জ্বল করছে বিকেলটা। ঠিক বিকেল নয়, সন্ধ্যে গড়িয়ে এসেছে প্রায়। তখনও অন্ধকার নামে নি; চতুর্দিকে সূর্যাস্তের লাল আভা।

ঊর্মিকে নিয়ে গিয়েছিলাম গঙ্গার ধারে। ঊর্মি বছর তিনেক ছিল না, ওর দাদা সুকোমল ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিল দিল্লীতে, বিরাট কোয়ার্টার পেয়েছিল। শেষের দিকে দিল্লীতে ঊর্মি হঠাৎ খুব অসুখে পড়ে। দু'মাস প্রায় ভুগলো, আমি দেখতেও গিয়েছিলাম একবার।

অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর ঊর্মি'র চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে টাইফয়েড-এর পর কিছুদিন যত্ন করে নিয়ম-কানুন মানলে এ রকম হয়। কলকাতায় যখন আবার ফিরে এলো, তখন ওকে দেখে মনে হয়েছিল নতুন ঊর্মি।

আউটরাম ঘাট ছাড়িয়ে স্ট্যাণ্ডের এই দিকটায় ঊর্মি অনেক দিন আসে নি। সেখানে দাঁড়িয়ে ঊর্মি ঘোষণা করলো, কলকাতায় এই জায়গাটার মতন এত সুন্দর জায়গা দিল্লীতে কোথাও নেই। ঊর্মি দিল্লীতে থাকতে কলকাতার অনেক নিন্দে শুনেছে, এমন কি বাঙালীরাও আপসোস করে বলতো, নাঃ কলকাতাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একেবারে। ঊর্মি প্রথম প্রথম খুব তর্ক করতো, তারপর এক সময় নিরাশ হয়ে ভেবেছিল, হয়তো এই তিন বছরে কলকাতা সত্যি বদলে গেছে।

এখন কলকাতাকে ওর নতুন করে ভাল লাগছে। বার বার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলছিল, এত বড় একটা নদী আর কোন্ শহরের পাশে আছে বলো তো? নদীর ধারে দাঁড়ালেই ভালো লাগে। এই যে এ রকম হু হু করে হাওয়া—

হাওয়ায় উড়ছিল ঊর্মি'র চুল আর আঁচল। ওর কথাগুলো গানের মতন ঝংকারময় লাগলো। ঊর্মি'র শরীর থেকে চমৎকার একটা সুগন্ধ ভেসে আসে। হঠাৎ ঊর্মি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, বিভাসদা, তুমি কখনো গঙ্গাসাগরে গেছ?

আমি বললাম, না তো। কেন?

উর্মি বললো, এখান থেকে নৌকোয় চেপে সোজা গঙ্গাসাগরে যাওয়া যায়? নিশ্চয় যাওয়া যাবে, গঙ্গা তো এখান থেকেই সোজা গিয়ে সাগরে পড়েছে।

আমি একটু হেসে বললাম, যাওয়া যাবে না কেন, তবে অনেকদিন সময় লেগে যাবে। তার চেয়ে নামখানা পর্যন্ত বাসে গিয়ে ওখান থেকে নৌকায় কিংবা লঞ্চে—

আমাকে নিয়ে যাবে?

কেন হঠাৎ গঙ্গাসাগরে যাবার শখ কেন? তীর্থ করতে নাকি?

না, না, তীর্থ ফির্থ নয়। গত বছর দিল্লী থেকে আমরা সবাই হরিদ্বারে গিয়েছিলাম। ঠিক হরিদ্বারে থাকি নি, আমরা ছিলাম লছমনঝোলার একটা ধর্মশালায়। সেখান থেকে আমি জেদ ধরেছিলাম গঙ্গোত্রীতে যাবো। শেষ পর্যন্ত দাদা যেতে বাধ্য হলো।

তাই নাকি? কেমন লাগলো?

দারুণ! অনেকটা আমরা পায়ে হেঁটে গেলাম—কেন, তোমাকে আমি লছমনঝোলা থেকে চিঠি লিখেছিলাম, মনে নেই?

হাঁ, মনে আছে।

তুমি যদি তখন চলে আসতে পারতে—

আমার যে আর একটা খুব জরুরী কাজ ছিল।

তোমার খালি কাজ আর কাজ! হ্যাঁ শোনো, যা বলছিলাম, গঙ্গোত্রী দেখার পরই আমার মনে হয়েছিল, গঙ্গার প্রায় উৎপত্তিস্থানটা যখন দেখা হলো, তখন এর সাগর-সঙ্গমের জায়গাটাও একবার দেখবো। কলকাতার এত কাছে, তবু আমাদের দেখা হয় না—

গঙ্গাসাগরে যাওয়া যেতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়।

তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? কথা দাও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাবো।

না, কথা দাও আগে।

কথা দিচ্ছি। এ আর এমনকি!

দারুণ ব্যাপার হবে তা হলে। এত বড় একটা নদী, এর জন্মস্থান থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা…তাও তো আমরা গোমুখী পর্যন্ত যাই নি—

আমি উদার ভাবে বললাম, ঠিক আছে, আর একবার আমরা গঙ্গোত্রী গোমুখীর দিকে যাবো। আমার তো ঐ দিকটা দেখা হয় নি।

আমরা কথা বলছিলাম সিমেণ্টের রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ ধরেই খেয়ার নৌকো-ঘাটের কাছে একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলাম। আস্তে আস্তে সেখানে ভিড় জমছে। শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত কথাবার্তা।

ঊর্মি জিজ্ঞেস করলো, ওখানে কি হচ্ছে? এত চ্যাঁচামেচি কেন?

আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঐ যে একজন লম্বা মতন ভদ্রলোক, উনিই তখন থেকে ধমকাচ্ছেন দেখছি।

কোন লম্বা ভদ্রলোক?

ঐ যে, দেখতে পাচ্ছো না? দারুণ লম্বা।

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, আরেঃ!

ঊর্মি জিজ্ঞেস করলো, কি হলো?

ও তো রজত।

তোমার চেনা?

আমি খুব ভাল করে চিনি ওকে। ও যেখানেই যায় সেখানেই গণ্ডগোল করে।

গোলমালটা আরও বেড়ে গেল। সম্ভবত মারামারি হবার উপক্রম। আমি ঊর্মিকে বললাম, তুমি একটু দাঁড়াও তো, আমি দেখে আসছি, এক্ষুণি আসছি।

কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, রজত একজন মাঝির গেঞ্জিটা চেপে ধরেছে, তার সাথে একজন রোগা চেহারার যুবক তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে, আর একটি মেয়ে লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে। এদের ঘিরে অনেক মানুষ, তারা মজা দেখছে।

আমি রজতকে কোনোক্রমে সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনলাম। রজত কিছুতেই আসবে না, মাঝিটা অনেকবার ক্ষমা চাওয়ায় সে একটু ঠাণ্ডা হলো।

রজতকে ওপরে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলাম ঊর্মির সঙ্গে।

দুজনে ভদ্রতাসূচক নমস্কার করলো। কয়েক বছর দিল্লীতে থেকে ঊর্মি অনেক বেশী সপ্রতিভ হয়েছে। রজত আমার দিকে ফিরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঊর্মি তাকে বললো, আপনি বুঝি যেখানেই যান সেখানেই মারামারি করেন?

রজত একটু চমকে গিয়ে বললো, এ কথা বলছেন কেন? আমার চেহারা দেখে গুণ্ডা টুণ্ডা মনে হয় নাকি?

ঊর্মি ফুরফুরে হেসে বললো, খুব একটা অবিশ্বাসও করা যায় না।

রজতের খুব পছন্দ হল না কথাটা। আমি জানি, নিজের চেহারা সম্পর্কে রজতের বেশ দুর্বলতা আছে। সাধারণ বাঙালীদের তুলনায় সে বেশ লম্বা, খুব একটা রোগাও নয়—সেই জন্যই যে কোন ভিড়ের মধ্যে তার চেহারাটাই বেশী চোখে পড়ে। এইরকম চেহারা থাকলে আমি খুব গর্বিত হতাম, কিন্তু রজত লজ্জা পায়। যার যে জিনিসটা আছে, সে সেটা বেশী পছন্দ করতে পারে না। রজতের ধারণা, বেশী লম্বা হওয়ার দরুন, লোক ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে। যে চেহারার লোককে সুপুরুষ বলা হয় রজতের চেহারা তার চেয়েও একটু বেশী বড়, অনেকটা পাশ্চাত্ত্যদেশীয়দের মতন।

রজত বললো, হয়তো গণ্ডগোলই আমাকে তাড়া করে। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই কিছু না কিছু একটা হয়।

ঊর্মি জিজ্ঞেস করলো, এখানে কি হয়েছিল ?

রজত বললো, এই যে নৌকোর মাঝিরা আছে না, এরা বেশীর ভাগই নিরীহ ভাবের মানুষ—কিন্তু দু'একজন আছে দারুণ শয়তান। আমি এদের সবাইকেই চিনি।

আপনি কি করে সবাইকে চিনলেন ?

আমি নৌকোর মাঝিদের নিয়ে একটা ইউনিয়ন তৈরী করার চেষ্টা করেছিলাম এক সময়। সেই সূত্রে—

আমি রজতের কথার মাঝখানেই ঊর্মিকে বললাম, তোমার কাছে রজতের পুরো পরিচয় দেওয়া হয়নি। রজত একজন সাংবাদিক, তাছাড়া আবার রাজনীতি করার দিকে ঝোঁক আছে। ওর একটা মোটরবাইক আছে, সেটা নিয়ে চারদিকে টো-টো করে ঘোরে। এত জোরে চালায় মোটরবাইকটা—

ঊর্মি বললো, এত সুন্দর জায়গা, এখানে ইউনিয়ন কিংবা গণ্ডগোল একদম ভালো লাগে না। আপনি বুঝি ওখানে ইউনিয়ন পাকাতে গিয়েছিলেন ?

রজত একবার হাসলো, বললো, না, আজকের ব্যাপারটা অন্য রকম। অনেক সময় ছেলেরা মেয়েরা এখানে নৌকোয় করে গঙ্গায় বেড়াতে যায়। একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চায় আর কি, এর মধ্যে দোষের তো কিছু নেই।

ঊর্মি বললো, নৌকোয় চেপে প্রেম, বেশ ভালই তো!

রজত বললো, যদি শুধু একটা ছেলে আর একটা মেয়ে যায়, আর ছেলেটি যদি একটু দুর্বল ধরনের হয়, তাহলে, দু'একটা শয়তান মাঝি নদীর মাঝখানেতে নৌকো নিয়ে গিয়ে তাদের ভয় দেখায়।

কি ভয় দেখায় ?

নানা রকম আজেবাজে কথা বলে। বেশী টাকা চাওয়ার ফন্দী আর কি।

আজকেও বুঝি তাই হয়েছিল ?

হ্যাঁ, ছেলেটি আর মেয়েটি ফিরে এসে নালিশ করছিল অন্যদের কাছে, মেয়েটি তো দারুণ ভয় পেয়ে গেছে—মাঝিটা উল্টে ওদের নামে এমন খারাপ খারাপ কথা বলতে লাগলো—এই রকম করলে আর কেউ কি নৌকোয় চাপতে রাজী হবে এখানে ?

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম। এবার বললাম, এই রকম কাণ্ড হয় নাকি ? বাবাঃ। আমিই তো একটু আগে ভাবছিলাম ঊর্মি'কে নিয়ে একটু নৌকোতে বেড়াবো।

ঊর্মি' তৎক্ষণাৎ বললো, চলো না, যাই।

আর না বাবাঃ! এই রকম কাণ্ড যদি হয়।

রজত বললো, তোমরা যেতে পারো। গোলমাল করলে দুই ধমক দিয়ে দেবে।

না থাক, আজ আর দরকার নেই।

আরে ভয় পাচ্ছ নাকি! চলো, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

রজত একটু জোর করতে লাগলো, আমি তাকে এড়িয়ে গেলাম। রজতটা বেরসিক। আমি ঊর্মি'কে নিয়ে নৌকোয় বেড়াতে চাই, তার মধ্যে কি আর তৃতীয় ব্যক্তির স্থান থাকে ?

আমি একটু ঠাট্টা করে রজতকে বললাম, তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে ? একলা একলা কেউ গঙ্গার ধারে বেড়াতে আসে, এমন তো কখনো শুনি নি।

আমি এসেছিলাম অন্য কারণে। ঐ জাহাজটায় যাবো—

রজত হাত দিয়ে জাহাজ দেখিয়ে দেয়। জাহাজটার সর্বাঙ্গে আলো জ্বলছে, জলে পড়েছে তার ছায়া। হঠাৎ জাহাজটাকে একটা রূপকথার দৃশ্য বলে মনে হয়। কি একটা দুর্বোধ্য ভাষায় জাহাজটার নাম লেখা।

আমি রজতের কথা শুনে হেসে উঠলাম, আমি জানি, রজত যখন তখন এ রকম বানিয়ে বানিয়ে অদ্ভুত কথা বলে।

রজত কিন্তু গম্ভীর থেকেই বললো, হাসলে কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?

ঊর্মি'ও হাসছিল। রজত বললো, আমি সত্যিই ঐ জাহাজটায় যাবো, ওখানে আমার এক বন্ধু কাজ করে।

আমি বা ঊর্মি তখনও বিশ্বাস করি নি। আমাদের চেনাশুনা জগতের কেউ গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসে বিদেশী জাহাজে ওঠে না।

ঊর্মি'র দিকে ফিরে রজত জিজ্ঞেস করলো, যাবেন ?

ঊর্মি তৎক্ষণাৎ বললো, চলুন।

ঊর্মি'র কথায় যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুর ছিল। রজত প্রায় জোর করেই আমাদের নিয়ে গেল ঘাটের কাছে। একটা নৌকো ভাড়া করলো। জাহাজটার পাশে এসে রজত আগে একা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। আমরা নৌকোতে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ডেকে দু'জন নাবিক দাঁড়িয়ে ছিল, রজত তাদের সঙ্গে কি যেন কথা বললো একটুক্ষণ। তারপর সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললো, আমার চেনা সেকেণ্ড অফিসার মিঃ জেঙ্কিন্স এখন নেই, তিনি শহরে গেছেন। কিন্তু তোমরা ওপরে এসে জাহাজটা দেখে যেতে পারো, আসবে ?

শুধু শুধু একটা জাহাজ ঘুরে দেখতে রাজী হবে, এ রকম মফস্বলেপনা ঊর্মি'র নেই। সে মাথা নেড়ে বললো, থাক, দরকার নেই।

রজত দু'একবার পেড়াপেড়ি করলো, কিন্তু ঊর্মি রাজী হলো না। নেমে এলো রজত।

ঊর্মি বললো, নৌকোতে উঠেছিই যখন তখন একটুক্ষণ ঘুরি।

রজত বললে, বেশ তো!

আমি আপত্তি করলাম। গ্রীষ্মকাল, আকাশ মেঘলা। আকাশের চেহারা ভালো নয়।

আমি বললাম, না, এখন আর নৌকোয় চড়ে দরকার নেই। চলো। ফিরি বরং।

রজত আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কেন, যাবে না কেন ?

ঝড় উঠতে পারে।

ঝড়, তা উঠুক না ? ঝড় উঠলে কি হবে ? তুমি কি ভাবছো নৌকো উল্টে যাবে ?

কেন, যায় তো মাঝে মাঝে।

রজত হেসে উঠে বললো, আরে তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি ? তুমি সাঁতার জানো না ?

ঊর্মি'ও আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই বিভাসদা, তুমি বুঝি নৌকোয় চাপতে ভয় পাও ?

আমি একটু হেসে চুপ করে গেলাম। ঊর্মি'র কথাটাতে আমার মনে

একটু আঘাত লেগেছে। আমি কি নিজের জন্য ভয় পাচ্ছি? ঊর্মি সাঁতার জানে না, হঠাৎ যদি একটা বিপদ টিপদ হয়ে যায়। আমি পাঁচ ছ' বছর বয়েস থেকেই সাঁতার জানি, এমনকি স্রোতের গঙ্গাও আমার কাছে বিপজ্জনক নয়।

রজত বললো, তোমার ভয় নেই, বিভাস। নৌকো যদি উল্টেও যায়, আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁচাতে পারবো। আমার লাইফ সেভিং-এর সার্টিফিকেট আছে।

রজত ধরেই নিয়েছে, আমি সাঁতার জানি না; এক একজন আছে, যারা নিজের সম্পর্কে সব কথা বেশ অনায়াসে বলে ফেলতে পারে। আমি পারি না।

সন্ধ্যেটা সত্যি বড় মনোরম ছিল। একটু জোরে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ার স্পর্শ ঠিক মাখনের মতন কোমল। চাঁদ ওঠে নি, ঠিক যেন বৃষ্টির মতন ঝির ঝির করে অন্ধকার নামছে।

রজত কি একটা গান গাইছিল গুণ গুণ করে। হঠাৎ এক সময় সেটা থামিয়ে সে ঊর্মিকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি গান জানেন না? একটা গান করুন না!

ঊর্মি বললো, না, আমি গান জানি না। বিভাসদা ভালো গান করতে পারে। বিভাসদা, একটা গান গাও না।

রজত বললো, বিভাসের গান আমি শুনেছি। আপনার গান শুনতে চাই।

আমি সত্যি গান জানি না।

যা জানেন, তাই করুন।

আমার গলায় সুরই আসে না।

কিন্তু নদীর ওপারে একটা নৌকোবক্ষে একজন নারীর গানই মানায়। তা ছাড়া ঊর্মির মতন একজন সপ্রতিভ মেয়ে গান জানে না, এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সুতরাং রজত পেড়াপীড়ি করতে লাগলো। যদিও আমি জানি, ঊর্মির গলায় টনসিল অপারেশনের পর ঠিক সুর আসে না, তবে ও সেতার বাজাতে পারে।

নিরাশ হয়ে রজত নিজেই একটা গান ধরলো। বেশ দরাজ গলা ওর। প্রবল হাওয়ার মধ্যেও পাল্লা দিতে পারে। যদিও সুর একটু কম। তা হোক, তবু ওই রকম জায়গায় এরকম খোলামেলা গলার গানই মানায়। কি যেন ছিল সেই গানটা? হ্যাঁ সেটাও মনে আছে, রজত গেয়েছিল, দেখা না দেখায় মেশা হে, হে বিদ্যুৎলতা, কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কি ব্যাকুলতা···

২

ঊর্মি'র সেই যে শখ গঙ্গা যেখানে মিশেছে সেই জায়গাটা দেখা—এটা সে সেদিন রজতের সামনেও বলেছিল কিনা আমার ঠিক মনে নেই। প্রসঙ্গক্রমে উঠতেও পারে। বিশেষত নৌকোতে বেড়াবার সময়। তা হলে এর পরবর্তী ঘটনাকে নিতান্ত আকস্মিক বলা যায় না।

রজত এর পর মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি এসেছে। দু তিনবার দেখা হয়েছে ঊর্মি'র সঙ্গে। ঊর্মি আমাদের বাড়ি প্রায় রোজই আসে। ওর দাদা সুকোমলের সঙ্গে আমি ইস্কুল থেকে একসঙ্গে পড়েছি। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বহুদিনের চেনা। সুতরাং ঊর্মি আমাদের বাড়িতে আসবে, এর মধ্যে কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচের ব্যাপার নেই। ঊর্মি'কে আমি বিয়ে করবো, এটা চার-পাঁচ বছর আগেই ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির লোকেরাও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু কেউ কোন উচ্চবাচ্চ করে নি। তার কারণ, আমাদের জাতের অমিল। আমাদের বা ঊর্মি'র পরিবারটা খুব গোঁড়া না হলেও জাতের সংস্কারটা এখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। ভিন্ন জাতের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক করতে নিজে থেকে এগিয়ে আসতে পারবে না। ভাবখানা এই, আমি আর ঊর্মি যদি জোর করি তা হলে ও'রা মেনে নেবেন।

আমার ঠিক পরের বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আগামী মাসেই তার বিয়ের তারিখ। ওর বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত আমি নিজের বিয়েটা পিছিয়ে দিয়েছি। এটাই সবদিক থেকে ভালো দেখায়।

ঊর্মি'কে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলেছি, তোমার তো পরীক্ষা টরীক্ষা হয়ে গেছে, হাতে কোনো কাজ নেই, দেখো যেন ঝট করে অন্য কারুকে বিয়ে-টিয়ে করে বসো না!

ঊর্মি'ও ঠাট্টা করে উত্তর দিয়েছে, আমি যে আর একদিনও অপেক্ষা করতে পারছি না। আমি যে মরে যাচ্ছি একেবারে!

একদিন আমি একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলাম। সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। ফাঁকা বাড়ি, এই সময়ে ঊর্মি এসে উপস্থিত। বুকের মধ্যে ছমছম করে ওঠে।

ঊর্মি'র জন্য কখনো আমাকে লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয় নি। কখনো

প্রয়োজন হয় নি লুকিয়ে দেখা করার কিংবা অন্যদের মিথ্যে কথা বলার। ওকে যে-কোনো সময় আমি টেলিফোন করেছি কিংবা চিঠি লিখেছি, বাড়ির লোকেরা সবই জানে। ঊর্মি'র অসুখের সময় যে আমি ওকে দিল্লীতে দেখতে গেলাম—সে ব্যাপারেও কেউ কোন প্রশ্ন করে নি। এটা যেন আমার অধিকার।

কিন্তু ফাঁকা বাড়িতে মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। ঊর্মি'কে চুমু টুমু খেয়েছি অনেকবার, বেশী এগোই নি কখনো। সেদিন বুকের মধ্যে ঝড় বইতে লাগলো, কিংবা ঠিক ঝড় নয়, কি যেন একটা বুকের মধ্যে থেকে ফেটে বেরোতে চাইছে।

আমি ঊর্মি'কে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, ঊর্মি' আমি তোমাকে দেখতে চাই।

ঊর্মি' আমার ঘাড়ের কাছে ঠোঁট রেখে দুষ্টুমিভরা গলায় বলেছিল, উঁহু।

আমি ওর গলা, বুক ও কোমর আচ্ছন্ন করে দিলাম চুমোতে। ঊর্মি' প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠলো। শারীরিক আদরে ঊর্মি' যতখানি আনন্দ পায়, ততখানি বাইরেও প্রকাশ করে। রেখে-ঢেকে রাখে না। তা ছাড়া আমার কাছে ওর লজ্জা দেখাবারও কোনো কারণ নেই। শরীরের মধ্যে যে আনন্দ আছে, তার এক বিন্দুও নষ্ট করতে চায় না ঊর্মি'। ও নিজেই ওর ব্লাউজের কয়েকটা বোতাম খুলে আমাকে বলেছিল, তুমি এই খানটায় মুখ রাখো, আমাকে খুব জোরে ধরো—

পাশেই বিছানা। ঊর্মি'র কোমরে আমার হাত, আর একটা হাত ওর শাড়ীর আঁচলে। ইচ্ছে করলে এক্ষুণি আমরা চরম আনন্দে মেতে উঠতে পারি।

ঊর্মি'কে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েও আমি থেমে গেলাম। হঠাৎ মনে হলো, কোনা বাধা যখন নেই, তখন এত তাড়াতাড়ির কি আছে? এটা তো শুধু আনন্দের ব্যাপার না, এটার মধ্যে যেন অনেক পবিত্রতাও রয়েছে। আর বড়জোর দু'মাস বাদেই তো বিয়ে হবে—এ ব্যাপারটা সেদিনের জন্য তোলা থাক।

আসলে তখন আমি প্রচণ্ড নির্বোধ ছিলাম। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি সেদিন।

ঊর্মি' প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিল, তবু আমি তাকে বললাম, ইস্, আর

একটু হলে কি করে ফেলেছিলাম! না, না, এখন থাক—সব জমা থাক সেই দিনটার জন্য—

ঊর্মিও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, বিভাসদা, তুমি কি ভালো! আমাকেও তোমার মতন ভালো করে দাও না! আমি যদি কখনো কোনো ভুল করতে যাই, তুমি আমাকে সাবধান করে দিও। দেবে তো?

আমি বলেছিলাম, আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালো করবো। আরো অনেক অনেক বেশী ভালো।

যাক, রজতের কথা বলছিলাম। রজতের সঙ্গে ঊর্মির খুব ভাব হয়ে গেল, এতে আমার ঈর্ষার কোনো কারণ নেই। ভালোবাসা মানে বন্ধন নয়। আমি ঊর্মিকে কক্ষনো সম্পূর্ণ আঁকড়ে ধরতে চাই নি—ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছের মূল্য দিয়েছি সব সময়, ওকে খোলামেলা থাকতে দিয়েছি।

রজত খুব ভদ্র ছেলে। মাঝে মাঝে উল্টো-পাল্টা মিথ্যেকথা বলে, হৈ চৈ চেঁচামেচি করতে ভালবাসে, কিন্তু কখনো অসঙ্গত কিছু করে না। বন্ধুত্ব, স্নেহ, মমতা—এই সবের মূল্য দেয়। ওর চেহারাটা যেমন বড়, তেমনি ওকে দেখলেই মনে হয়, ওর প্রাণশক্তিও যেন অনেক বেশী। ওর মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আছে—যারা হিমালয়ে উঠেছে কিংবা হেঁটে মরুভূমি পার হয়েছে কিংবা ডুব দিয়ে সাগরের তলায় নেমেছে, রজত যেন সেই সব মানুষের দলে।

রজত একদিন এসে বললো, ও ওদের কাগজের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় যাচ্ছে।

ঊর্মি তখন উপস্থিত ছিল। শুনেই তো লাফিয়ে উঠলো। ছেলেমানুষের মতন বলতে লাগলো, আমিও যাবো, আমিও যাবো—

রজত বললো, চলুন না—

মেয়েরা যেতে পারে?

কেন পারবে না?

তাহলে আমি ঠিক যাবো। আমাকে নিয়ে যাবেন?

আমি হাসতে হাসতে রজতকে বললাম, তুমি নিয়ে যাও না ওকে। ওর খুব গঙ্গাসাগর দেখার ইচ্ছে।

ঊর্মি আমার দিকে ফিরে ভ্রূ কুঁচকে রাগের সঙ্গে বললো, তার মানে? তুমি যাবে না?

মেলার সময় দারুণ ভিড় হবে যে!

হোক না ভিড়।

অত ভিড়ের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন, তোমাকে বলেছি তো, আমি একবার নিয়ে যাবো—

কেন? এখন যাবে না কেন? এখন বেশ সবাই যাচ্ছে।

রজত বললো, অন্য সময় যাওয়ার খুব সুবিধে নেই। এখনই বরং অনেক লঞ্চ, স্টীমার কিংবা স্পেশাল বাস যায়—

ঊর্মি বললো, আমরা স্টীমারে যাবো, সেই বেশ মজা হবে।

রজত আমাকে বললো, চলো না, দেখে তোমারও ভালো লাগবে।

আমি বললাম, কিন্তু ওখানে থাকা হবে কোথায়? হোটেল টোটেল আছে?

রজত হাসলো। তারপর বললো, সে সব নেই অবশ্য। তুমি বড়লোক মানুষ, তোমার একটু অসুবিধে হবে অবশ্য।

রজতের এই এক দোষ, আমাকে মাঝে মাঝেই বড়লোক বলে খোঁচা দেয়। আমাদের পরিবারের অবস্থা সচ্ছল, আমি একটা ভালো চাকরি করি—এটা কি আমার দোষ? আমরা কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা বলেই আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ি আছে। রজতের বাড়ি নেই, কিন্তু আজকাল সাংবাদিকরাও তো ভালোই মাইনে পায়। রজত কাজ করে সবচেয়ে নাম-করা ইংরেজী কাগজে।

আমি বললাম, সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন উঠছে না। থাকার তো একটা জায়গা চাই। আমি যেখানে খুশী থাকতে পারি—কিন্তু ঊর্মি, মানে, মেয়েদের তো একটা আলাদা থাকবার জায়গা না হলে চলে না।

রজত বললো, সে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ঊর্মি বললো, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না, আমি যে-কোনো জায়গায় থাকতে পারবো—সবাই যেখানে থাকবে।

আমি বললাম, কিন্তু বাথরুম টাথরুম।

ঊর্মি বললো, অত সব চিন্তা করলে চলে না।

রজত বললো, শুনুন, শুনুন, আমি বলছি। আগে আর একবার আমি তো ঐ মেলায় গেছি, তাই আমি ব্যবস্থা ট্যাবস্থা জানি। সবাই যেখানে থাকে সেখানে আপনারা থাকতেও পারবেন না। থাকতে হবেও না। এত বেশী ভিড় হয় যে মানুষজন সবাই খোলা মাঠেই শুয়ে থাকে—কিছু কিছু হোগলার ছাউনি হয় বটে, কিন্তু সেখানে আর ক'জন জায়গা পায়!

তা হলে আমরাও কি খোলা মাঠে ?

না। গভর্নমেণ্ট-এর অফিসার এবং মন্ত্রীদের জন্য আলাদা তাঁবু থাকে, অনেকগুলি ঘরও তৈরী করা হয়। ঘরগুলো অবশ্য খড় আর হোগলা দিয়ে তৈরী—কিন্তু থাকা যায় মোটামুটি, মাটিতে খড় পেতে গদি করে—

ঊর্মি বললো, তা হলে ভালই।

রজত বললো, বাথরুমেরও ব্যবস্থা আছে, এমনকি রান্নাঘর পর্যন্ত—যদি কেউ রান্না করতে চায়।

আমি বললাম, এসব তো গভর্নমেণ্ট অফিসার আর মন্ত্রীদের জন্য, সেখানে আমাদের থাকতে দেবে কেন ?

রজত বললো, সাংবাদিকদের জন্যও আলাদা অনেকগুলো ঘর আছে। তা ছাড়া আমি যদি তোমাদের জন্য এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারি, তা হলে আর সাংবাদিক হয়েছি কেন ?

ঊর্মি বললো, ব্যস তা হলে ঠিক হয়ে গেল। বিভাসদা, আমরা তবে কবে যাচ্ছি ?

ঊর্মি সত্যি ছেলেমানুষ। এত সহজে কি সব ঠিক হয় ? এখনো তো ঊর্মির সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি। তার আগেই কি স্বামী-স্ত্রীর মতন দু'জনে বেড়াতে যেতে পারি ?

ঊর্মি ওর বাড়ি থেকে একা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে বলে যেতে পারে। আমার পক্ষেও সেরকম ভাবে যাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু দুজনে এক জায়গায় গেলে পরে সেটা জানাজানি হয়ে যাবেই। আমি চট করে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। মাত্র আর দু'তিন মাস পরেই যেটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এখন সেটাই হবে একটা কলঙ্কের ব্যাপার। এ রকম ভাবেও অনেক ছেলে-মেয়ে যায় আজকাল। কিন্তু আমার মনটা ঠিক সায় দেয় না।

ঊর্মিকে নিরস্ত করার জন্য আমি বললাম, কিন্তু আমার যে অনেক কাজ পড়ে গেছে এই সময়। অফিসে এমন কতকগুলো জরুরী কাজ আটকে গেছে।

ঊর্মি বললো, রাখো তোমার অফিস। তুমি না থাকলে বুঝি তোমার অফিস চলবে না ?

রজত সেই সঙ্গে যোগ দিয়ে বললো, আরে চলোই তো, দেখবে খুব ভালো লাগবে।

আমি রজতকে বললাম, তোমার আর কি! তুমি তো দিব্যি যাচ্ছো অফিসের কাজে। কাজও হবে, বেড়ানোও হবে।

রজত বললো, আমি বেড়াতে ভালবাসি বলেই এসব জায়গায় যাই। নইলে আমি অফিসকে বলে অন্য কারুকে এবার পাঠাতে পারতাম, আমি তো আগে একবার গেছি—

চট করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। আমার যে বোনের শিগগিরই বিয়ে হচ্ছে, তাকে নিয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঝর্ণার সঙ্গে ঊর্মি'র বেশ ভাব আছে। ওরা দুজনে যদি যায়, তাহলে আমি ওদের অভিভাবক হিসাবে অনায়াসেই যেতে পারি। বিসদৃশ কিছু দেখাবে না।

ঝর্ণাকে আমি কথাটা বলতেই সে রাজী। ঊর্মি'ও অনুরোধ করলো তাকে। বাবা-মাকেও রাজী করানো গেল। আর কোনো অসুবিধে নেই। ঠিক হয়ে গেল যে আমি ঝর্ণাকে সঙ্গে করে নিয়ে ঊর্মি'র বাড়ি থেকে তাকে তুলে নেবো—রজত দাঁড়িয়ে থাকবে ওর অফিসের সামনে—আমার অফিসের গাড়িটাই আমাদের নামখানা পেঁছে দিয়ে আসবে। সেখান থেকে লঞ্চ।

কিন্তু ঝর্ণাই শেষ পর্যন্ত গণ্ডগোল বাধালো। যাবার আগের দিন ওর একটু জ্বর এসে গেল। সামান্য সর্দি-জ্বর যদিও, কিন্তু বাবা-মা ওকে আর যেতে দিতে কিছুতেই রাজী হলেন না। গঙ্গাসাগরে গিয়ে খোলা হাওয়ায় ওর যদি জ্বর বেড়ে যায়? কয়েকদিন পরেই যার বিয়ে, তার সম্পর্কে এই ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

ঝর্ণা বেচারী নিরাশ হয়ে গেল খুব। ওর দারুণ ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। ও প্রাণপণে জ্বরটা লুকোতে গিয়েও ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, ঝর্ণা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও ঠিকই বুঝেছিল ঊর্মি'র জন্যই আমি ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ঝর্ণা আমাকে বললো, দাদা তুমি কিন্তু ঊর্মি'কে ঠিক নিয়ে যাবে। আমার জন্য ওর কেন যাওয়া হবে না? কেউ কিছু বলবে না, তুমি নিয়ে যাও।

আমিও সেই কথাটা চিন্তা করছিলাম। ঊর্মি' তৈরী হয়ে বসে থাকবে, এখন কি ওকে আর বলা চলে যে যাওয়া হবে না? ঊর্মি' যে ভীষণ জেদী মেয়ে।

ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। ঊর্মি'দের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতেই ও তৈরি হয়ে নেমে এলো। বিস্মিত ভাবে বললো, ঝর্ণা কোথায়? ঝর্ণা আসে নি?

আমি ওকে ঝর্ণার কথা জানালাম।

ঊর্মি'র মনটা খারাপ হয়ে গেল। আন্তরিকভাবে বললো, ইস্‌ বেচারী যেতে পারলো না। আচ্ছা, ও গেল না, তবু যদি আমি যাই, তাহলে ও কি দুঃখ পাবে?

আমি বললাম, না না, তাতে কি হয়েছে। ও পরে কখনো যেতে পারবে নিশ্চয়ই। এখন রিস্ক্‌ নেওয়া যায় না বলেই—

আমি যেন ঊর্মি'কে যেতে রাজী করাচ্ছি। ওকে তুলে নিয়ে চলে এলাম রজতের অফিসে। রজত সেখানে নেই।

আমাদের আসবার কথা ছিল সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে। আমরাই বরং পনেরো মিনিট দেরি করে ফেলেছি। রজত কি আমাদের ফেলেই চলে গেল? ঊর্মি'র সেই রকমই ধারণা হলো।

আমি অফিসের দারোয়ানের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, রজত তখনো আসে নি।

আমি আর ঊর্মি' কাছাকাছি একটা দোকানে চা খেতে গেলাম।

ঊর্মি'কে খুব উচ্ছল দেখাচ্ছে। ও পরেছে একটা বেলবটম প্যান্ট আর একটা কারুকার্য করা শার্ট। দিল্লীতে মেয়েরা এ রকম পোশাক খুব পরে, কলকাতায় যে পরে না তা নয়, কিন্তু এটাকে ঠিক তীর্থযাত্রার পোশাক বলা যায় না। তা হোক না। আমরা তো তীর্থ করতে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি প্রকৃতি-দর্শনে। 'কপালকুণ্ডলা'র নায়ক নবকুমার যে-কারণে গিয়েছিল।

আমি বললাম, ঊর্মি' তোমাকে তো খুব সুন্দর মানিয়েছে।

ঊর্মি' বললো, তোমার পছন্দ হয়েছে? এমনি রাস্তায়-ঘাটে পরতে লজ্জা করে, বাইরে যাচ্ছি বলেই—

আমরা যখন কাশ্মীরে যাবো, তখন তুমি এ রকম পোশাক যত ইচ্ছে পরতে পারবে।

আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি বুঝি? কবে?

এই ধরো আর মাস তিনেক বাদেই।

ঊর্মি'র মুখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে মেয়েরা সাধারণত একটু লজ্জা পায়। ঊর্মি'র খুশীটা বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য। ও বাইরে বেড়াতে খুব ভালোবাসে। আমি ওকে বিদেশে বেড়াতে নিয়ে যাবারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি।

চা খেয়ে ফিরে এসেও দেখলাম, রজতের পাত্তা নেই। এদিকে সাতটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। রজত নিজেই বলেছিল, বেলা বেড়ে গেলে দারুণ ভীড় হবে। লঞ্চে জায়গা পাওয়া যাবে না।

ঊর্মি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অসহিষ্ণু ভাবে বললো, তোমার বন্ধু কি রকম! বড্ড দায়িত্বহীন তো!

আমি বললাম, কোনো কারণে আটকে পড়েছে নিশ্চয়ই।

একটা টেলিফোন করে খবর দিতে তো পারতো।

আর একটু অপেক্ষা করে দেখোই না।

প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল। যদিও যাওয়া না হয়?

অত চিন্তা করতে হবে না। রজত যদি শেষ পর্যন্ত নাও আসে, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। বেরিয়ে যখন পড়েছি, আর ফিরবো না।

আমার কথার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দ তুলে মোটরসাইকেল নিয়ে রজতকে আসতে দেখা গেল।

রজতের বড় বড় চুলগুলো উড়ছে। চোখে কালো চমশা, গায়ে ডোরাকাটা রঙীন একটা জামা। মোটরসাইকেল-আরোহীদের সাধারণত বেশ বীর-পুরুষের মতন দেখায়, বসার ভঙ্গিটার জন্য। রজতকে আধুনিক কালের এক দস্যুদলপতির মতন দেখাচ্ছে।

দেরিতে আসবার জন্য রজত কোনোরকম ক্ষমাপ্রার্থনা বা ভণিতা করলো না। চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে উৎফুল্ল ভাবে বললো, তোমরা এসে পড়েছো? বাঃ! আমি ধরেই নিয়েছিলাম তোমাদের দেরি হবে।

ঊর্মি বললো, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

সত্যিই আমরা দাঁড়িয়েছিলাম গাড়ির পাশে রাস্তায়। রজত হাসতে হাসতে বললো, কেন, দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? গাড়ির মধ্যে বসে থাকলেই পারতেন। তাহলে এখন বেড়িয়ে পড়া যাক?

আমি বললাম, আমরা রেডি। আমার বোন আসতে পারলো না।

রজতও ওর মোটরসাইকেলটা রেখে এলো অফিসের মধ্যে। তারপর আমার গাড়িতে এসে উঠে বললো, বিভাস, তুমি ড্রাইভার এনেছো কেন? গাড়ি তো আমিও চালাতে পারি। শুধু শুধু ওকে অতদূর নিয়ে যাবে।

গাড়ি চালানোটা কোন সমস্যা নয়। গাড়ি চালাতে তো আমিও জানি। কিন্তু রজতের মতন এরকম অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সে কথা আমি কখনো জানাতে পারতাম না।

একটু হেসে বললাম, আমরা ফিরবো দুদিন পরে। কিন্তু অফিসের গাড়ি তো দুদিন নামখানায় পড়ে থাকতে পারবে না।

রজত বললো, ও অফিসের গাড়ি! আমি তো গাড়িটা দেখে ভেবেছিলাম একটু চালাবো।

তা চালাও না! ড্রাইভার পাশে বসছে।

রজত সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসলো। তারপর ফাঁকা রাস্তা পেয়েই দারুণ স্পীড দিল। একটু পরেই বোঝা গেল রজত দুঃসাহসী। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাতে ভালবাসে। এটা ওর চরিত্রের সঙ্গে মানায়।

বেশী জোরে গাড়ি চালালে, পেছনের সীটে কোনো কোনো মেয়ে ভয় পায়। কোনো কোনো মেয়ে খুশীর উত্তেজনা বোধ করে। ঊর্মি সেই দ্বিতীয় দলের। ঊর্মি খুশী দেখেই আমি আর রজতকে সংযত হতে বললাম না। ড্রাইভার যদিও আমার দিকে বার বার ভীতভাবে তাকাচ্ছে।

রজত অন্তত তিনবার দুজন মানুষ এবং একটি ছাগলছানাকে চাপা দিতে দিতে কোনোক্রমে রক্ষা পেল। একবার এত জোরে অকস্মাৎ ব্রেক কষলো যে আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

রজত দীপ্তমুখে পেছন ফিরে আমাদের জিজ্ঞেস করলো, কি, ভয় করছে না তো?

ঊর্মি বললো, আপনি মোটেই ভালো গাড়ি চালাতে পারেন না।

রজত তখন আরও গতি বাড়িয়ে দিল। আমি মৃদু গলায় বললাম, আমাদের প্রাণ যায় যাক, শুধু যেন গাড়িটার কোনো ক্ষতি না হয়, সেটা দেখো। অফিসের গাড়ি।

রজত আর ঊর্মি দুজনেই এ কথায় হেসে উঠলো হো হো করে।

নামখানার কাছাকাছি এসে, পথে যখন মানুষজনের ভিড় খুব বেড়ে গেল, সেখানে অবশ্য আমি প্রায় জোর করেই রজতকে সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বসালাম সেখানে। একটু পরে আর গাড়ি চলতে পারলো না। আমরা নেমে গেলাম।

রজত এই সময় ঊর্মির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি এ কি পোশাক পরে এসেছেন!

সে এমনভাবে ঊর্মির দিকে তাকিয়ে রইলো যেন আগে কখনো তাকে দেখে নি।

ঊর্মি একটু অবাক হয়ে বললো, কেন, কি হয়েছে?

এরকম পোশাক পরে কেউ গঙ্গাসাগরে যায় নাকি?

সেখানে যাবার জন্য বুঝি বিশেষ কোনো পোশাক আছে?

তা নয়, তবু সাধারণ পাঁচজনে যে রকম পরে।

আমি তো এটাতে কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না।

না, না, এটা ছেড়ে একটা শাড়ি পরে ফেলুন।

রজতের সঙ্গে ঊর্মি'র প্রায় একটা ঝগড়া হবার উপক্রম হচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আরে রজত, তুমি যে এত গোঁড়া, তা তো আমি জানতাম না! এরকম তো আজকাল অনেকেই পরে।

রজত বললো, তা পরুক। কিন্তু একটা তীর্থস্থানে এরকম বড়লোকের মতন পোশাক পরে আলাদা থাকার কোন মানে হয় না। সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়াই উচিত।

ঊর্মি একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, আর আপনি যে জামাটা পরে আছেন, সেটাই বা কি এমন সাধারণ?

রজত বললো, আমার কথা আলাদা। আমি রিপোর্টার মানুষ, আমাদের পোশাক যে রকমই হোক—

ঊর্মি বললো, আমাকে আর একটু চিনলে বুঝতে পারবেন, আমার কথাও আলাদা।

আমি পরে আছি একটা সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট। এটাই আমার প্রতিদিনকার পোশাক। ওখানে জল-কাদায় ঘোরার জন্য আমি একটা খাকি রংয়ের প্যান্ট এনেছি অবশ্য। কিন্তু সাদা রংই আমি বেশী ব্যবহার করি। তা হলেও, অন্যদের গায়ের রংচঙে পোশাক আমার খুব ভালোই লাগে, বিশেষত মেয়েদের। আমি রজত আর ঊর্মি'র তর্কাতর্কি'র মাঝখানে হাত তুলে বললাম, পোশাকের কথা নিয়ে এখন সময় নষ্ট করার কি কোনো মানে হয়? তার বদলে লঞ্চের খোঁজ করা উচিত নয়? ঊর্মি তো সঙ্গে শাড়িও এনেছে। ওখানে পেঁছে না হয় পোশাক বদলে নেবে।

চতুর্দিকে অসম্ভব ভিড়। কন্যাকুমারিকা কিংবা হিমালয় থেকেও এসেছে মানুষ। অরণ্যের সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়াও, সাধারণ মানুষও কম নয়। অনেকেই এসেছে পায়ে হেঁটে। বেশীর ভাগই গরীব। এই তীর্থটা বুঝি শুধু গরীব-দেরই তীর্থ। 'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।' এত দূর দূর থেকে এত কষ্ট করে কিসের টানে মানুষ আসে কে জানে!

অব্যবস্থার চূড়ান্ত। একসঙ্গে এত মানুষকে সামলাবার মতন ব্যবস্থাপনা এখানে নেই: হুড়মুড় করে সবাই মিলে লঞ্চে উঠতে গিয়েছিল বলে লঞ্চ-ঘাটটা নাকি বিপজ্জনক ভাবে ভেঙে পড়েছে। পুলিস আটকে রেখেছে সে জায়গাটা। এদিকে জনতা উত্তাল হয়ে উঠছে, কাল ভোরেই পুণ্যস্নানের শুভক্ষণ, আজকের মধ্যেই সবাই পেঁছিতে চায়।

যারা পুণ্য অর্জন করতে চায় না, শুধু দৃশ্য দেখতে চায়—তাদের পক্ষে

গঙ্গাসাগরে যাওয়ার এইটাই প্রকৃত সময় নয়। একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। আমার বিরক্ত লাগছিল।

ঊর্মি'র কিন্তু উৎসাহ একটুও কমে নি। সে বললো, চলো, তাহলে লঞ্চের দিকে যাই।

আমি বললাম, কি করে যাবে এই মানুষের দেয়াল পেরিয়ে?

রজত বললো, কোনো চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রজত সাংবাদিক, সে সরকারী আমলাদের চেনে, তাদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারে।

রজত গিয়ে দেখা করলো এস. ডি. ও.-র সঙ্গে। তিনি বললেন যে একটা লঞ্চ রাখা আছে বটে, কিন্তু এই ভীড় ঠেলে সেদিকে যাবেন কি করে?

রজত বললো, আমাকে যেতেই হবে। আমি তো আর নামখানায় বসে রিপোর্টিং করতে পারি না।

রজত আমার দিকে ফিরে বললো, বিভাস তোমরা জুতো খুলে ঝোলায় পুরে নাও, তারপর আমার পেছনে পেছনে এসো।

এস. ডি. ও. আমাদের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন বাংলোর পেছন দিয়ে। সেই পথে খুব কাদা। তিনি আমাকে বললেন, আপনারা পুরুষমানুষ, আপনারা যেতে পারবেন ঠিকই। কিন্তু আপনার মিসেস-এর খুব কষ্ট হবে।

তিনি ঊর্মি'কে ধরে নিয়েছেন আমার স্ত্রী। আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। প্রতিবাদ করে বলবোই বা কি। রজত আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে মুচকি হাসলো। ঊর্মি'ই সামলে দিল ব্যাপারটা, সে বললো, না, না, আমার কিছু কষ্ট হবে না।

ঊর্মি' ওর বেলবটম প্যান্টটা গুটিয়ে নিল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। তারপর বললো, চলো।

নদীর ঘাটে এসে দেখলাম, সেখানেও প্রচণ্ড ভিড়। রজত বীরবিক্রমে দু'হাতে সেই ভিড় ঠেলে ঠেলে এগোতে লাগলো—আমরাও গলে যেতে লাগলাম সেই ফাঁকে। রজত নির্দয় ভাবে লোককে গুঁতোগুঁতি করছে। সে রকম না করে উপায়ও নেই।

লঞ্চও ভর্তি হয়ে আছে মানুষজনে। এরা সবাই অনধিকারী। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। সেখানে আর তিলধারণের জায়গা নেই। রজত তবু দমলো না। একজন পুলিস ডেকে এনে তার সাহায্যে টেনে-হিঁচড়ে

কুড়ি পঁচিশজন লোককে নামিয়ে দিল। লঞ্চের ছাদটা খালি করে দিল একেবারে। আমরা সেখানে উঠে এলাম।

লঞ্চের সারেং ছাদে বসে আপন মনে বিড়ি খাচ্ছে। আমাদের দেখে বললো, লঞ্চ এ বেলা ছাড়বে না। জোর বাতাস দিচ্ছে। সমুদ্রে এখন বড় বড় ঢেউ। এ সময় লঞ্চ চালানো বিপজ্জনক।

রজত যতই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, সে কিছুতেই রাজী হয় না। রজতের হঠাৎ মেজাজ গরম হয়ে গেল, সে সারেং-এর কলার চেপে ধরে ঘুষি মারতে গেল। আমি মাঝখানে পড়ে রজতকে ছাড়লাম। সারেংকে ধরে মারলে কোনক্রমেই লঞ্চ চলবে না।

রজত আবার নেমে গেল। বাংলো থেকে ডেকে আনলো একজন সরকারী অফিসারকে। তিনি হুকুম দিলেন লঞ্চ ছাড়বার।

শেষ পর্যন্ত যাত্রা শুরু হলো। লঞ্চ যখন মধ্য-নদী দিয়ে ছুটে চললো জোরে, হু-হু করে গায়ে লাগছে বাতাস, তখন আগেকার সব অসুবিধের কথা মন থেকে মুছে যায়।

ঊর্মি বললো, আপনি না থাকলে তো আমাদের আসাই হতো না।

রজত বললো, এখন ভালো লাগছে কিনা, বলুন ?

ঊর্মি বলল, দারুণ, দারুণ।

আমি চলে এলাম সারেং-এর কাছে। লোকটি এখনো রাগ করে আছে। আমি তাকে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, সারেং সাহেব, রাগ করবেন না। আমার বন্ধুর একটু মাথা গরম—তা ছাড়া আজ আমাদের পৌঁছোতেই হবে।

সারেং-এর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে, তা ছাড়া লোকটি অহংকারী প্রকৃতির। কিছুতেই আমার সিগারেট নেবে না। তার কাঁধে হাত দিয়ে অনেক করে বোঝালাম। রজতের হয়ে বার বার ক্ষমা চাইলাম। এক সময় সে শান্ত হলো এবং আমার কাছ থেকে সিগারেট নিলো। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। লোকটার মনটা খুব সাদা। ফিরে এসে দেখলাম, ঊর্মি আর রজত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রেলিং ধরে, নদীর গতিপথের দিকে মুখ। হাওয়ায় উড়ছে ঊর্মির চুল, এক হাত তুলে সে চুল সামলাচ্ছে। সেই ভঙ্গিতে কি সুন্দর দেখায় ওকে। আমি পিছন থেকে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

৩

সেবার নাকি মেলায় ভিড় হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। কপিলমুনির আশ্রমটাকে ঘিরে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যেই শুয়ে আছে কয়েক লাখ নারী-পুরুষ।

আমাদের অবশ্য তেমন অসুবিধে হলো না। সাংবাদিক ও অফিসারদের জন্য এক জায়গায় অনেকগুলো সাময়িক বাড়ি-ঘর বানানো হয়েছে। একজন অফিসারের সস্ত্রীক আসার কথা ছিল, তিনি শেষ মুহূর্তে আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। সেই ঘরটা আমরা নিয়ে নিলাম।

রজত আমাকে বললো, তোমরা দু'জনে এখানে থাকো। আমার তো আলাদা জায়গা আছেই।

আমি বললাম, কেন, তুমিও এখানে থাকতে পারো না? একটা রাত্তিরের তো ব্যাপার!

রজত বললো, না ভাই, আমার অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গেই থাকা উচিত। না হলে সেটা খারাপ দেখায়।

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ঊর্মি'র সঙ্গে আমার একঘরে থাকাও কি ভাল দেখায়? অন্য কেউ জানে না আমরা স্বামী-স্ত্রী কিনা, কিন্তু রজত তো জানে। তাছাড়া, অন্য কেউ যদি ঊর্মি'র সিঁদুর নেই দেখে কোনরকম সন্দেহ করে।

আমি রজতকে বললাম, তোমাদের ওখানে কি বেশী জায়গা আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অঢেল জায়গা। আমাদের জন্য পাঁচ খানা ঘর দিয়েছে।

তা হলে, আমিও কি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি? কেউ কি আপত্তি করবে?

আপত্তি আবার কে করবে? সবাই তো আমার চেনা।

তা হলে আমি তোমাদেরই সঙ্গে রাত্রে থাকবো—ঊর্মি এখানে একা থাকুক। ঊর্মি, তুমি একা থাকতে পারবে তো?

ঊর্মি বিচিত্র ভাবে হেসে বললো, পারবো না কেন?

আমরা তিনজনে মিলেই রজতদের জায়গাটা দেখতে গেলাম।

বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিক আব ফটোগ্রাফাররা এসেছে। কয়েকজন বিদেশী টেলিভিশান কোম্পানীর প্রতিনিধিও আছে তার মধ্যে। এক জায়গায় সবাই মিলে হৈ হৈ করে রান্না শুরু করে দিয়েছে। নতুন হাঁড়ি

নতুন হাতা-খুন্তি। ইঁটের তৈরী উনুনে বসানো হয়েছে খিচুড়ি। এক-জন আবার একটা মস্তবড় কাতলা মাছ ছুরি দিয়ে কুটতে বসেছে। কাছেই একটা গ্রামে নাকি সস্তায় পাওয়া গেছে মাছটা। তীর্থক্ষেত্রে ব'সে মাছ রান্নার ব্যাপারটা শুধু বাঙালীদের পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের দেখে ওরা আপ্যায়ণ করতে লাগলো খুব। ঊর্মি'র দিকে একটু বেশী মনোযোগ যে দেবে তা তো স্বাভাবিক। কয়েকজন মদের বোতল খুলে বসেছিল, তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললো গেলাসপত্র। ঊর্মি'ও গেল লেগে ওদের রান্নায় সাহায্য করতে।

রজত আর আমি একটা আলাদা ঘর পেলাম। শুধু খড়ের ওপর একটা চাদর পেতে শোওয়া। আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। রজত অবশ্য বহু রকম অবস্থায় থেকেছে, কিন্তু আমি এরকমভাবে কখনো কোথাও যাইনি। প্রথমে একটু মানিয়ে নেবার অসুবিধে হলেও বেশ ভালো'ই লাগছে। আমি ভালো-ছেলের মতন শুধু পড়াশুনা করেছি, তারপর চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়েছি—এই ধরনের রোমাঞ্চকর জীবন কাটাবার সময়ই পাই নি কখনো।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা তিনজন ঘুরে বেড়ালাম বাইরে। তখনও মানুষজন আসবার বিরাম নেই। কচুবেড়িয়ার মোড় থেকে যারা পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে-রিক্সায় আসছে, তাদের মেলায় প্রবেশ করার জন্য একটাই মাত্র ছোট ব্রিজ। সেখানে অসম্ভব ঠ্যালাঠেলি। এক সময় নাকি ব্রিজের রেলিং ভেঙে কয়েকজন মানুষ নীচে পড়ে গেছে। অবশ্য নীচে জল-কাদা মেশানো নরম মাটি, কারুর প্রাণহানির সম্ভাবনা নেই, তবু ঘটনার বিবরণ নেবার জন্য সাংবাদিক হিসেবে রজতকে যেতেই হয়। আমরা ওর সঙ্গে যাই।

ভিড়ের মধ্যে যাতে ঊর্মি' হারিয়ে না যায়, তাই আমি ওর হাত ধরে রেখেছিলাম শক্ত করে।

ঊর্মি' হেসে বললো, বাবা রে বাবা, তুমি এমন ভয় করছো, যেন আমি একটা কচি খুকি!

এই কথা শুনে আমি যেই ঊর্মি'র হাত ছেড়ে দিলাম, তার একটু পরেই ঊর্মি' হারিয়ে গেল।

আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে ঊর্মি'কে আর দেখতে পেলাম না। একটু দূরেই রজত একটা ছোট খাতা খুলে দুর্ঘটনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নোট করছে, কিন্তু কাছাকাছি ঊর্মি' কোথাও নেই। চতুর্দিকে শুধু

মানুষের মাথা—কারুকে চেনাও শক্ত। অল্প কয়েকটা আলোতে অন্ধকার দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায় নি।

আমি রজতের কাছে গিয়ে বললাম, ঊর্মি কোথায় ?

রজত সঙ্গে সঙ্গে খাতা বন্ধ করে বললো, জানি না তো! তোমার সঙ্গেই তো ছিল।

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম, হ্যাঁ তা ছিল, হঠাৎ যে কোথায় চলে গেল—

কোথায় আর যাবে ? আছে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও।

কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে—

ঠিক আছে খুঁজে দেখা যাক্। তুমি ঐ দিকটায় যাও, আমি এই ডান দিকটাতে।

রজত আরে আমি ঊর্মিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। এত মানুষের ভিড়ে সহজে হাঁটাও যায় না। একটু জোরে হাঁটতে গেলেই মানুষজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। অনেকে অবশ্য ধাক্কা দিয়েই চলে যাচ্ছে, কেউ তার প্রতিবাদও করছে না।

সেই ভিড়ের মধ্যে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা পুরোনো কথা মনে পড়লো। অনেকদিন আগে, তখন আমার বয়েস সতেরো-আঠারোর বেশী না—ঊর্মিদের বাড়ির সবাই আর আমাদের বাড়ির লোকেরা মাঝরাত্তিরে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। বাগবাজারের প্যাণ্ডেলে অসম্ভব ভিড়, তার মধ্যে ঊর্মি হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজা-খুঁজি, মাইকে তার নাম ডাকাডাকি হয়েছিল, সবাই দারুণ চিন্তিত, ঊর্মির বয়স তখন পনেরো—রাস্তাঘাট কিছুই চেনে না। শেষ পর্যন্ত আমিও ঊর্মিকে খুঁজে পেয়েছিলাম। ঊর্মি বেশ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু আমাকে দেখার পর বলেছিল, বাড়ির লোকেদের আর একটু ভয় দেখানো যাক্ না! আমার তক্ষুণি ফিরে যাই নি। পুজো প্যাণ্ডাল থেকে বেরিয়ে মধ্যরাত্রির নির্জন রাস্তায় আমরা বেরিয়েছিলাম খানিকক্ষণ। সেই প্রথম আমি ঊর্মির হাত ধরেছিলাম। এমনিতে একটি চেনা মেয়ের হাত ধরা এমন কিছুই না। নানা কারণে আগেও হয়তো অনেকবার ধরেছি, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, এই হাতটা আমার নিজস্ব। কি কোমল আর উষ্ণ, যেন একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, আমি সত্যিই আমার নাকের কাছে ঊর্মির হাতটা এনে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করেছিলাম। সেইদিনই প্রথম বুঝেছিলাম ভালোবাসা কাকে বলে।

আজ এই গঙ্গাসাগর মেলায় ঊর্মি'কে অনেকক্ষণ খ‍ুঁজেও বার করতে পারলাম না। আমার মনে হতে লাগলো, রজত বোধহয় এতক্ষণে ঊর্মি'কে খ‍ুঁজে পেয়েছে, সে আগেও এসেছে বলে এ জায়গা আমার চেয়ে ভালো চেনে। এখন ওদের দ‍ুজনকে আমি খ‍ুঁজে পাবো কি করে?

এই কথা মনে হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদ‍ূরে আমি দেখতে পেলাম ঊর্মি'কে। একটা গোল করা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। কাছাকাছি রজত নেই।

আমি পেছন থেকে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, এই ঊর্মি'!

ঊর্মি' ম‍ুখ ফিরিয়ে হেসে বললো, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

বাঃ, তুমিই তো হারিয়ে গেলে।

আমি তো অনেকক্ষণ থেকে এখানেই দাঁড়িয়ে আছি। তোমরাই তো হারিয়ে গেছো।

রজত কোথায়?

আমি তো জানি. না। আসবে নিশ্চয়ই। দ্যাখো, এখানে দ্যাখো কি অদ্ভুত কাণ্ড!

আমি ভিড় ঠেলে ঊর্মি'র পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভিড়ের মধ্যে একটি বিচিত্র দৃশ্য। একজন সাধ‍ুর সমস্ত দেহটা মাটির মধ্যে পোঁতা, শ‍ুধ‍ু মাথাট‍ুকু বেরিয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় মাটির ওপরে পড়ে আছে একটা কাটাম‍ুণ্ডু।

ভিড়ের লোকের মন্তব্য শ‍ুনে ব‍ুঝলাম, এই সাধ‍ুটি এইরকম অবস্থায় নাকি তিন দিন ধরে রয়েছে।

এই সব সাধ‍ুদের গল্প আগে শ‍ুনেছি যদিও, তব‍ু এখন চোখে দেখলেও ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। এই রকম ভাবে একটা লোক তিনদিন থাকতে পারে? কে একে খাইয়ে যায়?

সাধ‍ুটির ম‍ুখটি বেশ প্রশান্ত, স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে, সে নাকি কার‍ুর সঙ্গে একটাও কথা বলে না। শরীরকে এরকম কষ্ট দিয়ে সাধ‍ুরা কি পেতে চায়, আমি ব‍ুঝতে পারি না।

অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি, এ দিকটা সাধ‍ুদেরই পাড়া। কোনো সাধ‍ু শ‍ুয়ে আছে এক গোছা কাঁটাতারের ওপর। কেউ সারা গায়ে ইঁট চাপা দিয়ে আছে। লোক-ম‍ুখে শ‍ুনলাম, একট‍ু পরেই আর একজন সাধ‍ু এসে পেঁছোবেন, তিনিই সবার সেরা, তিনি শ‍ুয়ে থাকেন কাঠকয়লার আগ‍ুনে।

তার একদিকে প্রায় লাইন করে বসে আছে নাগা সন্ন্যাসীর দল।

প্রত্যেকের হাতে ত্রিশূল, বিশাল বিশাল চেহারা এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কারুর কারুর লিঙ্গে লোহার আংটা বাধা—ওরা যে জিতেন্দ্রিয়, সেটা বোঝাবার জন্যই বোধ হয়। উলঙ্গ পুরুষমানুষ দেখতে আমার একটুও ভাল লাগে না। গা শির শির করে। উর্মি পাশে আছে বলে আমার লজ্জা করে আরও বেশী। অবশ্য, তীর্থস্থানে এসে এ রকম মনের বিকার থাকা বোধহয় উচিত নয়।

উর্মি'র কিন্তু একটুও বিকার নেই। সে নাগা সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে বললো, এই শীতের মধ্যে ওরা এ রকম খালি গায়ে থাকে কি করে?

আমি বললাম, পৃথিবীতে এরকম অনেক আশ্চর্য ব্যাপার আছে।

ওরা গায়ে ছাই মেখে থাকে, তাতে বোধহয় বেশ গরম হয়।

সেই সঙ্গে গাঁজা খায়।

যাই বলো, সাধু হওয়ার একটা বেশ উপকারিতা দেখতে পাচ্ছি। সব সাধুরই স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়। মুক্ত আকাশের নীচে পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াই জীবন কাটানো বোধহয় মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এরা কত স্বাধীন।

সেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'।

সেটাই বোধহয় ভালো ছিল।

একজন নাগা সন্ন্যাসী আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলো। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা হুকুমের ভাব ছিল যে আমরা কাছে না গিয়ে পারলাম না। সাধুটি আমাদের কপালে দুটো ছাইয়ের টিপ পরিয়ে দিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তাকে দিলাম। আমি সাধুটির দিকে তাকাতে পারছিলাম না। উর্মি সাধুটির সঙ্গে কি যেন কথা বলতে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম।

সেখানে উর্মি ছাড়াও আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন। দু'একজনকে দেখে মনে হয় বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের। তারাও ঐ সব উলঙ্গ সাধুদের কাছে গিয়ে শিবশঙ্করের পয়সা দিয়ে ছাইয়ের টিপ পরে পুণ্য অর্জন করছেন। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লজ্জাবোধ আসলে বোধহয় কম। কিংবা বোধহয় ভুল বললাম। এখানে একজন নগ্ন সন্ন্যাসিনী থাকলে পুরুষদেরও কি ভিড় হত না?

একটুক্ষণ আমরা রজতকে খুঁজলাম। পাওয়া গেল না কোথাও। যাই হোক, রজতের জন্য চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

ঊর্মি বললো, চলো, আমরা একটু সঙ্গমের ধার থেকে ঘুরে আসি। যাবে ?

এই রাত্তিরেই ?

চলো না।

অনেক নিদ্রিত ও জাগ্রত মানুষের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে এলাম নদীর কিনারায়। এ দিকটা বেশ অন্ধকার। এত রাত্তিরেও কয়েকজন স্নান করছে সেখানে। শুনলাম কেউ কেউ নাকি সূর্যোদয় পর্যন্ত জলের মধ্যেই থেকে স্তবপাঠ করবে। শীতের মধ্যে এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে থাকা— কত রকম পাগলই যে আছে !

ঊর্মি তাকিয়ে আছে দূরের অন্ধকারের দিকে। আমি ওকে বললাম, তা হলে শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর দেখা হলো তো ?

ঊর্মি আমার একবার বাহু ছুঁয়ে বললো, কি ভালো যে লাগছে ! সেই গঙ্গোত্রীতে দাঁড়িয়েই মনে মনে ভেবেছিলাম, একদিন তোমার সঙ্গে গিয়ে গঙ্গার শেষ মুখে দাঁড়াব। কিন্তু এত তাড়াতাড়িই যে সেখানে আসা হবে, ভাবি নি।

আমি বললাম, রজত না থাকলে কিন্তু আমাদের এত তাড়াতাড়ি আসা হতো না।

ঊর্মি আমার বুকে হাত দিয়ে বললো, আমার ভালো লাগছে, আমার খুব ভালো লাগছে।

আমি ঊর্মির গালে হাত ছোঁয়ালাম। কি উষ্ণ হয়ে থাকে ওর শরীরটা। সে কথা ঊর্মিকে বলতেই ও আপন মনে হেসে উঠলো।

৪

খানিকটা বাদে আমরা ফিরে এলাম আমাদের বাসস্থানের দিকে। রজতের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম, রজত ওর খড়ের বিছানায় শুয়ে আপন মনে সিগারেট টানছে। আমি বললাম, একি, তুমি এখানে ? আর আমরা তোমাকে খুঁজছি।

রজত বললো, আমাকে কি খোঁজার কথা ছিল ?

ঊর্মি বললো, আমাকে তো খোঁজার দরকার ছিল। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, আর আপনি এখানে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন ?

রজত এবার হাসতে হাসতে উত্তর দিল, আমি দূরে থেকে দেখলাম আপনারা দু-জনে জলের দিকে যাচ্ছেন, তখনই বুঝলাম আর খোঁজাখুঁজির দরকার নেই, তাই আমি আমার কাজ সেরে এলাম সেই ফাঁকে।

এখানে আপনার আবার কি কাজ? এত রাত্রে?

বাঃ খবর পাঠাতে হবে না? মেলা অফিসের টেলিফোন থেকে ট্রাংককল-এ খবরগুলো পাঠিয়ে দিলাম আমার অফিসে।

কি কি খবর পাঠালেন?

তার মধ্যে আপনার হারিয়ে যাওয়ার খবরটাও আছে।

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম একসঙ্গে। ঊর্মি ঘরের মধ্যে এসে বসলো। কিছুক্ষণ গল্প করার পর রজত তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি শুতে যাবেন না?

খুব একটা যেন ইচ্ছে নেই, এরকম ভাবে ঊর্মি বললো, আপনারা এখন ঘুমোবেন নাকি?

বাঃ ঘুমবো না? আবার তো ভোরেই উঠতে হবে।

তা হলে আমিও যাই। একলা একলা যাবো?

বিভাস, যাও, ওঁকে পেঁছে দিয়ে এসো—

আমি ঊর্মিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঊর্মির ঘরটা কাছেই। ভেতরে আলো জ্বালা নেই। অন্ধকারে ঊর্মি আমাকে ধরে রইলো, আমি দেশলাই জ্বাললাম। ঊর্মির মুখখানা একটু যেন বিবর্ণ। অচেনা জায়গায় একা ঘরে শোওয়ার অভ্যাস ওর নেই। আমার বুকটা মুচড়ে উঠলো। আমি যদি ওর সঙ্গে রাতটা এখানে কাটাতে পারতাম! কি বাধা আছে তাতে! বিয়ে টিয়ে এগুলো তো আসলে নিয়ম রক্ষা মাত্র। এগুলো গ্রাহ্য না করলে কি হয়? আমরা যদি সেই নিয়ম ভাঙি, তবু সমাজ আমাদের কোনো শাস্তি দিতে পারবে না। সমাজের সে জোর আর নেই। তবু শুধু চক্ষুলজ্জার ব্যাপারটা এড়াতে পারি না।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঊর্মিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিলাম। ঊর্মির সারা শরীরটা কাঁপছে। আমার শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরটা প্রায় মিশিয়ে দিয়ে ঊর্মি বললো, আমার একা থাকতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

আমি অতিকষ্টে মনের জোর এনে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, একটু ঘুমোও—কয়েক ঘণ্টা তো মাত্র—তারপর আমরা এসে তোমাকে ডেকে তুলবো—

যদি আমার ভয় করে ?

দূর, ভয়ের কি আছে।

আমি ঊর্মি'কে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিলাম ওর বিছানায়। ঊর্মি' তবু ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তবু আমি অতিকষ্টে নিজেকে দমন করে চলে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে মনে হলো, আজ থেকে দু'তিন মাস পরেই যদি এখানে আসতাম, তা হলে কত সহজে আমি ঊর্মি'র সঙ্গে থেকে যেতে পারতাম। এই রাতটা বৃথা যেত না। বিয়েটিয়ের ব্যাপারগুলো যতই সংস্কার হোক তবু সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। যাই হোক, আর দু'তিন মাস বাদে আমরা এর চেয়েও ভালো কোনো জায়গায় তো যাবোই—।

আমাদের ঘরে এসে দেখলাম, রজত কোথা থেকে ব্রাণ্ডির বোতল বার করে তাতে চুমুক মারছে।

আমাকে দেখে বললো, গেলাস ফেলাস নেই। মাটির গেলাসে এসব খাওয়া যায় না। তুমি বোতল থেকে চুমুক দিয়ে খেতে পারবে ?

আমি বললাম, আমি খাই না ভাই।

খাও না তো কি হয়েছে ? আজ একটু খাও, বেশ শীত শীত পড়েছে, গা গরম হয়ে যাবে।

না ভাই, দরকার নেই। অফিসের একটা পার্টি'তে একবার খেয়েছিলাম, আমার একটুও ভালো লাগে নি।

তুমি একটা টিপিক্যাল গুডবয়। আমি খেলে তোমার আপত্তি নেই তো ?

না, না, আপত্তি কিসের !

তা হলে তোমার যদি ঘুম পায়, ঘুমিয়ে পড়ো, আমি আর ঘণ্টাখানেক বাদেই—

আমি ঘুমোবার চেষ্টা না করে একটা সিগারেট ধরালাম। আগুন টাগুনের ব্যাপারে এখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়। চারিদিকে শুধু খড় আর হোগলা, যে-কোনো মুহূর্তে আগুন ধরে যেতে পারে।

তখনো সিগারেটটা শেষ হয় নি। কে যেন আমাদের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো। আমি তড়াক করে উঠে দরজাটা খুললাম।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় ঊর্মি' দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ঊর্মি' ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো। তার-

পর বিহ্বল গলায় বললো, আমি কিছুতেই ও ঘরে থাকতে পারবো না। ওখানে ভূত আছে।

ভূত!

রজত হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, ভূত আবার কি?

ঊর্মি ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, নিশ্চয়ই ভূত আছে। কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ, কানের পাশে ফিস ফিস করে কথাবার্তা।

রজত বললো, নিশ্চয়ই পাশের ঘরের শব্দ। শুধুমাত্র হোগলার দেওয়াল—এত পাতলা দেওয়াল দেওয়া ঘরে তো আগে কখনো থাকেন নি।

মোটেই না। সে রকম শব্দ শুনলেই বোঝা যায়। মোট কথা আমি ওখানে একলা থাকতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না, আমি এখানে থাকবো, তাতে আপনাদের অসুবিধে আছে?

আমি ঊর্মি'র হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে। তুমি এখানেই থাকো। তোমাকে আর ও ঘরে যেতে হবে না।

এতক্ষণে রজতের হাতের ব্রাণ্ডির বোতলটার দিকে চোখ পড়লো ঊর্মি'র। এবার সে রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বললো, ও; এই জন্যই আপনারা আমাকে ও ঘরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন? মদ খাবার জন্য? আপনারা অনায়াসেই আমার সামনে খেতে পারেন। আমার শুচিবাই নেই।

আমি ঊর্মি'কে বললাম, আরে, তুমি এত রাগ করছো কেন? ব্যাপারটা তা নয়।

রজত ঊর্মি'র দিকে সোজা চোখে বললো, আপনি দুটি ভুল করেছেন। 'আপনারা' নয়, শুধু আমি একাই মদ খাচ্ছি। আপনার ভাবী স্বামী খুবই সচ্চরিত্র, তিনি এসব খান না। আর আমার দিক থেকেও আপনাকে লুকো-বার কোনো কারণ নেই। আমি আপনাকে অন্য ঘরে যেতে বলেছিলাম যাতে বিভাসও আপনাকে পৌঁছতে গিয়ে সেখানেই থেকে যায়। বিভাসের মতন একটা ইডিয়েট ছাড়া আর কেউ তার বান্ধবীকে ও রকম একা ঘরে ফেলে চলে আসতো না।

আমি লজ্জায় মুখটা ফিরিয়ে বললাম, এই সব নিয়ে কোনো মন্তব্য করতেও আমার লজ্জা করে।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য ঊর্মি রজতকে বললো, আমি ভূতের কথা বললাম বলে আপনি হেসে উঠলেন কেন?

রজত বললো, ভূত আবার কি?

বাঃ এখানে প্রত্যেক বছরই তো অনেক লোক মরে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভূত হতে পারেনা ?

মানুষ মরলেই ভূত হবে নাকি ? যত সব আজেবাজে কথা। অবশ্য মেয়েরা ভূতের ভয় পেতে ভালোবাসে। এক এক সময় ভয় পেলে মেয়েদের বেশ মানায়।

আপনি বুঝি ভূতে বিশ্বাস করেন না ?

আমি ভূত কিংবা ভগবান কোনোটাতেই বিশ্বাস করি না।

আপনি তাহলে কিসে বিশ্বাস করেন ?

আমি শুধু বিশ্বাস করি, আজকের এই বিশেষ মুহূর্তটাকে। যে সময়টাতে আমি বেঁচে আছি। আমি অতীতের কোনো কিছুর জন্যই অনুতাপ করি না, ভবিষ্যতের জন্যও মাথা ঘামাই না।

তা হলে তো মানুষের ন্যায়-নীতি এসবেরও তো কোনো মূল্য থাকে না।

আমি যে খুব একটা ন্যায়-নীতি করি, সে কথাই বা কে বললো আপনাকে ?

ওদের কথাবার্তার মধ্যে আমি চুপ করে বসেছিলাম। রজত যে কথাগুলো বলছে, তা কখনো মানুষের জীবনে সত্যি হতে পারে না। অতীত বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না, এমন মানুষ নেই। কিছু কিছু ন্যায়-নীতি অধিকাংশ মানুষকেই মানতে হয়, নিজের নিরাপত্তার জন্যই। তবু রজত যে কথাগুলি বলছে, তা অনেক সময় শুনতে ভালো লাগে।

কথাবার্তা আবার ভূতের প্রসঙ্গে ফিরে আসছিল বলে আমি বললাম, রজত তুমি কিন্তু ভেবো না যে ঊর্মি সত্যিই ভূতের ভয় পায় কিংবা বিশ্বাস করে। আমি তো কোনদিন দেখি নি। আজ ওর একা থাকতে ভালো লাগছিল না বলেই ভূতের কথা বলছে।

রজত বললো, ভূত-টুত বোধহয় গত শতাব্দী পর্যন্ত ছিল, এখন আর তারা পৃথিবীতে আসে না।

রজতের এই কথাটা আমি কখনো ভুলি নি। খুবই সাধারণ কথা, তবু আমার মনে দাগ কেটে গিয়েছিল। পরে বহুবার এই কথাটা আমার মনে পড়েছে, ঊর্মিকেও মনে করিয়ে দিয়েছি।

রজত ব্র্যাণ্ডির বোতল থেকে চুমুক দিচ্ছিল। সেই দেখে ঊর্মি আমাকে বললো, বিভাসদা, তুমি খাচ্ছো না কেন ? আমার জন্য ?

আমি যে কোনোদিন ওসব খাই না, ঊর্মি তা ভালো করে জানে। কিংবা

মাঝখানে তিন বছর ও দিল্লীতে ছিল, ভেবেছে বোধহয় সেই সময়ের মধ্যে আমি বদলে গেছি। অথবা ঊর্মি'ই খানিকটা বদলেছে।

আমি বললাম, কেন, তোমারও খেতে ইচ্ছে করছে নাকি?

ঊর্মি অনাবিল ভাবে হেসে বললো, আমি দিল্লীতে দু'একবার খেয়েছি। ওখানকার পার্টি টার্টিতে অনেক মেয়েরাই খায়, কেউ কিছু মনে করে না।

রজত বললো, এখানেও পার্টিতে অনেক মেয়ে খায়, এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়।

আমি ঊর্মিকে বললাম, তোমার ইচ্ছে করে তো একটু খাও না।

ঊর্মি আমার দিকে গাঢ় ভাবে তাকিয়ে বললো, তুমি না খেলে আমি খাবো না।

আমার খেতে ভালো লাগে না তাই খাচ্ছি না, আমার তো কোনো সংস্কার নেই।

রজত একটু ঠাট্টার সুরে বললো, তুমি অনুমতি না দিলে উনি খেতে পাচ্ছেন না।

বাঃ, অনুমতির আবার কি আছে!

ঊর্মি আমার গলায় হাত রেখে আদুরে গলায় বললো, তুমি একটু খাও। কি হবে কিছুই হবে না। তুমি একটু না খেলে আমি কিছুতেই খাবো না।

অগত্যা আমাকে একটা চুমুক নিতেই হলো। প্রথমে গন্ধটাই আমার খুব খারাপ লাগে। তারপর তরল পদার্থটা জ্বলতে জ্বলতে নামে গলা দিয়ে। ঠিক যেন আগুনের একটা স্রোত। উঃ এত কষ্টতেও মানুষ আনন্দ পায়।

বোতলটা আমি বাড়িয়ে দিলাম ঊর্মি'র দিকে। ঊর্মি যখন সেটা মুখের কাছে নিয়ে গেল, তখন আমি আর রজত একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছি। রজত আনমনে তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের ওপর একটা সিগারেট ঠুকছে। এইটা রজতের একটা বাতিকের মতন। প্রত্যেকবার সিগারেট ধরাবার আগে ও নখের ওপর একটু ঠুকবেই কয়েকবার।

ঊর্মি বেশ অবলীলাক্রমেই এক ঢোঁক খেয়ে ফেললো। মুখে কোনো বিকৃতি দেখা গেল না। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁটটা মুছে বললো, এটা কি জিনিস?

রজত বললো, ব্র্যাণ্ডি। তীর্থস্থানে এসে আপনাকে আমি মদ দিলাম কিন্তু।

ব্রাণ্ডিকে ঠিক মদ বলা চলে না। অনেকে অসুখের সময়েও খায়। দিল্লীতে আমার অসুখের সময়েও খেয়েছিলাম।

দিল্লীতে আপনার কি অসুখ হয়েছিল ?

সে যাই হোক না। এখন আমি মোটেই অসুখের গল্প করতে চাই না।

তা হলে এখন কিসের গল্প হবে, বলুন ?

একটা কিছু গল্প বলুন না। আপনি ভূতের গল্প জানেন ?

আপনাকে তো বললামই, আমি ভূতে বিশ্বাস করি না, ভূতের গল্প কি করে জানবো!

ভূত বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, ভূতের গল্প কিন্তু শুনতে কিংবা পড়তে বেশ ভালোই লাগে।

আমি বললাম, রজত ওর নিজের জীবনের কোনো গল্প বলুক বরং। ও তো অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছে। তাছাড়া ওর কত বান্ধবী। তাদের সম্পর্কেও বলতে পারে—

ঊর্মি জিজ্ঞেস করলো, আপনার অনেক বান্ধবী বুঝি ?

রজত কোনো রকম ভনিতা না করে উত্তর দিল, আট দশজন হবে অন্তত। আমি তো কারুর প্রেমে পড়ি না! তবে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে আমার বেশ ভালোই লাগে।

ঊর্মি বললে, ভূত ভগবানের মতন আপনি বুঝি প্রেমেও বিশ্বাস করেন না ?

না। বন্ধুত্বই যথেষ্ট।

মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের ঠিক বন্ধুত্ব হয় ?

কেন হবে না ? আমার সঙ্গে হয়।

ঠিক আছে, আপনার বান্ধবীদের সম্পর্কেই দু'চারটে গল্প বলুন।

রজত আমার দিকে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা আবার বাড়িয়ে দিল। আমি বললাম, না ভাই, আর নেবো না। এক চুমুক দেবার কথা ছিল, সেটা তো হয়ে গেছে—

ঊর্মি আর একটা চুমুক দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, বিভাসদা, আমি আজ একটা সিগারেট খাবো ? খুব ইচ্ছে করছে।

ঊর্মির এই প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা ছেলেমানুষী সরলতা ছিল যে আমার খুব মায়া হলো। তা ছাড়া, মেয়েরা সিগারেট খেতে পারবে না—

এমন কোনো ধারণা আমার নেই। আমি বললাম, খাও না।

রজত ততক্ষণে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছে ওর দিকে। নিজের লাইটারে সেটা ধরিয়ে দিল। ঊর্মি কেশে উঠলো কয়েকবার। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো, তবু ওর মুখে হাসি।

সেইরকম হাসতে হাসতে বললো, এই অবস্থায় আমার বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলতো, কি ভাবতো? মদ খাচ্ছি, সিগারেট খাচ্ছি—

রজত বললো, তা ছাড়া রাত্তিরবেলা দু'জন পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে রয়েছেন—

আমি বললাম, কথাগুলো শুনতে যে রকম খারাপ, আসলে কিন্তু তেমন নয়। মানুষের মনটা কি রকম, তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করে।

এই রকম কথাবার্তা চলছিল। কখন যে আমি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছি, আমি নিজেই জানি না।

আবার চোখ মেলেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম, দেখলাম, ঊর্মি আর রজত শোয় নি। দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ওরা তখনও গল্প করে যাচ্ছে। বাইরে ঈষৎ ভোরের আলো দেখা যায়।

আমাকে জেগে উঠতে দেখে রজত বললো, খুব বাবা! দিব্যি একটা ঘুম সেরে নিলে।

আমি লজ্জিত ভাবে বললাম, কখন যে ঘুম এসে গেছে, নিজেই টের পাই নি। তোমরা আমাকে ডাকলে না কেন?

ঊর্মি বললো, তুমি তো কথা বলতে বলতেই হঠাৎ চোখ বুজলে। প্রথমে তো আমরাও বুঝতে পারি নি যে তুমি ঘুমোচ্ছ। ভেবেছিলাম এমনই চুপ করে আছো।

তোমাদের একটুও ঘুম পায় নি?

ঊর্মি বললো, আমার রাত জাগার অভ্যাস আছে। একটুও ঘুম পায় না।

রজত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আর কি, ভোর তো হয়েই এলো, চলো, এবার বেরুনো যাক।

আমরা তিনজনে ঘর থেকে বাইরে এলাম। বহুলোক এরই মধ্যে জেগে উঠেছে, গঙ্গার ধারে কোলাহল পড়ে গেছে রীতিমতন।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য। কয়েক লক্ষ মানুষ একসঙ্গে নেমে পড়েছে স্নান

করতে। এর মধ্যে আবার বেশ কিছু গরু-বাছুরও আছে। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গরুর ল্যাজ ধরে মন্ত্র পড়লে নাকি মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার হওয়া যায় সহজেই। সেখানেই চলেছে নানা রকম চিৎকার ও মন্ত্রপাঠ। পুণ্য অর্জনের কি ব্যাকুল চেষ্টা।

দূরে গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, সেই বিপুল জলরাশিতে মিশেছে নতুন সূর্যের রক্তিম আলো। সেদিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে যায়। আমি আগেও বহুবার সমুদ্র দেখেছি, তবু আমাদের আবাল্য-পরিচিত গঙ্গা নদী এখানে এসে লীন হয়ে যাচ্ছে, এই কথা ভাবলে রোমাঞ্চ হয়।

রজত বলে, চলো, আমরাও স্নানটা করে নিই, তা হলে বেশ ফ্রেস লাগবে।

ঊর্মি বললো, আমি তা হলে তোয়ালে টোয়ালেগুলো নিয়ে আসি?

আমি খুব একটা উৎসাহিত বোধ করলাম না। এত লোকের ভিড়ের মধ্যে স্নান করতে আমার একটুও ভালো লাগে না। কি রকম যেন নোংরা নোংরা মনে হয়। তীর্থযাত্রীরা সাধারণত পরিচ্ছন্ন হয় না। যে গঙ্গা নদীকে তারা এত পবিত্র মনে করে, সেখানেই তারা থুতু ফেলছে কিংবা নাক ঝাড়ছে।

রজত সেখানেই তার শার্ট ও প্যাণ্ট খুলে ফেললো। এত লোকজনের সামনে জামাকাপড় ছাড়তে তার একটুও লজ্জা হয় না। গেঞ্জিটাও খুলে ফেলে সে শুধু আণ্ডারওয়্যার পরে জলে নামবার জন্য তৈরি হলো।

আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি জামা টামা খুলবে না?

আমি স্নান করবো না।

সেকি? এতদূর কষ্ট করে এসে শেষ পর্যন্ত স্নান করবে না?

আমি তো স্নান করতে আসি নি, দেখতে এসেছি।

রজত আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। বার বার বলতে লাগলো, আরে চলো, চলো! একবার নেমে পড়লেই—

না ভাই, সত্যি আমার ইচ্ছে করছে না!

তুমি যে জলকে এত ভয় পাও, তা তো জানতুম না।

আমি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। এই সময় ঊর্মি তোয়ালে জামাকাপড় নিয়ে এসে হাজির হলো।

রজত তাকে বললো, আপনার বিভাসদা তো স্নান করতে রাজি নয়।

ঊর্মি বললো, একি, তুমি স্নান করবে না ?

নাঃ, তোমরা যাও।

ঊর্মি আমাকে আর বেশী জোর করলো না। ওরা দু'জনে চলে গেল জলের দিকে। রীতিমতন মানুষদের দল ঠেলে সরিয়ে সরিয়ে যেতে হয়।

ঊর্মি ওর শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বেঁধেছে। পায়ের খানিকটা উঁচু করে তুলে ধরেছে। জলে এক পা ছুঁইয়েই বললো বাবাঃ বেশ ঠাণ্ডা।

রজত ঊর্মির হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে গেল। একটু বাদে ওদের আর দেখতে পেলাম না মানুষের ভিড়ে ভিড়ে। আমি তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রজত আর ঊর্মির পোশাক পাহারা দিতে লাগলাম।

ওদের দু'জনকে বোধহয় স্নানের নেশায় পেয়ে বসেছে। আধঘণ্টার মধ্যেও ওঠার নাম নেই। মাঝে মাঝে দেখতে পাই, মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। চারিদিকে এত গোলমাল যে আমি চেঁচিয়ে কিছু বললেও ওরা শুনতে পাবে না।

ওপরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে একটা ব্যাপারে আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগলো। ভারতের বিভিন্ন জাতের নারী-পুরুষ স্নান করতে এসেছে এখানে। অনেকেরই আবার ব্যবহার আলাদা। অনেক মেয়েরা এখানে যে পোশাকে স্নান করতে নেমেছে কিংবা স্নান করে উঠে যেভাবে পোশাক বদলাচ্ছে, সেটা ঠিক আমাদের বাংলাদেশের মতন নয়। এরা অনেকেই ব্লাউজ পরে না এবং সম্পূর্ণ বুকটা খুলে দাঁড়াতে কোনো লজ্জা নেই। আমি পুরুষ মানুষ, আমার চোখ তো সেদিকে যাবেই।

কিন্তু এক সময় আমার মনে হলো, লোকেরা বোধহয় ভাবছে, আমি স্নান করতে আসিনি, আমি শুধু তীরে দাঁড়িয়ে এইসব লোভনীয় দৃশ্য দেখতেই বুঝি এসেছি। যদি ও সেখানে এত রকম মানুষের এত ভিড় যে এ রকম কথা নিয়ে চিন্তা করার কারুর সময় নেই, তবু আমার অস্বস্তি যায় না। আমি এই রকমই। এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আমি চিন্তা করি। আরও হাজারটা লোক ওখানে মেয়েদের পোশাক বদলানো কিংবা নগ্ন বুক দেখছে কিন্তু আমি লজ্জায় সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হলাম।

এবার ঊর্মি আর রজত উঠে এলো। ভিজে শাড়ী ও ভিজে চুলে অপূর্ব দেখাচ্ছে ঊর্মিকে। ওর সমস্ত শরীরের রেখাগুলি ফুটে উঠেছে—আমি সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকি অনায়াসেই, আমার লজ্জা করে না। কারণ ঊর্মি আমার।

ঊর্মি আমার দিকে দৌড়ে এসে বললে, তুমি নামলে না, দেখতে তোমার খুব ভালো লাগতো।

আর একটু ভিড় কমুক। দুপুরের দিকে নামবো।

আর নেমেছো!

তুমি তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে নাও। শীত করছে না ?

এখন আর একটুও শীত করছে না। আরও অনেকক্ষণ জলে থাকতে পারতাম। তোমার কথা ভেবেই উঠে এলাম।

ভালোই করেছো।

রজতের বোধহয় কানে জল ঢুকেছে, তাই সে লাফালাফি করে জলটা বার করবার চেষ্টা করছে। বিরাট লম্বা চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—বহু নারী-পুরুষ তাকিয়ে দেখছে রজতের দিকে।

রজত আমাকে হাসতে হাসতে বললো, এত ভালো স্নান করেছি যে সব পাপ টাপ ধুয়ে গেছে বুঝলে ? তুমি কিন্তু পাপীই রয়ে গেলে।

আমি বললাম, দু একজন পাপী না থাকলে পৃথিবীটা বড্ড বাজে জায়গা হয়ে যাবে।

ঘরে ফিরে এসে ওরা দু'জন পোশাক টোশাক বদলে নিল। তারপর আমরা চায়ের সন্ধানে বেরুলাম। চা-টা খেয়ে, কপিলমুনির আশ্রমটা দেখে, মেলার দোকানপাট ঘুরে আবার ফিরে এলাম ঘরে। রজতের ইচ্ছে এবার একটা ঘুম দেওয়া।

দিনের বেলা বিশেষ কিছু করার নেই। আমাদের ফেরার কথা ছিল বিকেলে। কিন্তু খাবার খেতে গিয়েই আমরা একটা খবর পেয়ে গেলাম। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের জন্য একটি লঞ্চ তক্ষুণি ছাড়বে। রজতের সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে, আমাদের তিনজনের জায়গা হয়ে যেতে পারে সেখানে। লঞ্চটা এখান থেকে সরাসরি কলকাতা পর্যন্ত যাবে, সুতরাং এটাতে ফেরা অনেক সুবিধের। রজত কথা বলে এলো। আমরা একটা হোটেল দেখে খুব তাড়াতাড়ি ডাল ভাত মাছের ঝোল খেয়ে নিলাম। এখানে আর থাকার কোনো মানে হয় না, যা দেখার তো হয়েই গেছে।

সাগরদ্বীপে কোনো জেটি-ঘাট নেই, জোয়ারের জল কখন কতদূর পর্যন্ত আসবে তার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। সুতরাং স্টিমার বা লঞ্চ একেবারে পাড়ের কাছে ভিড়তে পারে না। নদীর ওপরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে,

সে পর্যন্ত নৌকো করে যেতে হয়।

তখন ভাঁটার সময়। পারের কাছে থকথকে কাদা, সেই কাদা ভেঙে গিয়ে উঠতে হবে খেয়ার নৌকোতে। আমরা জুতো খুলে হাতে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে কোনক্রমে এসে নৌকোয় উঠলাম। অনেকেই ফেরার জন্য ব্যস্ত বলে খেয়া নৌকোগুলিতে এখন দারুণ ভিড়। মাঝিরাও পয়সার লোভে অত্যধিক যাত্রী তোলে। প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা হয়।

আমাদের নৌকোতেও একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এবং রীতিমত নাটকীয়।

ছটফটে স্বভাব রজতের। সে নৌকোয় উঠেই মাঝিদের ওপর হম্বি-তম্বি করতে লাগলো, এক্ষুণি নৌকো ছাড়ো।

মাঝিরা আরও লোক তুলছে। অনেক লোক হাঁটু-জলে এসে দাঁড়িয়ে নৌকোয় ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের নৌকোটা বিপজ্জনক ভাবে ভর্তি হয়ে গেল। রজত মাঝিদের ধমকাতে লাগলো সেই জন্য।

নৌকোটা ছাড়ার পর একটুখানিক মাত্র এগিয়েছে, এই সময় হঠাৎ সেটা হেলে গেল একদিকে। এই সময় মাথা ঠাণ্ডা করার বদলে লোকে আরও ঝটাপটি শুরু করে। মাঝিরা সামাল সামাল বলার আগেই নৌকো কাৎ হয়ে দু'তিনজন পড়ে গেল জলে। তাদের মধ্যে ঊর্মিও আছে।

আমি সেটা দেখতে পেলেও চঞ্চল হই নি। সেখানে ভয়ের কিছু নেই, বড় জোর বুক-জল। কেউই সেখানে ডুববে না, নৌকোটা ঠিক রাখতে পারলে ওদের ঠিকই টেনে তোলা যাবে। কিন্তু সেই চেষ্টা করার বদলে সবাই দারুণ চিৎকার করে একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসলো।

সামান্য ব্যাপারকেও অতি-নাটকীয় করে তুলতে চায় রজত। ঊর্মি জলে পড়ে যেতেই ওর মাথার ঠিক রইলো না। মধ্যযুগীয় নাইটদের মতন বিপন্না নারীকে উদ্ধার করার জন্য ও তৎক্ষণাৎ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো। প্রবল বিক্রমে ও নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

আসল বিপদটা রজতই বাধালো। ওর অত বড় শরীর নিয়ে লাফিয়ে পড়ায় পায়ের ধাক্কায় নৌকোটা ছিটকে চলে গেল দূরে, টালমাটাল হয়ে গেল, উল্টো দিক থেকে আরও কয়েকজন টুপটাপ করে গাছ-পাকা ফলের মতন পড়তে লাগলো জলে। আমিও পড়ে যাচ্ছিলাম, সামলে নিলাম কোনক্রমে।

তাকিয়ে দেখি, একটি ন'দশ বছরের ছেলে বসেছিল আমার পাশে, সে সেখানে নেই। জলের মধ্যে ছেলেটা খাবি খাচ্ছে।

আমি ঊর্মি'র জন্য চিন্তা করলাম না, কারণ ও যেখানে পড়েছে প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু এই ছেলেটি সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। এখানে জল গভীর, ওর পক্ষে তো বটেই। আমি খুব সাবধানে ঝাঁপ দিলাম নৌকো থেকে।

আশে পাশে আরও বেশ কিছু নৌকো এবং অনেক মানুষজন ছিল। তাদের কোলাহলে জায়গাটা রীতিমত সরগরম হয়ে উঠলো। একে তো নৌকো থেকে মানুষ পড়ে যাওয়াই যথেষ্ট উত্তেজক দৃশ্য, তার ওপর দু'জন সমর্থ চেহারার পুরুষ যদি একটি যুবতী ও একটি বালককে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা হলে ব্যাপারটা তো আরও রোমাঞ্চকর হবেই।

অবশ্য, বালক-উদ্ধারের চেয়ে যুবতী-উদ্ধারই যে বেশী মনযোগ আকর্ষণ করবে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঊর্মি'কে রজত যখন নৌকোয় তুললো তখন বহু হাত এগিয়ে এলো সেদিকে। আমি ছেলেটিকে ধরতে পারছিলাম না, একটা চলন্ত লঞ্চের বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সে ওলোট-পালোট খাচ্ছিল, আমি তাকে দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধরে বুক-সাঁতার কেটে নিয়ে এলাম নৌকোর কাছে। ছেলেটির মা তখন হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

যাই হোক, ইতিমধ্যে আর একটি নৌকো এগিয়ে এসেছিল আমাদের সাহায্যের জন্য। যাত্রীদের ভাগ করে দেওয়া হলো দুটো নৌকোয়। পূর্বে'র নৌকোয় মাঝিদের রজত তখন মারধোর করতে শুরু করেছে। আমি মাঝখানে এসে থামালাম।

ঊর্মি'র মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে সব সময় হাসিখুশী থাকে, কোনো অসুবিধেই গ্রাহ্য করে না—কিন্তু হঠাৎ জলে পড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঊর্মি', তোমার লাগে টাগে নি তো কোথাও ?

ঊর্মি' মাথা নাড়িয়ে জানালো, না। মুখে কিছুই বললো না।

আমি ওকে চাঙ্গা করার জন্য বললাম, কি, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি ? বেশ তো একটা অ্যাডভেঞ্চার হলো।

ঊর্মি' চুপ করে রইলো।

ভিজে জামাকাপড়েই আমরা লঞ্চে এসে উঠলাম। এটা সরকারী লঞ্চ, এতে

অন্য যাত্রী নেওয়া হবে না—কয়েকজন মাত্র সরকারী অফিসার, আর আমরা তিনজন। প্রচুর জায়গা আছে।

আমি ঊর্মি'কে বললাম বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় বদলে নিতে। তারপর আমরা যাবো। কিন্তু ঊর্মি' কোনো উৎসাহ দেখালো না। ঠকঠক করে কাঁপছে, ঠোঁট বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবুও ভিজে কাপড় বদলাতে চাইছে না।

আমি একরকম জোর করেই ঊর্মি'কে বাথরুমে পাঠালাম। এ ঘটনাটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন ঊর্মি'? এর মধ্যে কি আছে? প্রায় তীরের কাছেই নৌকো থেকে জলে পড়ে যাওয়া তো একটা হাসিরই ব্যাপার।

রজত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে যেন। ঊর্মি' বাথরুমে যাবার পর রজত বিস্মিত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বিভাস, তুমি তাহলে সাঁতার জানো।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তো ছেলেবেলা থেকেই সাঁতার জানি। কেন, কি হয়েছে?

আমার ধারণা ছিল না।

কি ধারণা ছিল না?

আমি ভেবেছিলাম, তুমি সাঁতার জানো না, তুমি জলকে ভয় পাও। সেই আগে একদিন গঙ্গায় নৌকোতে উঠে তুমি যে রকম কথা বলেছিলে, কিংবা আজ সকালে স্নান করতে চাইলে না—

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, তীর্থস্থানে এসে স্নান করা বোধ-হয় আমার নিয়তিতে লেখা ছিল। আমি স্নান করতে না চাইলেও পাকে-চক্রে ঠিকই হয়ে গেল।

রজত হাসলো না। একটু লজ্জিত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি বুঝতে পেরেছি ঠিকই, রজত কি ভাবছে। রজত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ঊর্মি' আমার বান্ধবী, সে বিপদে পড়লে আমারই উদ্ধার করতে যাওয়ার কথা। আমি অপারগ হলে অন্য কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু রজত আমাকে কোনো সুযোগই দেয় নি, সে আগে থেকেই সিনেমার হীরোর মতন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমিও যদি বাচ্চা ছেলেটির জন্য ঝাঁপিয়ে না পড়তুম, তাহলে সকলে আমাকে কাপুরুষ ভাবতে পারতো। আমি অবশ্য সে সব কথা চিন্তা করে জলে নামি নি।

আমি রজতের মনের কুয়াশা কাটিয়ে দেবার জন্য আবার হেসে উঠলাম।

এটা এমন কিছু গুরুত্ব দেবার মতন ব্যাপার নয়। এ রকম হতেই পারে। কখনো কখনো হয়ে যায়।

কিন্তু ফেরার পথে সমস্ত সময় রজত আর ঊর্মি, কেউই সহজ হতে পারলো না।

৫

গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পর কিছুদিন আমি আমার বোনের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত হয়ে রইলাম। ঊর্মি'র সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ আমি ওদের বাড়িতে যেতে পারি নি।

হঠাৎ একদিন খেয়াল হলো, ঊর্মি' তো আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন আসে নি। ও তো অনায়াসেই আসতে পারে। আগে যেমন এসেছে।

আমার বোন ঝর্ণাও আমাকে একদিন বললো, সেজদা, তোমার সঙ্গে ঊর্মি'দির কি ঝগড়া হয়েছে?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন রে?

অনেকদিন আসে না তো!

ভেবেছে বোধহয় কাজের বাড়ি, সবাই খুব ব্যস্ত থাকবে।

আহা, ঊর্মি'দি এলে বুঝি কাজের ক্ষতি হবে?

আসবে নিশ্চয়ই দু'একদিনের মধ্যে।

পরশুদিন নিউমার্কেটের কাছে ঊর্মি'দির সঙ্গে দেখা হলো। কি রকম যেন গম্ভীর গম্ভীর দেখলাম। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, খুব লম্বা, মাথায় বড় বড় চুল—ঊর্মি'দিকে আসতে বললাম বাড়িতে, খুব একটা উৎসাহ দেখালো না।

আমার মনে হলো ঝর্ণা বোধহয় ঊর্মি'র নামে কিছু একটা নালিশ করতে চাইছে। এর প্রশ্রয় দিতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রসঙ্গটা বদলে ফেলে বললাম, তোর ফার্নিচারের অর্ডার দিতে যাবো আজ। তুই পছন্দ করে নিতে যাবি তো আমার সঙ্গে?

ঝর্ণার কথা উড়িয়ে দিলেও ঊর্মি'র কথাটা আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো। ঊর্মি'কে বেশীদিন না দেখলে আমার কষ্ট হয়। ও যখন দিল্লীতে ছিল,

তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ঊর্মি'কে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমিই ওকে কলকাতায় জোর করে ফিরিয়ে এনেছি। ঊর্মি'কে দেখলে, ঊর্মি' কাছে থাকলে আমার এই জীবনটা সত্যি সত্যি বেঁচে থাকার যোগ্য মনে হয়।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা গেলাম ঊর্মি'দের বাড়িতে। কিন্তু ওকে পেলাম না। ঊর্মি' দুপুরবেলাই কোথায় যেন বেরিয়েছে। ঊর্মি'র মা বললেন, ও নাকি হঠাৎ একটা চাকরি খোঁজার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকতে ওর ভালো লাগে না। ও চাকরি করবেই।

মেয়েদের চাকরি করার ব্যাপরটা আমার খুব একটা পছন্দ হয় না। আমি নারী-স্বাধীনতার বিরোধী নই। মেয়েরা যা খুশী সেটাই করতে পারে। কিন্তু চাকরি করাটা মোটেই একটা সুখের ব্যাপার নয়। আমরা চাকরি করি নিতান্ত বাধ্য হয়ে। সুতরাং যে মেয়েদের টাকা উপার্জনের প্রশ্নটা খুব বড় নয়, তারা শুধু সময় কাটাবার জন্য চাকরি করতে যাবে কেন? সময় কাটাবার আরও কত ভালো উপায় আছে, গান-বাজনার চর্চা করা, অন্যদের নানা কাজে সাহায্য করা, কিংবা স্রেফ বই পড়া।

ঊর্মি' যদি সত্যিই চাকরি করতে চায়, আমি অবশ্যই তাতে বাধা দেবো না। কিন্তু এ ব্যাপারে ওর প্রথমেই আমাকে বলাই তো ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। আমাকে কিছু জানালো না কেন? হয়তো ঊর্মি' ভেবেছে, একেবারে একটা চাকরি যোগাড় করে ও আমাকে চমকে দেবে।

ঊর্মি'র মাকে কিছু না বলে আমি উঠলাম একটু বাদে। গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বললাম একটু ধর্মতলা ঘুরে যেতে। ওখান থেকে কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে যেতে হবে।

এলগিন রোডের কাছে ঠিক আমার গাড়ির পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল একটা মোটরসাইকেল খুব আওয়াজ তুলে। রঙীন জামা পরা রজত, হাওয়ায় উড়ছে তার লম্বা চুল। তার পেছনে যে মেয়েটি বসে আছে তার মুখ দেখতে না পেলেও ঊর্মি'কে চিনতে আমার ভুল হয় না। ঊর্মি'র শুধু পিঠ বা হাত বা শরীরের যে-কোন অংশ দেখলেই বোধহয় আমি চিনতে পারি।

ওরা আমাকে দেখতে পায় নি। প্রায় চোখের নিমেষেই বাঁ দিকে বেঁকে গেল, ঊর্মি'দের বাড়ির দিকেই। হয়তো রাস্তায় কোথাও ঊর্মি'র সঙ্গে রজতের দেখা হয়ে গিয়েছিল, রজত ওকে বাড়িতে পেঁছে দিচ্ছে। আজকাল ট্রামে-

বাসে যা ভিড়, একা কোনো মেয়ের পক্ষে ট্যাক্সিতে ঘোরাও তেমন নিরাপদ নয়—সুতরাং রজত ওকে পে'ছে দিয়ে উপকারই করছে। অনেক মেয়ে মোটরবাইকের পেছনে চাপতে ভয় পায়—কিন্তু উর্মি এইসব উত্তেজনাই বেশী পছন্দ করে।

আজ রাত হয়ে গেছে, আজ আর উর্মিদের বাড়িতে এখন গিয়ে দরকার নেই। কাল গেলেই হবে। তা ছাড়া উর্মি যখন বাড়িতে গিয়েই শুনবে যে আমি এসেছিলাম।

ধর্মতলার দিকে খানিকটা এগিয়েই আমি হঠাৎ রোক্‌কে রোক্‌কে বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। ড্রাইভার ফিরে তাকাতেই আমি বললাম, গাড়ি ঘোরাও।

ড্রাইভার একটু বিস্মিত হয়ে গাড়ি ঘোরাতে শুরু করলো। রাস্তার ওপরে এরকম ভাবে গাড়ি ঘোরানো শক্ত। তবু যেন আমার জেদ চেপে গেল যে এক্ষুনি উর্মির সঙ্গে দেখা করতে হবেই। না দেখা করে চলবেই না।

কিন্তু একটু বাদেই আমার লজ্জা করতে লাগলো। এক্ষুনি উর্মিদের বাড়ি থেকে এসেছি, আবার এর মধ্যেই ফিরে যাবো? বাড়ির সকলে কি ভাববে? আমার চরিত্রে তো এরকম আবেগের বাড়াবাড়ি থাকার কথা নয়।

সুতরাং আমি ড্রাইভারকে আবার বললাম থাক, ওদিকে আর যাবার দরকার নেই। আবার ঘোরাও, ধর্মতলার দিকেই চলো।

ড্রাইভার আগে কখনো আমার এমন অস্থিরচিত্ততার প্রমাণ পায় নি। সে রীতিমতন অবাক হয়ে বার বার চোরা চাহনি দিতে লাগলো আমার দিকে, মুখে কিছু বললো না যদিও। আমি নিজেও নিজের ব্যবহারে অবাক হচ্ছিলাম।

মানুষের জীবনে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত আসে, যখন একটি কথা বা একটি সিদ্ধান্তে সবকিছু বদলে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় সেই বিশেষ মুহূর্ত এসে পড়লেও ঠিক চেনা যায় না। অথবা মনঃস্থির করতে করতেই সেই সময়টা পেরিয়ে যায়। আমারও বোধহয় সেইরকম কিছুই হয়েছিল।

কয়েকদিন পরেই উর্মির সঙ্গে হঠাৎ আমার দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল। এর আগে আমরা পরস্পরকে একটাও কঠিন কথা বলি নি পর্যন্ত। আমাদের দু'জনের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু সেদিন আমরা দুজনেই মেজাজের সংযম হারিয়ে ফেললাম।

আমি ঊর্মি'র বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পরদিনও ঊর্মি' আমাদের বাড়িতে আসে নি। ব্যাপারটাতে বেশ খটকা লেগেছিল আমার। ঊর্মি' তো এরকম ব্যবহার কখনো করে না।

ঊর্মি'র সঙ্গে দেখা হবার আগেই রজতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রজতের ব্যবহার স্বাভাবিক। সে কথায় কথায় জানালো যে ঊর্মি' একদিন ওদের কাগজের অফিসে এসেছিল। কখনো তো কাগজের অফিস দেখে নি, সেই কৌতূহলে। রজত ওকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে রোটারি মেশিন, টেলি-প্রিন্টার, ব্লক কি করে তৈরি হয় এই সব। তারপর কফি হাউসে নিয়ে গিয়ে কফি খাইয়ে নিজের মোটরবাইকে বাড়িতে পেঁছে দিয়েছে।

ঊর্মি' সেদিনই কথায় কথায় রজতকে বলেছে যে সে একটা চাকরি চায়। সে-ও কি খবরের কাগজের অফিসে চাকরি পেতে পারে না? মেয়েরা সাংবাদিক হতে পারবে না কেন? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তো অনেক নাম-করা মেয়ে সাংবাদিক আছে।

রজত হাসতে হাসতে এই সব কথা বললো আমাকে। আমিও হাসলাম। রজত আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো, বিভাস, তুমি খুব লাকি। তুমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো, সে খুব স্পিরিটেড গার্ল। দেখতে তো সুন্দর বটেই। কিন্তু শুধু রূপটাই বড় কথা নয়,—ওর চরিত্রে যে রকম তেজ আছে—

আমি খুশী হয়েছিলাম রজতের কথা শুনে। যে ঊর্মি'র প্রশংসা করে, সে আমার কৃতজ্ঞতা পায়।

ঊর্মি'দের বাড়িতে সকালবেলা গিয়ে ওকে পেলাম। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার তোমার? পাত্তাই নেই যে?

ঊর্মি' উল্টো অভিযোগ করে বললো, তুমিই তো আমার কোনো খোঁজখবর করো না। তুমি বোধহয় আজকাল আর আমাকে তেমন পছন্দ করো না, তাই না?

মেয়েদের একটা সুবিধে আছে, তারা যুক্তি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তাই যে কোনো কথাই বলে দিতে পারে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এসব আবার কি উল্টো-পাল্টা কথা?

ঊর্মি' হাসলো না। মুখে তার অভিমানের হালকা ছায়া। মুখটা অন্য-দিকে রেখে বললো, আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি, তাই না? জানি, তুমি

খুব ভালো, খুব মহৎ, আমি তোমার যোগ্য নেই।

আমি একটু বিচলিত হয়ে ঊর্মি'র কাছে এসে ওর হাত ধরে বললাম, তুমি এসব কি বলছো, ঊর্মি? তোমার কি হয়েছে বলো তো?

কিছু হয় নি।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, তুমি আমাকেও বলবে না?

কি আবার বলবো?

তুমি নাকি চাকরি খুঁজছো? হঠাৎ কেন?

কেন মানে? আমার কি স্বাধীন ভাবে কিছু করার অধিকার নেই?

ঊর্মি এই কথাটা ঝাঁঝের সঙ্গে বললো বলেই আমি আঘাত পেলাম। আমি কি ঊর্মি'র কোনো কাজে কখনো বাধা দিয়েছি?

আমি ধীর স্বরে বললাম, তোমার চাকরির দরকার হলে আমিই বোধহয় খুব সহজে তোমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম।

যাক, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তুমি তো অনেক কিছুই করেছো আমার জন্য।

ঊর্মি, তুমি কি আজ আমাকে শুধু আঘাত দিয়েই কথা বলতে চাও?

আমি কি তোমাকে আঘাত দিতে পারি? আমার কি সেটুকুও মূল্য আছে তোমার কাছে?

ঊর্মি, তুমি জানো না, তোমার জন্য আমি—

আমি সবই জানি। আমি তোমার কাছে একটা খেলনা মাত্র। যখন ইচ্ছে হবে, আমাকে নিয়ে খেলা করবে। যখন ইচ্ছে হবে না, তখন একবারও ভাববে না আমার কথা—তখন আমি বেঁচেই থাকি কিংবা মরেই যাই।

ঊর্মি! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? এসব কি কথা।

আমি ঠিকই বলছি। আমার জীবনের কোনো দাম আছে তোমার কাছে? আমি নৌকো থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, তুমি আমার দিকে হাতটাও বাড়িয়ে দাও নি। তুমি গ্রাহ্যও করো নি।

আমার হাসি পেল। ঊর্মি সেই ব্যাপারটা নিয়ে এতখানি অভিমান করেছে? ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!

হাসতে হাসতেই বললাম, জলে পড়ে গিয়ে তুমি এত ভয় পেয়েছিলে? তুমি কি ভেবেছিলে, তুমি মরে যাবে?

ঊর্মি শুকনো গলায় বললে, মরে গেলে যেতাম! কি আর হতো!

আরে দূর! ওখানে তো মাত্র বুক-জল, ওখানে কি কেউ ডোবে নাকি!

আমার নিশ্বাস আটকে আসছিল—আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়লো —তবু তুমি—

আরে এটা তো একটা সামান্য ব্যাপার।

তোমার কাছে তো সামান্য হবেই।

আমি চুপ করে গেলাম। রজত যে আমাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে আগেই নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এটা বলতে গিয়েও আমার জিভ আটকে গেল। আড়ালে কোনো বন্ধুর নিন্দে বা সমালোচনা করা আমার পছন্দ হয় না। রজত একটা কৃতিত্ব দেখাতে চেয়েছিল, তাতে কি আর এমন ক্ষতি হয়েছে।

ঊর্মি'র দাদা-বৌদি দিল্লীতে চলে যাবার ফলে এ বাড়িটাতে এখন লোক-জন বিশেষ নেই। ঊর্মি'র বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, ওর মা আছেন দোতলায়। একতলার বসবার ঘরে শুধু আমি আর ঊর্মি'। একটা জাম রঙের শাড়ি পরে ঊর্মি' বসে আছে দূরের সোফায়। আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। খুবই রেগে আছে মনে হচ্ছে। গঙ্গাসাগরের ব্যাপারটায় যে এত গুরুত্ব থাকতে পারে, তা আমি কল্পনাই করতে পারি নি। এই সুন্দর সকালবেলাটা ঝগড়া করে কাটাবার কোনো মানে হয় না।

আমি বললাম, তুমি রজতের অফিসে গিয়েছিলে? কেমন লাগলো খবরের কাগজের অফিস?

ঊর্মি' বললো, আমি ওদের অফিসে গিয়েছিলাম? কে বললো তোমাকে?

কেন, তুমি যাও নি?

না।

আমি এবার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, এর মধ্যে রজতের সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি বলতে চাও?

ঊর্মি' কঠোর মুখ করে আবার বললো, না।

হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল। ঊর্মি' তো কখনো এ রকম ছিল না। এরকম ভাবে বদলে গেল কি করে! মিথ্যে কথা বলা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। রজতের সঙ্গে ঊর্মি' দেখা করলে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু ও সে কথা আমার কাছে গোপন করবে কেন?

আমি জোর দিয়ে বললাম, আমি নিজের চোখে দেখেছি, তুমি রজতের

মোটরসাইকেলের পেছনে চেপে আসছো।

উর্মি ব্যঙ্গের স্বরে বললো, তাই নাকি? তুমি নিজের চোখে দেখেছো? যদি চেপেই থাকি, সেটা কি খুব অপরাধ?

মোটেই আমি বলি নি সেটা অপরাধ। তুমি নিশ্চয়ই দেখা করতে পারো কিন্তু তুমি সেটা গোপন করতে চাইছিলে কেন?

মোটেই আমি গোপন করতে চাই নি। আমি খুব ভালো ভাবেই জানি। তুমি দেখেছো। এলগিন রোডের কাছে, তোমার গাড়ির পাশ দিয়েই আমরা এলাম। তুমি কেন তখন আমাদের ডাকো নি? কিংবা কেন গাড়ি ঘুরিয়ে আসো নি? আমরা একটু দূরে থেমে পড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোমার মনে পাপ আছে, তাই তুমিই সেটা আগে গোপন করে আমাকে জেরা করতে চাইছিলে।

ছিঃ উর্মি, তুমি আমাকে এরকম ছোট ভাবলে?

তুমি বলো, তুমি প্রথমেই কেন বললে না আমাকে রজতের মোটরবাইকের পেছনে দেখেছিলে? কেন জেরা করতে শুরু করলে?

একটা সাধারণ কথা জিজ্ঞেস করতে পারবো না?

এটা সাধারণ কথা।

আর আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। এই সময় যদি প্রসঙ্গটা বদলাতে পারতাম কিংবা ঘরে অন্য কেউএসে পড়তো, তাহলে সব ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে যেত। তার বদলে, আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, ধরা পড়ে গেছো কিনা, তাই এখন ঐ কথা বলছো! তুমি আমাকে না জানিয়ে রজতের অফিসে গিয়েছিলে?

উর্মিও অত্যন্ত জেদী মেয়ে। রাগের সময় ওর জ্ঞান থাকে না। আমাকে বাধা দিয়ে ও কথার মাঝখানেই বললো, শুধু ওর অফিসে কেন, ওর বাড়িতেও গিয়েছিলাম একদিন।

ও, এতদূর! আমার বোন নিউমার্কেটের সামনেও তোমাকে একদিন দেখেছে রজতের সঙ্গে।

বেশ করেছি! আমার যেখানে খুশী, যার সঙ্গে খুশী যাবো। আমি কি খাঁচার পাখী?

এর পরে ঝগড়া চরমে উঠলো। আমি রাগে কাঁপতে কাঁপতে উর্মির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। আসবার সময় বলে এলাম, তোমার যা খুশী

করো। আর কোনোদিন আমি তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

ঊর্মি'র রাগ বেশীক্ষণ থাকে না। একটা দিন কাটলেই ঊর্মি'র সঙ্গে আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যেত। এর আগেও দেখেছি, দিনের বেলা ঊর্মি' কারুর সঙ্গে ঝগড়া করলে সেদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদবে। সকালবেলাই তার কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে।

কিন্তু এবার সে রকম হলো না। আমি চলে যাবার একটু পরেই ঊর্মি'ও বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। সোজা গিয়ে উপস্থিত হলো রজতের ফ্ল্যাটে। জেদের বসে বললো আমি আর কোথাও যাবো না। আমি এইখানেই থাকব। আপনি কি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন?

রজত ঊর্মি'কে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করলো। রাগ করলো, ধমকালো, ঊর্মি' তখন কিছুই শুনবে না। তারপর রজত ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ওর পিঠে হাত ছোঁয়ালো। একবার স্পর্শে'র পর সব কিছু বদলে যায়। রজত তো বলেই ছিল, সে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

৬

ঠিক আটদিন পরে রজত এসে দেখা করলো আমার অফিসে। আমার একটা ছোটো-খাটো ঘর আছে, সেটার দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রজত জিজ্ঞেস করলো, বিভাস, তুমি কি খুব ব্যস্ত? আসতে পারি?

রজতকে দেখেই আমি একটা ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেললাম। অফিস থেকে আমাকে বম্বেতে ট্রান্সফার করার কথা চলছিলো বেশ কিছুদিন ধরেই। সেখানে গেলে আমার চাকরিতে প্রমোশন হবে, সুযোগ-সুবিধেও অনেক বেশী পাবো। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না।

রজতকে বললাম, তুমি এক মিনিট বসো। আমি ম্যানেজারের ঘর থেকে এক্ষুণি আসছি।

ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে বললাম, স্যার, আমি বম্বেতে যেতে রাজী আছি। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করুন।

ফিরে এসে দেখলাম, রজত ওর বুড়ো আঙুলের নখে অন্যমনস্ক ভাবে

সিগারেট ঠুকছে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার বলো ? কফি-টফি খাবে ?

রজত মুখ তুলে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। মুখটা দেখেই বোঝা যায় ওর মনের মধ্যে একটা বিরাট দ্বন্দ্ব চলছে। রজত যদি কোনো বদমাইস লম্পট ধরনের মানুষ হতো তাহলে ওর কোনো অসুবিধেই ছিল না। ও ভদ্রলোক বলেই কষ্ট পাচ্ছে।

রজত বললো, তোমার সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা আছে। কিন্তু এখানে বসে ঠিক—তুমি কি একটু বেরুতে পারবে ? খুব কাজ আছে ?

আমি বললাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে নিতে পারি, যদি বসতে পারো।

আমি বসছি।

আমি কাজ করতে লাগলাম। রজত চুপচাপ বসে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করতে লাগল।

তারপর এক সময় বেরুলাম। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে বললাম, কোথায় যাবে ?

রজত বললো, আমার ফ্ল্যাটেই সুবিধে। তোমার আপত্তি আছে ?

না, না, আপত্তি থাকবে কেন ?

রজতের ফ্ল্যাটে আমি আগে দু'তিনবার এসেছি। ব্যাচেলারের ফ্ল্যাট, এখানে বন্ধুবান্ধবদের দারুণ আড্ডা হয়। আমি অবশ্য রজতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন নয়—আমার নিজের কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নেই—ওদের তাস খেলা বা মদের আড্ডায় আমি সে রকম ভাবে যোগ দিতে পারি না।

আগের বার এসে ফ্ল্যাটটাকে অত্যন্ত অগোছালো দেখেছিলাম। এখন সেখানে যত্নের স্পর্শ আছে।

ঘরে ঢুকেই রজত টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করলো, ঢক ঢক করে চুমুক দিলো খানিকটা। তারপর আমার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, খাবে একটু ?

আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। মানসিক উত্তেজনা দমন করার জন্য রজতের ব্র্যাণ্ডির দরকার হয়, কিন্তু আমার হয় না।

দু'জনে দুটো চেয়ারে বসলাম। রজত ওর লম্বা চুলে চিরুনির মতন আঙুল চালাতে চালাতে ক্লিষ্ট স্বরে বললো, কি ভাবে শুরু করবো, ঠিক

বুঝতে পারছি না। তুমি জানো নিশ্চয়ই সব ব্যাপারটা?

আমি বললাম, শোনো রজত, তোমারও দোষ নেই, ঊর্মি'রও দোষ নেই। আমি খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি।

রজত বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওরকম ভারিক্কি চালে কথা বলো না। তুমি মহত্ব দেখাতে চেয়ো না কিংবা উপদেশও দিও না। আমরা দু'জন পুরুষমানুষ, প্র্যাকটিক্যাল হয়ে কথা বলতে হবে।

ঠিক আছে, তুমিই বলো তাহলে!

আমার যেটুকু বলার আগে বলে নিচ্ছি। তুমি আমার বন্ধু, তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, যার সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক, তাকে কেড়ে নেবার মতন মনোবৃত্তি আমার নয়। কোনোরকম ছল-ছুতো করে আমার দিকে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টাও আমি করি নি।

আমি জানি।

আমাকে সবটা বলতে দাও। আমি ঊর্মি'র সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারই করেছি। তোমাকে কোনরকম ভাবে ঠকাবার ইচ্ছেও আমার মাথায় কখনো জাগে নি। গঙ্গাসাগরে তোমরা আমার সঙ্গে গিয়েছিলে নিজেদের ইচ্ছেতেই। জল থেকে আমি ঊর্মি'কে কোলে করে তুলে এনেছিলাম, সেজন্য কি তুমি কিছু মনে করেছিলে?

না।

সেটাই স্বাভাবিক। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে যে আমার সেই সময়কার ব্যবহার ক্যালকুলেটেড কিছু না, একেবারে ইন্‌সটিংটিভ—তুমি যে সাঁতার জানো, সেটা আমার ধারণাতেই ছিল না।

এ সম্পর্কে আর বেশী বলে লাভ কি?

এ ব্যাপারটাতে তুমি কোনো গুরুত্ব দাও নি। কিন্তু ঊর্মি' দিয়েছে। ওর ধারণা হয়েছে, তুমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করো নি।

ওখানে মরার প্রশ্নই ছিল না।

হয়তো তাই। কিন্তু মেয়েরা ছোটো ব্যাপারকেও বড় করে দেখে। ওরা ওদের প্রতি মনযোগের বাড়াবাড়িও পছন্দ করে। ওরা মেলোড্রামায় বিশ্বাসী। যাক্ গে, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি খুব ধীর স্থির শান্ত ধরনের মানুষ, তুমি অনেক সলিড এবং নির্ভরযোগ্য, কিন্তু আবেগ আর উত্তেজনা তোমার মধ্যে কম। ঊর্মি'র স্বভাব সম্পূর্ণ উল্টো। সে ছটফটে, জেদী,

খামখেয়ালী—

এখানে আমার হাসি পাবার কথা। রজত উর্মি'র চরিত্র বোঝাচ্ছে আমাকে—অথচ উর্মি'কে ও দেখেছে মাত্র দু'তিন মাস। আমি উর্মি'কে চিনি অন্তত এগারো বছর ধরে।

রজত বললো, তোমাদের মধ্যে মিল হওয়া খুব শক্ত ছিল। ঝগড়া হতোই—এখন না হোক বিয়ের পরে। সুতরাং এখন যে হয়েছে, সেটা এক হিসেবে ভালোই।

এখন তোমাদের প্ল্যান কি ?

তুমি জানো, আমার বিয়ে করার কোনো প্ল্যান ছিল না। আমি বিয়ে টিয়ের কথা কখনো ভাবিই নি। কিন্তু উর্মি', মানে, সেদিন উর্মি' আমার এখানে এসে পড়ল ঝড়ের মতন। কিংবা ওর যা নাম—একটা প্রকান্ড ঢেউ—আমার সব ধারণাটা মিথ্যে হয়ে গেল—মানে, একটা সিগারেটের বিজ্ঞাপনে যেমন লেখে, মেড ফর ইচ আদার—আমরা দু'জনে ঠিক তাই। আমরা পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছি।

হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি এখানে চুপচাপ বসে আছি কেন ? এই রজত, এ আমার কাছ থেকে উর্মি'কে কেড়ে নিচ্ছে, আমি কোনো বাধা দেবো না ? বছরের পর বছর ধরে যে উর্মি'কে আমি আমার বুকের মধ্যে লালন করেছি, পৃথিবীতে যার চেয়ে সুন্দর আমি আর কারুকে দেখি না, সেই উর্মি'! একটা ঘুষিতে রজতের সব দাঁতগুলো ভেঙে ফেলা উচিত নয় আমার ?

তবু আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম। রজত ঠিকই বলছে। ওর সঙ্গেই উর্মি'কে ঠিক মানায়। রজত তো নিজে থেকে উর্মি'কে গ্রাস করে নি। আমিই ওদের আলাপ করিয়ে দিয়েছি, উর্মি' স্বেচ্ছায় এসেছে এখানে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, উর্মি' কোথায় ?

আসবে, আর একটু পরেই আসবে।

আমি এইসব কথা উর্মি'র মুখ থেকে শুনতে চাই।

উর্মি' নিজের মুখে তোমাকে কিছুই বলতে পারবে না। উর্মি' খুব ভেঙে পড়েছে। একদিন হঠাৎ রাগের মাথায় ঝগড়া করলেও তোমার সঙ্গে ওর এতদিনের সম্পর্ক, তা ছাড়া ও তোমাকে শ্রদ্ধা করে।

একদিন যেটা ছিল ভালোবাসা, আজ সেটা হয়ে গেল শ্রদ্ধা ? মাত্র

একমাস আগেও ঊর্মি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে নি যে আমায় ছেড়ে ও বেশীদিন দূরে থাকতে পারে না ?

না, আমি ভুল করেছিলাম। ঊর্মির মুখ থেকে আমি কিছুতেই শুনতে চাই না যে সে আর আমাকে ভালোবাসে না। ওটা মরীচিকা হয়েই থাক। ভালোবাসা তো কোনো বন্ধন নয়। কোনো প্রতিশ্রুতিই বোধহয় সারা জীবন টেঁকে না। ঊর্মিকে আমি ভালোবেসেছি, তাকে বেঁধে রাখতে চাই নি তো কখনো।

রজত আবার বললো, বিভাস, আর একটা কথা তোমার কাছে বলতে আমার খুবই লজ্জা করছে। কিন্তু না বলে আমার উপায় নেই। এখন ঊর্মির চেয়ে আমিই যেন পাগল হয়ে উঠেছি বেশী। আমি বুঝতে পেরেছি, ঊর্মির মতন একজন মেয়েকেই আমি সারা জীবন ধরে খুঁজছিলাম। ওকে না পেলে আমার চলবে না। ওকে না দেখলে আমি সারা জীবন অসম্ভব অতৃপ্ত থেকে যেতাম। আমি জানি, তোমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিচ্ছি আমি। এটা ভয়ংকর স্বার্থপরতা। কিন্তু ভালবাসার জন্য মানুষ এ রকম স্বার্থপরও হয়। তুমি আমাদের ক্ষমা করো। তুমি জীবনে সার্থক, তুমি জীবনে অনেক নারীর ভালোবাসা পাবে ; ঊর্মির চেয়েও অনেক ভালো কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু ঊর্মি শুধু আমারই জন্য।

রজতের গলা আবেগে কাঁপছিল। যে-কোনো লোকেরই সহানুভূতি হবে তার কথা শুনে। ঊর্মিকে সে সত্যিই তীব্র ভাবে ভালোবেসে ফেলেছে। এখানে যেন আমার কোনো ভূমিকা নেই।

আমি রেগে উঠে রজতের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করলে সেইটাই বোধহয় স্বাভাবিক হতো। কিন্তু আমরা একটা সভ্যতা সৃষ্টি করেছি। আমরা আদিম যুগ অনেক দূরে ফেলে রেখে এসেছি, আমরা এখন আর কোনো নারীর জন্য মারামারি করি না। এখন সব দুঃখ বুকে চেপে রাখতে হয়।

রজত আবার চুমুক দিচ্ছে ব্রাণ্ডির বোতলে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। খুব ধীর স্বরে বললাম, আমার দুটো শর্ত আছে। আমি চাকরিতে ট্রান্সফার নিয়ে শিগগিরই চলে যাচ্ছি বম্বেতে। আমি কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে তোমরা বিয়ে করবে না। আর আমার বোনের বিয়ের আগে তোমাদের এই সম্পর্কের কথা যেন আর কেউ না জানতে পারে। সেই বিয়েতে তোমরা দু'জনেই নেমন্তন্ন খেতে যাবে।

রজতও উঠে দাঁড়ালো। আমার হাত ধরে বললো, তুমি যদি রাজী না হতে কিংবা রাগ করতে, তা হলে আমি কি করতাম জানো? আমি সেটাও আগে ঠিক করে রেখেছিলাম। আমি কারুকে কিছু না জানিয়ে, ঊর্মিকেও না জানিয়ে অন্য কোথাও চলে যেত্াম, আমার আর খোঁজ পেতে না। অবশ্য তাতে সমস্যা মিটতো কিনা আমি জানি না। হয়তো তাতে আমাদের তিনজনের জীবনই অভিশপ্ত হয়ে উঠতো।

আমি বললাম, না তার দরকার নেই। আমিই দূরে সরে যাচ্ছি। আমি তোমাদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করবো না।

জানি, আমার এই কথাগুলো মহৎ মহৎ শোনাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, একটা কিছু তো বলতে হবে। এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে আর কি বলা যায়!

রজত আমার হাতটা চেপে ধরে থেকেই জিজ্ঞেস করলো, নো হার্ড ফিলিংস?

আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বললাম, না।

জোর করে একটু হাসিও ঠোঁটে ফোটালাম। তারপর পা বাড়ালাম দরজার দিকে।

রজত বললো, একি, এক্ষুণি চলে যাচ্ছো, আর একটু বসো, ঊর্মি ছ'টার মধ্যেই এসে যাবে। ওর সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

না, আমার অনেক কাজ আছে।

রজতের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আমি গাড়িতে বসে একটা সিগরেট ধরালাম আগে। আয়নায় দেখলাম নিজের মুখটা। কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন তো ঘটেনি। কেউ কি আমার মুখ দেখে বুঝবে, আজ থেকে আমার জীবনটা শূন্য হয়ে গেল?

গাড়িটা চালিয়ে সি আই টি রোডের বাঁক ঘোরার মুখেই আবার থামলাম। রজতের ফ্ল্যাটটা যেন চুম্বকের মতন আমাকে টানছে, ওটা ছেড়ে দূরে যেতে পারছি না। একটু পরেই এখানে ঊর্মি আসবে।

গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়ালাম, এখান থেকেও রজতের ফ্ল্যাটটা দেখা যায়। রজত দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। অনবরত চুলের মধ্যে আঙুল বোলাচ্ছে। রজত প্রতীক্ষা করছে ঊর্মির জন্য। আমিও তাই। অথচ দু'জনের মধ্যে কত তফাত।

গঙ্গাসাগরে নৌকো উল্টে যাওয়ার ঘটনাটা আসলে কিছুই নয়। একটা

নিমিত্ত মাত্র। জল থেকে তোলার সময় রজত ঊর্মি'কে স্পর্শ করেছিল। সেই স্পর্শেই ঊর্মি বুঝেছে, এই রকম পুরুষকেই তার চাই। আমি ঊর্মি'র যোগ্য নই।

পর পর কটা সিগারেট শেষ করেছিলাম মনে নেই। এক সময় দেখলাম রজতের বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থামলো। তার থেকে নামলো ঊর্মি। একটা সাদা রঙের শাড়ী পরে আছে, মুখ-চোখ উদভ্রান্তের মতন। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

ঊর্মি'র সঙ্গে বস্তুত সেই আমার শেষ দেখা। আমি মনে মনে বললাম, ঊর্মি, আমি চিরকাল তোমায় ভালোবাসবো। আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে সুখী করতে চেয়েছিলাম। তুমি সুখী হও। আমি তোমার সুখের জন্যই তোমাকে রজতের হাতে সমর্পণ করলাম।

৭

বম্বেতে বাড়ি ভাড়া যোগাড় করা খুব শক্ত, তাই প্রথমে এসে আমাকে উঠতে হলো একটা হোটেলে। সেখানে সময় আর কাটে না।

বম্বেতে ট্রান্সফারের কথা আর কারুকে আগে ঘূণাক্ষরেও জানাই নি। আমার বোনের বিয়ে হয়ে যাবার ঠিক চারদিন পর বাড়িতে খবরটা প্রকাশ করে, ঠিক সেইদিনই ট্রেনে চেপে বসেছি। এখন কলকাতাতে নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে অনেক রকম আলোচনা এবং জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। আমার আড়ালে যা খুশী তাই হোক।

কাজের মধ্যে সবসময় নিজেকে ডুবিয়ে রাখবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু কাজেরও তো একটা সীমা আছে। এক সময় না এক সময় একা থাকতেই হয়, তখনই রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে। ঊর্মি'র ছবিটা বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমি সেটা তাড়াবার জন্য তক্ষুণি চলে যাই কোনো সিনেমা দেখতে। যে কোনো আজেবাজে সিনেমাই হোক না কেন।

বিছানায় শুয়ে শুয়েও আমি যেন সিনেমা দেখি। স্পষ্ট দেখতে পাই ঊর্মি আর রজত হাত-ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে। কিংবা রজত মোটর-সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছে। ঊর্মি বসেছে পিছনে। মোটরসাইকেলটা গর্জন

করে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। পত পত করে উড়ছে ঊর্মির আঁচল। সমস্ত শব্দ ভেদ করেও আমি শুনতে পাই ওদের দু'জনের মিলিত হাসির শব্দ।

সেই সময় বিছানা থেকে উঠে আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিই।

আমি কলকাতা ছেড়ে চলে আসার পরে কয়েকটা দিন ঊর্মি আর রজতের কি ভাবে কেটেছিল, তা অনেকটা আমি এই রকম স্বপ্নে দেখেছি, অনেকটা শুনেছি পরে লোকমুখে। সবই আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিলে গেছে।

আমি কলকাতা ছাড়বার পর ঊর্মি যখন রজতকে বিয়ে করার কথা বলেছিল, তখন হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল ওর বাড়িতে এবং চেনাশোনা আত্মীয়-মহলে। সকলের কাছেই ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল।

আমার পলায়নের ফলে সকলেই ধরেই নিয়েছিল যে ঊর্মির সাথে আমার কিছু একটা গুরুতর গণ্ডগোলই ঘটেছে, কিন্তু পাত্র হিসেবে রজতকে কারুরই পছন্দ হয় নি। সাধারণ সংসারী লোকেরা রজতের মতন ছেলেকে সুনজরে দেখে না। তার লম্বা-চওড়া চেহারা অন্যদের কাছে মনে হয় 'গুণ্ডার মতন'। সে একটা মাঝারি চাকরি করে বটে, কিন্তু সে উচ্ছৃংখল, বাউণ্ডুলে। তার বিষয়-সম্পত্তি নেই, জমানো টাকা নেই, প্রকাশ্যে মদ খায়, নারীঘটিত অনেক কাহিনী আছে তার নামে। তার উপরে একেবারেই নির্ভর করা যায় না।

ঊর্মিকে অনেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল, তাকে আবার পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল দিল্লীতে। কিন্তু অন্য কারুর কথায় যে সে মত বদলাবে না, তা আমি অন্তত খুব ভাল করেই জানি। ঊর্মি যখন আমাকে ছাড়তে পেরেছে, তখন আর কারুকেই সে গ্রাহ্য করবে না।

ঊর্মির দাদা সুকোমল বম্বে পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নেবার জন্য। সুকোমল ভেবেছিল ঊর্মির সঙ্গে আমার সাধারণ ঝগড়া বা মান-অভিমান হয়েছে, আর একবার দু'জনের দেখা করিয়ে দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি সুকোমলকে খুব শান্ত ভাবে বুঝিয়ে বললাম যে আমি ঊর্মির ভালোর জন্যই ওকে ছেড়ে এসেছি। রজতের সঙ্গেই ওর স্বভাবের মিল হবে, রজতকে ওই সত্যিকারের ভালোবাসতে পারবে।

সুকোমল বললো, এটা ভালোবাসা নয়, এটা একটা সাময়িক মোহ।

কিন্তু ঊর্মির চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, সে বুঝবে না কোনটা মোহ

কোনটি ভালোবাসা।

মেয়েরা অনেক বয়স পর্যন্ত ছেলেমানুষ থাকে। ওরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই বোঝে না।

তবুও যদি ভুল করতে চায়, তুই আমি বাধা দেবার কে? জীবনটা তো ওর নিজেরই!

তা হলে ও যদি এ রকম একটা ভুল করে আমি দাদা হয়েও তাতে বাধা দেব না?

এসব ক্ষেত্রে বাধা দিয়েও কোন ফল হয় না। তুই রজতের সঙ্গে দেখা করেছিস?

ওরে বাবা, সে তো একটা গুণ্ডা। তার ভাব-ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, আমরা কোনো আপত্তি করলেও সে ঊর্মিকে কেড়েই নিয়ে যাবে। অবশ্য এসব লোককে কি করে ঠাণ্ডা করতে হয় আমি জানি।

সুকোমল, তুই ভুল করছিস। রজত মোটেই গুণ্ডা নয়, তার অনেক গুণ আছে। ওকে বিয়ে করলে, ঊর্মি সুখীই হবে। এ বিয়ে হবেই, মাঝখানে তোরা বাধা দিয়ে ব্যাপারটাকে তেতো করে তুলিস না।

কলকাতায় ফিরে যাবার আগে সুকোমল আমার দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে বলে গেল, তুই যে এত কাপুরুষ তা আমি জানতাম না। তুই এত সহজে ছেড়ে দিলি? নিজের বোন বলে বলছি না, ঊর্মিকে ছেড়ে দিয়ে তুই বিরাট ভুল করলি।

আমি সে কথার কোনো উত্তর দিই নি।

আমি আগেই শুনেছিলাম, রজত আনুষ্ঠানিক মন্ত্র-পড়া বিয়েতে রাজী নয়। ওরা রেজিস্ট্রী করবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া। আমি মনে মনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নির্দিষ্ট দিনে, রজতের ফ্ল্যাটে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছে। মাঝখানে গম্ভীরমুখ প্রৌঢ় রেজিস্ট্রার। দু'একটা শপথবাক্য এবং কয়েকটা সই—হয়ে গেল বিয়ে। সারা জীবনের অঙ্গীকার। এখন থেকে ঊর্মি সামাজিক ভাবে রজতের।

এর পর খাওয়া-দাওয়া। ঊর্মি কি নববধূর মতন লজ্জাশীলা? না সহজ স্বাভাবিক ভাবে সকলকে খাদ্য পরিবেশন করছে? সেটাই যেন উচিত। রজতও ঘুরে ঘুরে সকলকে জিজ্ঞেস করলো, আর একটা ফিশ-ফ্রাই নেবেন না? একটু দই?

ওখানে আমার কথা একবারও কি কারুর মনে পড়েছে ?

বিয়ের পর হনিমুন। আমি ঊর্মি'কে কাশ্মীরে নিয়ে যাবো বলেছিলাম। রজত অত দূরে যাবে না। রজত খুব পাহাড় ভালোবাসে। খুব সম্ভবত দার্জিলিং।

দার্জিলিং-এ রজত আর ঊর্মি'। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জলা-পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। দারুণ খুশীতে উজ্জ্বল দুই তরুণ-তরুণী। কি সুন্দর মানিয়েছে ওদের। ওরা হাত-ধরাধরি করে দৌড়াচ্ছে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। ওরা কি বুঝতে পারছে যে হাজার মাইল দূরে থেকে ওদের আমি দেখছি ?

ঘোড়া ভাড়া করেছে রজত। ঊর্মি'কে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে। ঊর্মি' একটুও ভয় পাচ্ছে না। হাসিতে দুলে দুলে উঠছে ওর শরীর।

রজত আর ঊর্মি' পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কালিম্পংয়ের দিকে। যেন সে যুগের এক রাজকুমার আর রাজকুমারী।

বৃষ্টি, বৃষ্টি, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেছে। ভিজে যাচ্ছে ঊর্মি'। ইস, যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়!

ওরা দু'জন বাচ্চা ছেলেমেয়ের মতন ছুটে ছুটে আসছে হোটেলের দিকে। উঠে গেল হোটেলের দোতলায়। ঊর্মি'র খুব শীত করছে এখনো। রজত ওর হাতে হাত ঘষে গরম করে দিচ্ছে।—

রজত সাংবাদিক, কত লোকের সঙ্গে চেনা। দার্জিলিংয়েও অনেক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ম্যালের কাছে রজতের দু'জন বন্ধু, তারা শিলিগুড়ি থেকে মোটরসাইকেলে এসেছে বেড়াতে। একজনের মোটরসাইকেলে কি যেন একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

মোটরসাইকেলটা রজতের নেশার মতন। ঊর্মি'কে দাঁড় করিয়ে রেখে রজত তার বন্ধুর মোটরসাইকেল সারাচ্ছে। এই তো ঠিক হয়ে গেল। রজতের মুখে সাফল্যের হাসি।

রজত ঊর্মি'কে বলছে, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি মোটরসাইকেলটা একটু ট্রায়াল দিয়ে আসি।

স্টার্ট' দিয়ে রজত সেটা নিয়ে দুরন্ত গতিতে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায় না শব্দ।

নাঃ, কত আর এই ছবি দেখবো। আবার দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে

পড়ে চোখ বুজলাম। আঃ, ঘুম কি কিছুতেই আসবে না?

মাঝরাত্রে কিসের একটা আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজ, না কে যেন ধাক্কা দিল আমার মাথায়? কে যেন আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে ব্যাকুল গলায় বললো, বিভাস ওঠো ওঠো!

কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঘরের দরজা বন্ধ, কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাবে? উঠে আলো জ্বাললাম। দরজা বন্ধই আছে। ঘরে, কেউ নেই। তবে, আমার সুটকেসটা একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখা ছিল, সেটা পড়ে গেলে নীচে। সেই শব্দেই বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। সুটকেসটা পড়লো কি করে? হয়তো আমার পায়ের ধাক্কা লেগেছে ঘুমের মধ্যে। যদিও ওটা বেশ দূরে—

না, আসলে আমার ঘুম ভেঙেছে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। ওঃ কি বিশ্রী স্বপ্ন। আমি দেখলাম, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে দারুণ স্পীডে মোটরসাইকেল নিয়ে ছুটে আসছে রজত। পাশেই খাদ। তবু দুঃসাহসী রজত সেই অবস্থাতেই পকেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে চুমুক দিতে গেল…এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরা....একি করছে রজত, হঠাৎ হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গেল কিংবা চাকা স্কিড করলো—মোটরবাইক শুদ্ধু রজত গড়িয়ে পড়ছে খাদে, অনেক অনেক নীচে—

না, না, না, এ হতেই পারে না। অসম্ভব! অসম্ভব!

৮

উর্মিকে যখন আমি আবার দেখলাম, তখন তাকে মানুষ না বলে একটি ধ্বংসস্তূপই বলা যায়। দেহে প্রাণ আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে, শরীরে ঠিক মতন রক্ত-চলাচল করছে, শুধু আলোটুকুই নেই। সেই উর্মিকে যেন চেনাই যায় না। সর্বক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে। কাঁদে না, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সব সময় কি যেন ভাবে।

সেই দুঃস্বপ্ন দেখার পরের দিনই আমি টেলিগ্রামে রজতের দুর্ঘটনার খবর পেয়েছিলাম। আমি যে রকম দেখেছিলাম, প্রায় সেই রকম ভাবেই খাদে পড়ে গিয়ে রজত মারা গেছে। তার শরীরটা টুকরো টুকরো হয়ে

গিয়েছিল।

টেলিগ্রামটা পেয়ে আমি কেঁদেছিলাম। রজত আমার বন্ধু ছিল, অনেকখানি বড় প্রাণ ছিল তার, সেই প্রাণের একি অপচয়! ঊর্মি'র কথা ভেবেও আমি কান্না থামাতে পারি নি অনেকক্ষণ। ঊর্মি জীবনে সুখ চেয়েছিল, রজত কেন তাকে এরকম ভাবে বঞ্চিত করে চলে গেল। সে নিজেও নিয়ে গেল কি দারুণ অতৃপ্তি!

টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই অবশ্য আমি কলকাতায় ছুটে যাইনি। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল সুকোমল। আমি জানতাম, সুকোমলই ঊর্মি'কে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে। এই সময়ে আমার যাবার দরকার নেই। এখন কেউই ঊর্মি'কে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। আমিও না।

আমি একমাস অপেক্ষা করলাম বম্বেতে। সেই একমাস যে কত দীর্ঘ, কত যন্ত্রণাময় তা আমি কারুকে বোঝাতে পারবো না। প্রতি মুহূর্তে আমি চাইছিলাম ঊর্মি'র কাছে ছুটে যেতে, অথচ জানতাম তখন যাওয়া চলে না।

এই একমাস সময় আমি নিলাম ঊর্মি'র শোক খানিকটা শান্ত হওয়ার জন্য। সময়ের একটা অমোঘ প্রভাব আছেই। তা ছাড়া, এই শোকের মধ্যে আমার কথা ঊর্মি'র দু'একবার মনে পড়বেই। খবর পেয়েই আমি ঊর্মি'র কাছে ছুটে যাবো, এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমি না যাওয়ায় ঊর্মি নিশ্চয়ই একটু বিস্মিত হবে। কারণটা বোঝার চেষ্টা করবে।

অর্থাৎ ঊর্মি'র মনে আমার জন্য একটা প্রতীক্ষা জন্মাবার সময় নিচ্ছিলাম আমি।

আমি যখন কলকাতায় ফিরে ঊর্মি'র খাটের পাশে দাঁড়ালাম ঊর্মি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি এত দেরি করে এলে?

আমি বললাম, কিছুই তো দেরি হয় নি। সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে।

ঊর্মি আমার দিকে স্থির চোখ মেলে বললো, আমার আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। আমি বাঁচবো কি জন্য?

আমার জন্য।

বিভাসদা, আমি তোমার নখেরও যোগ্য নই। আমি তোমাকে যা অপমান করেছি।

ঊর্মি ও কথা থাক্।

আচ্ছা একটা কথা বলো তো ? রজতের সঙ্গে কি আমার সত্যিই দেখা হয়েছিল ? আমি কি সত্যিই ওকে বিয়ে করেছিলাম ? নাকি পুরো ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্ন ?

অনেকটা স্বপ্নেরই মতন।

আমি রজতের মুখটাই এখন আর মনে করতে পারছি না। রজত মরে গেছে, না আমি মরে গেছি। আমিই মরে গেছি বোধহয়।

আমি ঊর্মির মাথার কাছে বসে ওর হাতটা তুলে নিলাম। মনে হলো যেন সেই হাতে একটুও প্রাণের স্পন্দন নেই। ওর ঠোঁট দুটো সম্পূর্ণ বিবর্ণ। চোখ দুটাতে জ্যোতির চিহ্নমাত্র নেই।

ঊর্মির মা এবং সুকোমল বললো, ঊর্মি যদি দিনের পর দিন এই রকম ভাবে শুয়ে থাকে, তা হলে ও আর কিছুতেই বাঁচবে না। এই ভাবে মেয়েটাকে চোখের সামনে মরতে দেখা যায় ?

তখন ঊর্মিকে বাঁচাবার যা একটি উপায়, আমি তাই করলাম। একদিন ওকে প্রায় জোর করেই বিছানা থেকে তুলে এনে আমার গাড়িতে এনে বসালাম। তারপর নিয়ে এলাম গঙ্গার ধারে।

একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে গঙ্গার ধারটা সেদিন অনেক নির্জন। জলের পাশে দাঁড়িয়ে আমি ঊর্মিকে বললাম, রজতের সঙ্গে দেখা হবার আগে আমরা এইখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার মনে আছে ?

ঊর্মি ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

আমাদের জীবন আবার সেখান থেকে শুরু করা যায় না ?

না।

কেন ?

আমি তোমার অযোগ্য। আমি তোমাকে অপমান করেছি। আমি নষ্ট। অন্যের উচ্ছিষ্ট।

তুমি আমার কাছে সেই ঊর্মিই আছো, ঠিক আগেকার মতন।

তা হয় না। তা হয় না। তা হয় না।

রজতকে তুমি ভুলতে পারবে না ?

ভোলা কি সহজ ?

সম্পূর্ণ ভুলতে বলছি না। তার স্মৃতি থাকবেই, তবু সেই জন্য তুমি তো তোমার নিজের জীবনটা নষ্ট করতে পারো না।

আমি কি আবার বাঁচতে পারবো ?

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মি ঝুপ করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল আমি তাড়াতাড়ি ওকে ধরে তুললাম। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো ঊর্মি ? কি হয়েছে তোমার ?

কয়েকটা বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে ঊর্মি ম্লান গলায় বললো, কি জানি বোধহয় মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। কিংবা, কেউ কি আমাকে ধাক্কা দিয়েছে ?

আশে পাশে কোনো লোক নেই, কে আবার ধাক্কা দেবে। এতদিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে ওর পা দুটোই দুর্বল হয়ে গেছে। ওকে দাঁড় করিয়ে রাখাই বোধহয় ভুল হয়েছে আমার।

আস্তে আস্তে ধরে ধরে ওকে নিয়ে এসে একটা বেঞ্চে বসালাম। তারপর বললাম, ঊর্মি, তুমি আমার ছিলে, এখনো আমারই আছো। মাঝখানে যেটা ঘটে গেছে, সেটা কিছুই নয়।

ঊর্মির গালে যেন রক্তের আভা দেখা দিল। ফিস ফিস করে বললো, বিভাসদা তুমি মহৎ কিন্তু আমার জন্য আর কত কষ্ট সহ্য করবে ?

আমি হেসে বললাম, আমি মহৎ টহৎ কিছু না। আমি স্বার্থপর। আমি তোমাকে চাই। তোমাকে ছাড়া আমার চলবেই না।

রজতের মৃত্যুর ঠিক আড়াই মাস পরে ঊর্মির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। রেজেষ্ট্রী করেই। এত তাড়াতাড়ি একটি বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে হওয়া হয়তো দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে—কিন্তু এ নিয়ে কেউ একটাও কথা বলে নি। সকলেই বুঝেছিল, ঊর্মির আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য এইটাই একমাত্র উপায়।

শেষ পর্যন্ত বিয়েতে রাজী হওয়ার আগে ঊর্মি আমাকে দিয়ে এই শপথ করিয়ে নিয়েছিল যে আমি কোনদিনই রজতের নাম আর উচ্চারণ করতে পারবো না। রজত আর কোথাও নেই, সে মুছে গেল।

আমার বড়মামার একটা বাড়ি আছে মধুপুরে। বাড়িটা খালিই পড়ে থাকে, পুজোর সময় শুধু মামারা যান। আমি ঊর্মিকে নিয়ে রওয়ানা দিলাম মধুপুরে, বিয়ের দু'দিন পরেই।

কাশ্মীরে যাবার কথা বলেছিলাম, কিন্তু ঊর্মি রাজি হয় নি। ও এখন বেশী লোকজনের মধ্যে যেতে চায় না। অন্য লোকেদের সঙ্গে কথা বলতেও ওর ইচ্ছে করে না। শুধু আমার সঙ্গে নির্জন কোথাও থাকতে চায়।

সেদিক থেকে মধুপুরের বাড়িটা চমৎকার। স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে দোতলা ছিমছাম বাড়ি, সামনে বিরাট বাগান। বাগানের গেটের সামনে দিয়েই একটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে জসিডির দিকে। আশে পাশে আরো তিন চার খানা বড় বড় বাড়ি থাকলেও অধিকাংশই ফাঁকা। আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনটাতেই প্রকাণ্ড মাঠ, তারপর পাহাড়। জানালা দিয়ে তাকালেই দিগন্তের পাহাড় চোখে পড়ে।

বাড়ির মালি এবং তার বউ ছেলে মেয়ে থাকে বাগানের একপাশের ঘরে। ওরাই আমাদের রান্না-বান্না করে দেবে। মামা বলে দিয়েছেন, মালির বৌ নাকি দারুণ রান্না করে।

আমরা এসে পেঁছোলাম সন্ধ্যের দিকে। বাগানের গেটের কাছে টাঙ্গা নামার পর থেকে অনেকদিন পরে ঊর্মি'র মুখে একটু হাসি ফুটলো। ও বরাবরই বেড়াতে ভালোবাসে। শহর ছাড়িয়ে অন্য কোথাও গেলেই খুশী হয়।

বাড়িটা দেখে ঊর্মি বললো, বাঃ কি সুন্দর! বাড়িটা ঠিক ছবির মতন।

তোমার পছন্দ হয়েছে তা হলে?

এখানে আমরা অনেকদিন থাকবো?

তোমার যতদিন খুশী। অফিসে আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে। এইখানে আমাদের নতুন জীবন শুরু হবে।

যেন সত্যিই নতুন জীবনে প্রবেশ করেছি এইভাবে আমরা দু'জনে একসঙ্গে পা ফেলে ঢুকলাম বাড়ির মধ্যে।

আমি আগে দু'তিনবার এসেছি এ বাড়িতে, সুতরাং আমার সবই চেনা। ঊর্মি প্রথমে ঘুরে ঘুরে দেখলো সাড়া বাড়িটা। তারপর মালিকে বাজার করতে পাঠিয়ে আমরা বেড়াতে গেলাম বাগানে।

বাগানের মাঝখানে এক সময় কেয়ারি করা গোলাপের ক্ষেত ছিল, আমি ছেলেবেলায় এসে দেখেছি, এখন আর সে-সব নেই। সারা বছর কেউ থাকে না বলেই এখন সেখানে আলু আর টমাটোর চাষ হয়। মালিই সেগুলো বিক্রি করে খায়। তবে, দেওয়ালের পাশে পাশে অনেকগুলো বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। এক কোণে একটা পেয়ারা বাগানও এখনো রয়ে গেছে—ছেলেবেলা আমরা ভাইবোনরা এসে এখানে খুব হুটোপুটি করতাম।

উর্মি'কে সেই সব গল্প শোনাই, ও বেশ আগ্রহ বোধ করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে অনেক কথা। উর্মি'কে এখন অনেক স্বাভাবিক দেখায়।

এই আড়াই মাসে বেশ রোগা হয়ে গেছে উর্মি'। চোখ মুখের দুর্বল ভাবটা এখনো কাটে নি। তবু এই পড়ন্ত বিকেলে তাকে খুবই সুন্দর দেখায়। উর্মি'র দিকে তাকিয়ে আমার মধ্যে অদ্ভুত বিস্ময় জাগে। কতদিন ধরে চিনি ওকে। কতবার এই রকম বিকেলবেলা একসঙ্গে বেড়িয়েছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সব কিছুই আলাদা। উর্মি' আমার স্ত্রী, এতেই অনেক কিছু তফাত হয়ে যায়।

আমি আলতো ভাবে উর্মি'র হাতটা ধরলাম। বাগানটা সম্পূর্ণ নির্জন, আমাদের কেউ দেখছে না, এখন অনায়াসেই উর্মি'কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আদর করতে পারি, দু'এক বছর আগেও এরকম করেছি, কিন্তু এখন সে কথা মনে এলো না।

উর্মি' দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা, ঐ পাহাড়গুলো কত দূরে?

আমি বললাম, ঠিক জানি না, বোধহয়—

নিশ্চয়ই কুড়ি-পঁচিশ মাইল হবে।

না, না, অত দূরে নয়। বড়জোর সাত আট মাইল।

তবে যে শুনেছিলাম, যে পাহাড়কে দেখে খুব কাছে মনে হয়, আসলে সেগুলো অনেক দূরে?

তা বলে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরের জিনিস কি আর খালি চোখে দেখা যায়?

বিভাসদা, আমরা একদিন ঐ পাহাড়ে বেড়াতে যাবো।

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম। উর্মি' অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। আমার হাসির কারণটা ঠিক বুঝতে পারলো না। একটু যেন আহত ভাবে বললো, হাসলে কেন? আমরা যাবো না ঐ পাহাড়ে?

আমি ওর হাতে চাপ দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু স্বামীকে কি কেউ দাদা বলে ডাকে?

উর্মি' লজ্জা পেয়ে গেল। এখনো ওর পুরোনো অভ্যেসটা যায় নি। মাঝে মাঝেই বিভাসদা বলে ফেলে আমাকে। এটা এমন কিছুই না। আমি

ঊর্মি'কে লজ্জা দেবার জন্যেই মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর বাগানে থাকার মধ্যে কোনো মানে হয় না। আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম। ট্রেন-জার্নি'র পর ঊর্মি' নিশ্চয়ই এখন ক্লান্ত, তার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আমি এক রকম জোর করেই ঊর্মি'কে বিশ্রাম নিতে পাঠালাম।

তারপর আমি একটা বই খুলে বসলাম। আমার মামারা অনেক খরচ করে এ বাড়িতে ইলেকট্রিক এনেছিলেন বটে, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ভোল্টেজ এত ড্রপ করে যে লালচে আলোয় ভালো করে প্রায় দেখা যায় না। তা ছাড়া লোড-শেডিং হয় রাত্তিরের দিকে।

আমি অবশ্য বই খুলেও সেই দিকে মন বসাতে পারছিলাম না। মন চলে যাচ্ছে অন্য দিকে। আমার মনে এখন শুধু একটাই চিন্তা। ঊর্মি'কে সুখী করতে হবে। ঊর্মি'র জীবনটা আবার সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। আমি কি তা পারবো না?

খানিকটা বাদে মালি এসে জানালো যে রান্না তৈরী হয়ে গেছে। খাবার ঠাণ্ডা করে লাভ নেই। ঊর্মি' একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি তাকে ডেকে নিয়ে এলাম নীচের ডাইনিং রুমে।

মালিটি সত্যিই খুব কুশলী। ডাইনিং টেবিলে পরিষ্কার চাদর পেতে প্লেট ও কাঁটা-চামচ সাজিয়ে রেখেছে। এই অল্প সময়ে রান্নাও করেছে অপূর্ব। গরম গরম ভাত, মুগের ডাল, বেগুনপোড়া ও পেঁয়াজ মাখা, ফুলকপির তরকারি ও মুর্গীর ঝোল।

আমি বেশ তরিবৎ করে খাচ্ছিলাম। একসময় ঊর্মি'কে জিজ্ঞেস করলাম, রান্না কেমন হয়েছে, তোমার ভালো লাগছে?

ঊর্মি' মুর্গীর ঝোলের স্বাদ নিয়ে বললো, হ্যাঁ বেশ ভালোই।

তারপর মালির দিকে তাকিয়ে বললো, ঝাল এত কম দিয়েছো কেন? দাদাবাবু ঝাল খান। কাল থেকে একটু বেশী করে ঝাল দেবে।

আমি খাওয়া থামিয়ে চুপ করে ঊর্মি'র দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের সাতপুরুষে কেউ কখনো ঝাল খায় না। বাড়িতে লঙ্কা সম্পর্কে একটা আতঙ্ক আছে। আমি ঝাল জিনিস জিভে ছোঁয়াতে পারি না। একবার দক্ষিণ ভারতে অফিসের কাজে গিয়ে আমি ঝাল রান্নার জ্বালায় এমনই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে, কয়েকদিন শুধু ফল আর দই খেয়ে কাটিয়েছি।

আমার খাদ্য-অভ্যেস যে ঊর্মি একেবারেই জানে না তা নয়। ওদের বাড়ি অনেকবার নেমন্তন্ন খেয়েছি। তাছাড়া দিল্লীতে ঊর্মির দাদার বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। তখন আমার জন্য বিশেষ করে ঝাল ছাড়া রান্না হতো।

ঊর্মি নিশ্চয় সে কথা ভুলে গেছে। এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেল ওর জীবনের ওপর দিয়ে। এসব খুঁটিনাটি কি করে মনে থাকবে। এমন হতে পারে, ঊর্মি নিজেই ঝাল খেতে ভালোবাসে, তাই ধরেই নিয়েছে যে আমিও। ঠিক আছে, এখন থেকে আমিও ঝাল খাওয়া অভ্যেস করবো।

মালিকে বললাম, হ্যাঁ, কাল থেকে রান্নায় একটু ঝাল দিও। ঝাল ছাড়া খাওয়া যায় না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা একটুক্ষণ বসলাম দোতলার বারান্দায়। বাগানের সামনে দিয়ে রাস্তাটা বহুদূরে চলে গেছে, ফিকে জ্যোৎস্নায় সেটাকে অন্তহীন পথ মনে হয়। হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসের পাতার ঝিরঝির শব্দ, একটা টাটকা সুগন্ধও পাওয়া যায়। আমরা কথা না বলে চুপ করে বসে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

রাত মাত্র ন'টা। চতুর্দিক নির্জন বলে এরই মধ্যে গভীর রাত মনে হয়। আমার দেরি করে ঘুমোনো অভ্যেস। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বই না পড়লে আমার ঘুম আসে না। এখন থেকে এই সব অভ্যেসও পাল্টাতে হবে।

আমার মনে হলো, ঊর্মি আজ ক্লান্ত, ওকে আর বেশীক্ষণ জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়। হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঊর্মি তোমার শীত করছে?

একটু।

চলো উঠে পড়ি। শুয়ে পড়া যাক্।

তুমি এক্ষুণি শোবে?

হ্যাঁ, আমার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

ঊর্মি আর আপত্তি করলো না। আমরা বারান্দা ছেড়ে ঘরে চলে এলাম। ঊর্মি চুল বেঁধে, মুখে ক্রিম মেখে শুয়ে পড়লো, আমিও জামাকাপড় বদলে বিছানায় চলে এলাম।

জানালা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। কোথা থেকে যেন একটা ফুলের হাল্কা গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়।

বিয়ের পর অন্যদের যেমন ফুলশয্যা হয়, আমাদের সেরকম কিছু হয়নি। রেজিষ্ট্রি বিয়ের পর আমরা আলাদা ভাবে দুজনে দুজনের বাড়িতেই থেকেছি। প্রকৃতপক্ষে আজই প্রথম সেই ফুলশয্যার রাত।

আমার কি উচিত ছিল কিছু ফুল কিনে এনে বিছানায় ছড়িয়ে দেওয়া? একবার কথাটা মনে এসেছিল অবশ্য। তারপর লজ্জা পেয়েছিলাম। নিজে নিজে এসব করা যায় না।

আজই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের দিন। ঊর্মি'র শরীরের মাদকতার জন্য আমার মধ্যে একটা তীব্র ব্যাকুলতা থাকলেও আমি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিলাম যে এ ব্যাপারে আমি তাড়াহুড়ো করবো না। ঊর্মি'র মন এখনো দুর্বল, হঠাৎ কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। বরং আরও কিছুদিন সময় কাটুক। ঊর্মি' যখন নিজে থেকেই চাইবে—

আমি ঊর্মি'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ঊর্মি' নিঃশব্দে শুয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর একসময় মনে হলো ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কাঠ হয়ে জেগে রইলাম। শরীরের মধ্যে একটা ছটফটানি, আমাকে দমন করতেই হবে, কিন্তু বোধহয় সারারাত ঘুম আসবে না।

এক সময় ঊর্মি' পাশ ফিরে আমার কাছাকাছি চলে এসে মৃদু গলায় বললো, তোমার বুকে আমি একটু মাথা রাখবো।

আমি বললাম, হ্যাঁ রাখো না! তুমি ঘুমোও নি?

ঘুম আসছে না।

আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

তুমি আমাকে ঘেন্না করবে না তো?

ছিঃ, এ কি কথা বলছো?

আমি আলতো ভাবে ঊর্মি'র মুখটা তুলে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। আর বেশী কিছু এখন না।

ঊর্মি' আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজলো। আমি ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি, তুমি জানো না।

জানি তুমি আমাকে আর দূরে চলে যেতে দিও না।

ঘুমোও, এবার ঘুমোও।

তুমিও ঘুমোও। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমাকে ছেড়ো না।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। আমার বোধহয় একটু তন্দ্রা

এসেছিল। হঠাৎ ঊর্মি ধড়ফড় করে উঠে বসে বললো, ওকি ? ওকি ?

আমি চমকে উঠেছিলাম, উঠে বসে ঊর্মিকে ধরে বললাম, কি, কি হয়েছে ?

ঊর্মি বিহ্বলভাবে বললো, কিসের শব্দ ? কে আসছে ?

কোথায় শব্দ ? কোনো শব্দ নেই।

শুনতে পাচ্ছো না ? ভাল করে শোন—

আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বহুদূরে একটা ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে ঠিকই। রাস্তার কোন গাড়ির আওয়াজ।

আমি বললাম, রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তাতে কি হয়েছে ?

না; তুমি ভাল করে শোন !

এবার বোঝা যায় আওয়াজটা একটা মোটরসাইকেলের। ক্রমেই আওয়াজটা বাড়ছে, অর্থাৎ এদিকেই আসছে।

ঊর্মি চেঁচিয়ে উঠলো, ও আসছে। ও আমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে।

আমি ঊর্মিকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, ঊর্মি, কি ছেলেমানুষী করছো। রাস্তা দিয়ে একটা মোটরসাইকেল যাচ্ছে, তাতে তোমার ভয় পাবার কি আছে ?

না, না, না, তুমি জানো না, ও আসছে। ও আমাকে ছাড়বে না।

মোটরসাইকেলের আওয়াজটা খুবই কাছে এসে পড়েছে। আমি ঊর্মিকে চেপে ধরে রইলাম। ঊর্মির দুর্বল মনে নানারকম ভয়ের চিন্তা। মোটর-সাইকেলটা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পেরিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

কিন্তু শব্দটা আমাদের বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে হঠাৎ থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মি তীব্র কান্নার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, ও এসে পড়েছে। ও ঠিক এসে পড়েছে। আমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে !

আমি ঊর্মিকে ছেড়ে লাফিয়ে চলে এলাম জানালার কাছে। রাস্তায় কেউ নেই। মোটরসাইকেলটা দেখা যাচ্ছে না। পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। নিশ্চয়ই মোটরসাইকেলটা ঢুকে গেছে কাছাকাছি কোন বাড়িতে। আমাদের তিনখানা বাড়ি আছে। 'সেন লজ'-এ মানুষজন আছে দেখেছিলাম। সে বাড়ির কারুর মোটরসাইকেল থাকা খুবই সম্ভব।

জানালা থেকে আবার ঊর্মির কাছে ফিরে আসতেই ঊর্মি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগলো, ও আমাকে কেড়ে নিতে এসেছে। তুমি ছেড়ে দিও না, ছেড়ে দিও না। বিভাসদা, তুমি আর কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিও না—।

৯

বোম্বাইতে যে ঘুমের ওষুধগুলো কিনেছিলাম, তার কিছু অবশিষ্ট ছিল। ভেবেছিলাম ওগুলো আর কখনো কাজে লাগবে না। কিন্তু আবার কাজে লাগলো। ঊর্মি'কে ঘুমের ওষুধ খাইয়েই ঘুম পাড়াতে হলো। আমি প্রায় সারারাতই জেগে রইলাম। সে রাতে আর কিছু হলো না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঊর্মি' কিন্তু রাত্তিরের কথা কিছুই উল্লেখ করলো না। মুখখানা একটু গম্ভীর ও ম্লান।

আমি বললাম, ঊর্মি', চট করে তৈরী হয়ে নাও। আমরা একটু বেরুবো। সকালবেলা এখানে বেড়াতে খুব ফাইন লাগে।

কোনোরকম ওজর আপত্তি তোলার সুযোগ না দিয়েই আমি ঊর্মি'কে হাত ধরে তুললাম বিছানা থেকে। ঊর্মি' অল্পক্ষণেই তৈরী হয়ে নিল। আমর বেরিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা বেড়াতে সত্যিই ভালো ল।গে। বাতাসে একটা শিরশিরে ভাব। ঘাসগুলো ভিজে আছে শিশিরে।

আমরা বাগান ছেড়ে চলে এলাম বাইরে রাস্তায়। বেশ খানিকটা দূর চলে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে।

আমি গোপনে লক্ষ্য করেছিলাম। রাস্তায় মোটরসাইকেলের টায়ারের দাগ দেখা যায় কিনা। ঠিক বোঝা গেল না। গরুর গাড়ির চাকার দাগই প্রকট। 'সেন-লজ-'এর কম্পাউন্ডটা বিরাট। ওর ভেতরে কোনো মোটরসাইকেল রাখা থাকলেও বাইরে থেকে দেখা যায় না। ও বাড়িতে অনেক লোক এসেছে। বারান্দায় বসে চা-খাচ্ছে পাঁচ-সাতটি যুবক-যুবতী। একটা রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজাচ্ছে।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম, শিগগিরই একদিন ও বাড়িতে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। মানুষ নির্জনতা খুঁজতে আসে ঠিকই। কিন্তু আবার মানুষের সঙ্গ ছাড়া ভালোও লাগে না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা চলে এলাম শোওয়ার ঘরে। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় নি বলে আবার একটা দিবা-নিদ্রা দেবার সাধ ছিল।

কিন্তু ঊর্মি হঠাৎ বললো, কাল রাত্তিরে আমি তোমাকে খুব জ্বালাতন করেছি, তাই না ?

আমি অবাক হবার ভাব করে বললাম, জ্বালাতন ? আমাকে আবার তুমি কখন জ্বালাতন করলে ? একটু জ্বালাতন করলে তো আমি খুশীই হতাম।

কাল আমি মিছামিছি ভয় পেয়েছিলাম।

মন দুর্বল থাকলে ওরকম হয়।

আমার মন যে সত্যিই দুর্বল।

মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করো।

ঊর্মি নিজেই এসে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমার গালে গাল ঠেকিয়ে বললো, তুমি এত ভালো! তবু আমি তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কি করে ?

আমি অনুভব করলাম, ঊর্মির গাল রীতিমত উত্তপ্ত। কামনা-বাসনা যে উত্তাপ আনে। ঠিক আগেকার ঊর্মির মতন

গভীর আবেগে আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। ঊর্মি ওর জিভ দিয়ে সাড়া দিল। এবার সব বাঁধ ভেঙে গেল। আমি চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিলাম ঊর্মিকে। ওর কানের পাশে, ঘাড়ে, গলায়, বুকে আঁকা হলো অজস্র চুম্বন। এক সময় আমরা বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

আমার বহুদিনের অতৃপ্ত বাসনা মুক্তি পেল। প্রায় এক ঘণ্টা উন্মত্ততার পর আমরা দুজনেই গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হলাম।

বিকেলবেলা সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। শারীরিকভাবে কাছাকাছি না এলে নারী-পুরুষ কখনো সত্যিকারের কাছাকাছি আসতে পারে না। ঊর্মির মধ্যে যেটুকু আড়ষ্টতা ছিল তা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। এখন সে বার বার আমার দিকে লাজুক লাজুক ভাবে তাকাচ্ছে। ঠিক নববধূর মতনই লজ্জারুণ তার মুখ।

সন্ধ্যেবেলায় চা খেতে খেতে আমরা পরিকল্পনা করতে লাগলাম, কোথায় কবে বেড়াতে যাওয়া হবে। এখান থেকে গিরিডি, শিমুলতলা, দেওঘর প্রভৃতি অনেক জায়গাতেই যাওয়া যায়। একটা গাড়ি সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। যাক, তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। জসিডিতে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে, আমি জানি।

একটু বাদে ঊর্মি বললো, তুমি একটা গান শোনাও না। অনেকদিন তোমার গান শুনি নি।

আমি বললাম, আমি আর কি গান শোনাবো। ইস্, তোমার সেতারটা আনলে পারতে! মাঝে মাঝে সেতার বাজালে তোমার মন ভালো থাকতো।

আমার মন এখন বেশ আছে। তুমি একটা গান গাও।

আমি মাথা নীচু করে গান ভাবতে লাগলাম। এক সময় গানের চর্চা করতাম ঠিকই। দক্ষিণীতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কোর্সও শেষ করেছিলাম। চাকরিতে ঢোকার পর আর সময় পাই না বিশেষ।

খানিকক্ষণ গুণ গুণ করে একটা গান ধরলাম:

দেখা না দেখায় মেশা হে
হে বিদ্যুৎলতা···

সবে মাত্র দু'লাইন গেয়েছি, ঊর্মি বাধা দিয়ে বলে উঠলো, না, না, এ গান নয়! এ গান নয়!

আমি চমকে উঠলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঊর্মির মুখখানা সম্পূর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেছে আবার।

কি হয়েছে ঊর্মি?

তুমি এই গানটা গাইলে কেন?

তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল। রজতের সঙ্গে যেদিন প্রথম ঊর্মির আলাপ হয়েছিল, সেদিন নৌকোর ওপর রজত এই গানটা গেয়েছিল। ও খুব মোটা গলায় চেঁচিয়ে গান করতো। এখনো যেন শুনতে পাচ্ছি। রজতের সেই গান শুনে ঊর্মি বিচলিত হয়ে পড়েছে।

আমি কিন্তু কোনো রকম চিন্তা করে এ গানটা গাই নি। আপনিই গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আগে মনে পড়লে নিশ্চয়ই এটা গাইতাম না। আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা গান ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আর যেন জমলো না। ঊর্মি মাথা নীচু করে বসে আছে।

মালী এসে বললো, নীচে কে একজন আপনাকে ডাকছে।

ঊর্মিকে একা রেখে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই, তাই ওকে বললাম, চলো, তুমিও নীচে চলো।

অচেনা লোকের কাছে আমি গিয়ে কি করবো?

একটু কথা বললেই অচেনা লোক চেনা হয়ে যাবে।

না, ইচ্ছে করছে না। আমি এখানেই বসছি, তুমি ঘুরে এসো।

আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি।

নীচে এসে দেখলাম একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ বসে আছেন। আলাপ-পরিচয়ের পর শুনলাম ইনি আমার বড়মামার বন্ধু। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর মধুপুরেই পোলট্রির ব্যবসা করেছেন। এ বাড়িতে লোক এসেছে শুনে খবর নিতে এসেছেন বড়মামার।

ভদ্রলোক স্থানীয় সমস্যা, রাজনীতি, মুরগীর ব্যবসায়ের সুবিধে-অসুবিধে ইত্যাদি অনেক বিষয় তুললেন। বোধহয় কথা বলার লোক পান না। এ সব কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছিল না। তবু ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য হুঁ হাঁ করে যেতেই হয়।

একটু বাদে প্রায় একরকম জোর করেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওপরে চলে এলাম। বারান্দায় যেখানে আমরা বসেছিলাম, সেখানে উঁকি দিয়ে দেখলাম ঊর্মি নেই। ঘরের মধ্যে চলে গেছে নিশ্চয়ই।

ঘরের মধ্যে এসেও ঊর্মিকে দেখতে পেলাম না। আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ঊর্মি কোথায় গেল? দোতলার অন্য ঘরগুলো তালাবন্ধ। আমাদের দরকার লাগবে না বলে খোলা হয় নি। বাথরুমের দরজাটাও খোলা, তবু ভেতরটা দেখে এলাম।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, ঊর্মি, ঊর্মি।

কোন সাড়া নেই।

ঊর্মি কোথায় যেতে পারে? নীচে নেমে গেলে বসবার ঘর দিয়েই একমাত্র যাওয়া যায়। তা হলে আমি দেখতে পেতাম ঠিকই।

তবু আমি দৌড়ে এলাম নীচে। সম্ভাব্য জায়গাগুলো দ্রুত দেখে নিলাম। ঊর্মি কোথাও নেই।

রান্নাঘরে যায় নি তো? সেখানে যাওয়ার কোনো কথা নয়, তবু দেখে এলাম একবার। মালীকে কিন্তু বললাম না, সে বেচারা অকারণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে।

বাগানটাও একবার ঘুরে দেখবো সবটা ভাবলাম। তারপরই মনে হলো, ঊর্মি নীচে নেমে আসতে পারেই না। আমি বসবার ঘরে এতক্ষণ ছিলাম ও কি করে সেখান দিয়ে বাইরে যাবে? তাছাড়া আমাকে না বলে যাবেই বা কেন?

আবার ছুটতে ছুটতে উঠে এলাম দোতলায়। বারান্দা, ঘর, বাথরুম তন্ন তন্ন করে দেখলাম। ঊর্মি নেই।

ঊর্মি নেই? এ কি করে সম্ভব হতে পারে?

আমি গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, ঊর্মি! ঊর্মি!

মনে হলো আমার চিৎকার ফাঁকা বাড়িতে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। আরও দু'তিন বার ডাকার পর একটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলাম। কোথা থেকে শব্দটা আসছে? হ্যাঁ, ঊর্মি'র গলা, কিন্তু সে কোথায়?

আওয়াজটা দূর থেকে আসছিল, একটু কান পাততেই বুঝতে পারলাম, সেটা আসছে ছাদ থেকে। উঃ, কি বোকা আমি! ছাদের কথাটা আমার মনে পড়ে নি!

ছাদের সিঁড়ির দিকে দৌড়োতেই শুনতে পেলাম ঊর্মি কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

আমি প্রচণ্ড চিৎকার করে বললাম, ঊর্মি, আমি আসছি, তোমার কোনো ভয় নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পেলাম, অনেক দূরে সম্ভবত ছাদের এক শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঊর্মি বলছে, না, না, আমি যাবো না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও—

ছাদের দরজাটা চেপে বন্ধ করা ছিল। লাথি মেরে সেটাকে খুলে আমি দৌড়ে গেলাম। ছাদের এক কোণে কার্ণিসের ওপর মাথা দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে ঝুঁকে ঊর্মি দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি ওকে স্পর্শ করতেই ও ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে অসম্ভব জোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, ও আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলো। ও আমাকে নিতে এসেছে। ও আমাকে ছাড়বে না। আমি যাবো না! আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না, আর কিছুতেই যাবো না।

আমার গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। ঝিম ঝিম করতে লাগলো মাথাটা। ঊর্মি কি তাহলে পাগল হয়ে যাচ্ছে! এ তো পাগলামিরই লক্ষণ। ঊর্মি সাহসী মেয়ে, সে কোনো দিন ভূত টুত বিশ্বাস করে না—তা হলে এ রকম ব্যবহারের মানে কি?

ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললাম, ঊর্মি, শান্ত হও! শান্ত হও! এ কি করছো?

ফোঁপানিতে ঊর্মি'র শরীরটা কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই বললো, ও

এসেছিল। ও আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল!

কে এসেছিল?

রজত! আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি।

কি যা-তা কথা বলছো! চেয়ে দ্যাখো, এখানে কেউ নেই! তা ছাড়া সে এখানে কি করে আসবে?

তুমি বিশ্বাস করছো না? সে আমাকে জোর করে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এসেছিল।

ঊর্মি, নীচে চলো।

ও আমাকে জোর করে চেপে ধরে আমার ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরে-ছিল। যে-রকম ওর স্বভাব। এই দ্যাখো, আমার ঘাড়ের কাছে লাল দাগ হয়ে গেছে। দ্যাখো, তুমি দ্যাখো—

আজ জ্যোৎস্না অনেক উজ্জ্বল। অনেক কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। তবে, ঊর্মির ঘাড়ের কাছে লাল দাগ হয়েছে কিনা সেটা তো ওর দেখতে পাওয়ার কথা নয়। আমি দেখতে পারি। লালচে দাগ একটা আছে ঠিকই। কিন্তু সেটা দুপুরবেলা আমিই করে দিয়েছিলাম। তখনই লক্ষ্য করেছি।

আমি বললাম, দাগ টাগ কিছু নেই। এরকম ভাবে আর রাত্তিরে একা একা ওপরে এসো না।

আমি নিজে ইচ্ছে করে আসি নি। তুমি ওকে তাড়িয়ে দিতে পারো?

হ্যাঁ পারবো। চলো, নীচে চলো লক্ষ্মীটি!

ঊর্মি যেন একটা যন্ত্র-মানুষ, এই ভাবে আমি ওর কোমর ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এলাম। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে খিল তুলে দিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা মাত্র নেমেছি, এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটল। এ রকম ঘটনাকে কাকতালীয় বলা যায়। মানুষের জীবনে এমন ঘটনা ঘটেই। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলে এর একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আর ব্যাখ্যা খোঁজার দিকে মন থাকে না।

হঠাৎ একটা গান ভেসে উঠলো, সেই গান, দেখা না দেখায় মেশা হে, হে বিদ্যুৎলতা—গানটা যেন ছাদ থেকেই বাজছে।

ঊর্মির দেহটা নেতিয়ে পড়েছিল আমার বুকে, গানটা শুনেই সে স্প্রিংয়ের মতন সোজা হয়ে গেল। অদ্ভুত পাগলাটে গলায় চেঁচিয়ে

উঠলো, ঐ যে, ঐ যে। শুনতে পাচ্ছো না? ও এখনো আছে? গান গাইছে!

মনঃস্থির করতে আমার খানিকটা সময় লেগেছিল। তারপরই ঝট করে আবার দরজাটা হাট করে খুলে দিলাম। মনে হলো যেন, গানটা ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যাচ্ছে। হাওয়ায় ভাসছে গান। চট করে আবার থেমে গেল।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই সময় ছাদে পা দিতে আমার ভয় করেছিল। ভীষণ দুর্বল লাগছিল মাথাটা। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর আমি ভাবলাম, আমিও কি ঊর্মির মতন পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি? একি ছেলেমানুষী!

ঊর্মি আমার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে টানার চেষ্টা করে ফিস ফিস করে বললো, যেও না, তুমি যেও না! নিজের কানে এবার শুনলে তো!

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, ধ্যাৎ! এটা তো রেকর্ড! পংকজ মল্লিকের রেকর্ড আছে। 'সেন লজ'-এ রেকর্ড প্লেয়ার আছে সকালে দেখেছি, বিকালেও গান শুনতে পেয়েছি।

না, না, ও আমাদের ছাদের ওপরে—

রাত্তিরবেলা দূরের আওয়াজকেও কাছের মনে হয়।

আমার ইচ্ছে হলো তক্ষুনি সেন লজ-এ ছুটে গিয়ে প্রমাণ নিয়ে আসি, ওরা পংকজ মল্লিকের এই রেকর্ডটা বাজাচ্ছিল কিনা। কিন্তু তা হলে ঊর্মিকে একা রেখে যেতে হয়। ওকে এই অবস্থায় নিয়েও যাওয়া যায় না। তাই বিরক্ত হলাম।

ঊর্মি সেই রাত্রে কিছুই খেলো না। অনেক জোর করলাম। কিন্তু ওর একটুও খাবার ইচ্ছে নেই। সব খাবার থালায় ফেলে রাখলো। আমরা তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম।

স্পষ্ট বুঝলাম, আজও সারা রাত ঊর্মিকে পাহারা দিতে হবে। ওর পাগলামির ভাবটা ক্রমশঃ বাড়ছে। কোথাও একটু খুটখাট শব্দ কিংবা পাখির ডাকেই ও চমকে উঠছে। মাঝে মাঝেই বলছে, ও আসবে, ও ছাড়বে না।

ঊর্মি আমার হাতটা সর্বক্ষণ শক্ত করে চেপে ধরে আছে। আমি ওকে অনবরত বোঝাচ্ছি, কেউ আসবে না। কেউ আসতে পারে না। তুমি যার

কথা বলছো, তার পক্ষে আসা তো অসম্ভব।

ঊর্মি তবু বললো, তুমি জানো না ও কি রকম জেদী। ও দারুণ অতৃপ্তি নিয়ে গেছে। ও ফিরে আসতে চাইবেই। ও আবার আমাকে কেড়ে নেবে।

ঊর্মিকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে একসময় আমিই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। আমার মাথাটা অবশ লাগছে। কিন্তু আমাকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তো চলবে না। মাথা ঠিক রাখতেই হবে।

আজও একসময় মোটরসাইকেলের আওয়াজ শোনা গেল। সেই সময় ঊর্মিকে সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। আমি ওকে সবলে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম।

ঊর্মির ঘুম আসারও লক্ষণ নেই। কিন্তু আজ আর আমি ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে সাহস করলাম না। যতদূর শুনেছি, এ রকম দুর্বল মানসিক অবস্থায় ঘুমের ওষুধ খাওয়া আরও বেশী ক্ষতিকর। কাল এ সম্পর্কে এক-জন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। কিংবা বোধহয় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে আলোচনা করাই বেশী দরকার। কিন্তু সেরকম কাউকে কি এখানে পাওয়া যাবে। না হলে ফিরেই যেতে হবে কলকাতায়।

ঊর্মি নিজেই আমার কাছে কয়েকবার ঘুমের ওষুধ চাইলো। আমি ওকে বললাম, ফুরিয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেদের ঘুমপাড়াবার মতন করে ওর মাথা চাপড়ে দিতে লাগলাম।

তখন কত রাত জানি না। সমস্ত পৃথিবী নিঝুম। ঊর্মিও কিছুক্ষণ চুপ করে আছে। আমার একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। অনেকক্ষণ ধরে চেপে বসে আছি। ঊর্মিকে একা ফেলে যেতে হবে বলে যেতে পারছি না। এবার ঊর্মি ঘুমিয়েছে, এখন যাওয়া যায়।

ওর হাত ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। কোনো রকম শব্দ যাতে না হয় তাই পা টিপে টিপে চলে এলাম দরজার কাছে। একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছিল, বাইরে গিয়েই ধরাবো।

দরজাটা খুলতেই দেখলাম বারান্দার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রজত। পরিষ্কার জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সেখানে। রজতের লম্বা শরীরটা হেলান দিয়ে দাঁড়াবার জন্য এখন বেঁকে আছে, মাথায় বড় বড় চুল, শার্টের বোতাম খোলা।

আমাকে দেখে হাসিমুখে বললো, কি বিভাস—

আমি অস্ফুট গলায় বললাম, রজত !

রজত আবার কি যেন বলতে গেল। আমিও প্রাণপণে চিৎকার করলাম, রজত—

আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, পা থর থর করে কাঁপছে, মাথার মধ্যেটা একেবারে ফাঁকা। আমি কিছুতেই সামলাতে পারছিনা।

আমি ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

১৩

এর পরের দুটো দিনের ঘটনার সঙ্গে আমার জীবনের আর কিছুই মেলে না। সেই অদ্ভুত ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না। অবশ্য ডাক্তাররা অনেক রকম কথাই বলেছেন। তার মধ্যে কোনোটা সত্যি হবে নিশ্চিত।

আমার ধারণা আমি মধ্য-রাত্রে দরজা খুলে রজতকে দেখেছিলাম। কিংবা হয়তো দেখি নি। চোখের ভুল। হ্যালুসিনেশান। সে যাই হোক, সেই মুহূর্তে যে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে দারুণ সত্যি মনে হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

আমি ঠিক অজ্ঞান হয়ে যাই নি, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আমার ধারণা আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম, আসলে তা নয়, আমি দেয়াল ধরে পতনের হাত থেকে রক্ষা করছিলাম নিজেকে। আমার ব্যবহারটা তখন অন্ধের মতন, সত্যিই যেন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আমার চিৎকার শুনে উর্মি ঘুম ভেঙে উঠে এসেছিল। সে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে। উর্মি জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছে তোমার ?

আমি ফিস ফিস করে বলেছিলাম, রজত···রজত সত্যিই এসেছে।

কোথায়, কোথায়, বলে উর্মি ছুটে গেল বাইরে। ওকে বাধা দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।

একটু বাদেই উর্মি ফিরে এসে আমাকে ধরলো। খুব শান্ত এবং দৃঢ় গলায় বললো, না, কেউ নেই। চলো, ভেতরে চলো।

এর পর সব ব্যাপারটাই উল্টে গেল। এতক্ষণ উর্মিকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম আমি, এখন সে-ই আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

ঊর্মি আকস্মিকভাবে দারুণ শান্ত হয়ে গেছে। যেন ফিরে এসেছে ওর মনের জোর। আমাকে দুর্বল হতে দেখেই ও নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে।

আমাকে রীতিমতন এক ধমক দিয়ে ঊর্মি বললো, তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তুমি কখনো রজতের নাম আর উচ্চারণ করবে না!

কিন্তু আমি যে রজতকে দেখলাম!

মোটেই কিছু দেখো নি তুমি। মৃতেরা কখনো ফিরে আসে না। এতক্ষণ আমি পাগলামি করছিলাম। সবই আমার ভুল!

আমার ভীষণ ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। কথা বলারও জোর পাচ্ছিলাম না। এবং আশ্চর্যের বিষয়, একটু বাদেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে চোখ মেলে দেখলাম, ঊর্মি তার আগেই জেগে গেছে। বিছানায় নেই। একটু বাদেই ও দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে এলো। আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি শুয়ে শুয়ে চা খাবে?

চায়ের কাপ নিয়ে ঊর্মি বিছানায় বসলো আমার পাশে। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, কাল রাত্তিরে আমি চোখে ভুল দেখেছিলাম, তাই না?

হ্যাঁ, তুমি কি রকম অদ্ভুত করছিলে। তোমার এ রকম হলো কেন? তুমি তো কখনো আজে বাজে ব্যাপারে বিশ্বাস করতে না।

কি রকম যেন হয়ে গেল।

আর ওরকম ভাবে আমাকে ভয় দেখিও না!

তুমি আর ভয় পাবে না তো!

না। আমার ওসব কেটে গেছে। কি বোকার মতনই যে ব্যবহার করছিলাম। মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি? ওঠো, মুখ টুখ ধুয়ে নাও!

ঊর্মি সুস্থ হয়ে উঠেছে, সব ব্যাপারটাই এখন শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। এবার সত্যিই আমাদের নতুন জীবন শুরু হবার কথা। তবুও আমি সারা শরীরে কিরকম যেন ছটফটানি বোধ করছি। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। এটা কাটানো দরকার।

আমি বললাম, একটু পরে উঠবো। আমার সিগারেট দেশলাইটা এনে দাও তো একটু।

সেগুলো এনে দিয়ে ঊর্মি আবার আমার পাশে বসলো। আমি একটা সিগারেট বার করে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ঠুকতে লাগলাম।

এক সময় লক্ষ্য করলাম ঊর্মি আমার আঙুলের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি দেখছো ঊর্মি ?

কিছু না।

আমি আমার দু'হাতের দিকে তাকালাম। অস্বাভাবিক তো কিছুই নেই।

ঊর্মি বললো, এবারে ওঠো। আজ আর বেড়াতে যাওয়া হবে না ?

বড্ড রোদ উঠে গেছে।

গিরিডি এবং দেওঘর কবে বেড়াতে যাবো আমরা ?

গেলেই হবে। ব্যস্ততার তো কিছু নেই। তুমি তো এখানে অনেকদিন থাকবে বলেছো।

যতদিন তোমার ছুটি না ফুরোয়।

সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়েছিল, জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললাম টুকরোটা। ঊর্মি আবার সেই রকম ভাবে তাকালো।

আগে আমি কিছু বুঝি নি। সেদিন তিন চার বার সিগারেট ধরাবার পর একসময় আমার খেয়াল হলো, প্রত্যেকবারই আমি সিগারেট প্যাকেট থেকে বার করে ধরাবার আগে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ওপর ঠুকে নিচ্ছি। এবং সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এলে, কাছাকাছি অ্যাসট্রে থাকলেও আমি টুকরোটা সেখানে না নিভিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি জানালা দিয়ে।

এ রকম স্বভাব আমার কখনো ছিল না। রজত এ রকম করতো। কখন যেন অবচেতনভাবে আমি রজতকে অনুকরণ করতে শুরু করেছি। এর কারণ কি ?

যাই হোক, এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটাকে আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম।

আসলে ব্যাপারটা আমি ভুলেই গেলাম। এবং পরবর্তী সিগারেট ধরাবার সময় ঠিক সেই ভাবে আবার ঠুকতে লাগলাম বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখে।

কাল রাত্রে ঊর্মি'র পাগলামির ভাব দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ডাক্তার ডাকতে হবে। কিংবা শিগগিরই কলকাতায় ফিরতে

হবে। কিন্তু আজ সকালে ঊর্মি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক।

সকালবেলাই স্নান করে নিয়েছে। স্নান করার পর ভিজে চুলে সব মেয়ের মুখেই একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটে ওঠে। ঊর্মির রূপ এই সময় আরও বেশী খোলে। ঊর্মির সেই উদাসীন উদাসীন ভাবটা আর নেই। সে বরং ঘুরে ঘুরে টুকিটাকি করছে এবং ঘরটাকে সাজাচ্ছে। আমরা এখানে বেশ কিছুদিন থাকবো তো, সেই জন্য। এই দু'দিন আমাদের জিনিসপত্তর যেমন ভাবে আনা হয়েছিল, প্রায় সেই রকম ভাবেই পড়ে ছিল।

এমনকি ঊর্মি ইচ্ছে প্রকাশ করলো, সে দু'একটি আইটেম নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে আমাকে। প্রত্যেকদিন মালীর রান্না খাওয়া যায় না। মালী যদিও বেশ ভালোই রাঁধে, তবে মাছটা একেবারে পারে না। প্রত্যেকদিন মাংস খাওয়া যায় না, বাঙালী জিভে মাছ না হলে খাওয়াটাই জমে না ঠিক মতন।

ঊর্মি বললো, তুমি যাও না, বাজার থেকে ভালো দেখে মাছ নিয়ে এসো না।

আমি হাসলাম। আজ থেকে তাহলে আমাদের খাঁটি বিবাহিত জীবন শুরু হলো। স্বামী বাজার করে আনবে। স্ত্রী থাকবে রান্নাঘরে। সারাদিন স্ত্রী ব্যস্ত থাকবে সংসারের কাজে, স্বামী বাইরে বাইরে ঘুরবে।

আমি ঊর্মিকে বললাম, তুমিও চলো না। একসঙ্গে বাজারে যাই।

ঊর্মি বললো, আমি আজ যেতে পারবো না। আমার কত কাজ! পর্দাগুলো লাগাতে হবে। আয়নাটা পরিষ্কার করতে হবে।

আমি কখনো বাজার করি নি। আমাদের নিজেদের বাড়িতে ও কাজটা চাকররাই সারে। তবু ঊর্মির অনুরোধে বেরিয়ে পড়লাম। ঊর্মি আরও কতকগুলো জিনিসের লিস্ট বানিয়ে দিল, যেমন সাবান, সূচ সুতো, কনডেন্সড মিল্ক, পাঁপড় ইত্যাদি।

সেন লজ-এর সামনে দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আজও ভেতরে রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজছে।

আমার একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, ওরা কাল রাত্তিরে পঙ্কজ মল্লিকের 'দেখা না দেখায় মেশা হে' গানটা বাজিয়েছিল কিনা। কিন্তু লজ্জা করলো। হঠাৎ এরকম প্রশ্নে ওরা নিশ্চয়ই অবাক হবে যাবে।

নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করার মতন প্রতিভা আমার নেই। অচেনা

লোকের কাছে আমি এখনো একটু লাজুক হয়ে পড়ি। তবু সেন লজ-এর সামনে দাঁড়ানো লোক দুটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমিই হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনারা কবে এসেছেন ?

ভদ্রলোক দু'জনও সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। তারপর নাম-জানাজানি এবং কলকাতার কোন পাড়ায় আমাদের বাড়ি এবং ওঁদের বাড়ি, এই সব কথাবার্তা হলো। ওঁরা ওঁদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি পরে এক সময় যাবো বলে ওঁদের নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের বাড়িতে আসার জন্য।

এই সময় রাস্তা দিয়ে একটা খালি টাঙ্গা যাচ্ছিল বলে আমি সেটাকে ডেকে উঠে পড়ে রওনা ছিলাম বাজারের দিকে।

বাজার থেকে একগাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র কিনে ফেললাম উৎসাহের আতিশয্যে। ঊর্মি'র লিস্ট মিলিয়েও সব কিছু কিনতে ভুললাম না। আজ আমার প্রথম সংসার।

ফিরে এসে দেখলাম ঊর্মি' তার শাড়ীটা গাছকোমর বেঁধে রীতিমতন রান্নায় লেগে গেছে। আমি মাছ-তরকারি-মশলা ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে এলাম রান্নাঘরে এবং পাকা সংসারীর মতন ঊর্মি'কে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, দ্যাখো তো মাছটা কি রকম এনেছি ? বেগুনগুলো কি রকম টাটকা দেখেছো—কলকাতায় পাওয়া যায় না।

আমার নতুন ভূমিকায় আমি নিজেই মজা পাচ্ছিলাম।

ঊর্মি' আমাকে তাড়া দিয়ে বললো, তুমি ভেতরে গিয়ে বসো তো! রান্নাঘরে কি করছো ?

আমি ঊর্মি'কে দরাজ গলায় হুকুম দিলাম, এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও তো !

ঊর্মি' অবাক হয়ে বললো, তুমি এই সময় চা খাবে ? সকালবেলা এক কাপের বেশী চা তো খাও না কখনও।

আজ থেকে খাবো।

ভেতরে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বাঁ হাতের নখের ওপর সিগারেট ঠুকতে লাগলাম। ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি বোধ করছি। এক্ষুণি যেন একটা কিছু করা দরকার। খানিকটা দৌড়োদৌড়ি লাফালাফি

করলে বেশ হতো। অথচ এ রকম ইচ্ছে আমার আগে কখনো হয় নি।

সেখান থেকে উঠে চলে এলাম দোতলায়। মিনিট দশেক শুয়ে রইলাম বিছানায়। তাও ভাল লাগছে না। আবার সেখান থেকে এলাম বারান্দায়। একটা বই খুলে বসলাম। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। আমার গায়েও রোদ লাগছে। লাগুক, তবু আমি এখানেই বসে থাকবো।

বই খুললেও তাতে একটুও মন বসে না। গত রাত্রির কথা মনে পড়ে। মাঝরাত্রে দরজা খুলেই রজতকে দেখেছিলাম। সেটা আমার চোখের ভুল? নিশ্চয়ই। চোখের ভুল ছাড়া আর কি? ঊর্মি'কে সামলাতে সামলাতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুর্বল মস্তিষ্কে মানুষ এরকম অনেক কিছু দেখে। রজত আমাকে দেখে হেসেছিল…ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলেছিল, চুপ—রজত আমাকে কি আরও কিছু বলতে চাইছিল?

এক সময় ঊর্মি' এসে জিজ্ঞেস করলো, এই তুমি রোদ্দুরের মধ্যে বসে আছো কেন?

আমি পেছন ফিরে ঊর্মি'র দিকে তাকালাম। এতক্ষণ আগুনের আঁচের কাছে ছিল বলে ঊর্মি'র মুখখানা লালচে দেখাচ্ছে। কপালে আর গালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

ঊর্মি', তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

সত্যি! আয়নায় মুখটা একবার দেখতে হলো।

থাক, আর মুখ দেখে দরকার নেই। জানো, আমার হঠাৎ খুব সর্দি হয়ে গেছে। তোমার রুমালটা দাও তো—

কি করে সর্দি হলো?

কি জানি। কাল রাত্তিরে ছাদে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়েছিলাম—সর্দি আমার একটুও ভালো লাগে না। কি ওষুধ খাওয়া যায় বলো তো?

ওষুধ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দরাজ গলায় হেসে উঠলাম। হাসতে হাসতেই বললাম, সবচেয়ে ভালো ওষুধ আছে আমার কাছে। তারপর অবিকল ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে আমি প্যাণ্টের পেছনের পকেট থেকে বার করলাম একটা ছোট ব্র্যাণ্ডির বোতল।

রীতিমতন ভয় পেয়ে ঊর্মি' তাকালো আমার দিকে। আমিও হকচাকিয়ে গেলাম।

ব্র্যান্ডির বোতল আমার পকেটে এলো কি করে ? এ তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সত্যিই ম্যাজিক নাকি ?

আমার অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়লো, বাজার থেকে ফেরার সময় আমি একটা মদের দোকান দেখেছিলাম বটে। সে দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন ? আমি মদ কিনবো, দিন দুপুরে, এ কি কল্পনা করা যায় ? কেউ কি আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে ?

আমার বিস্ময় কয়েক মুহূর্ত মাত্র স্থায়ী হয়েছিল। তারপরই যেন আমার মনে হলো, আমার পকেটে একটা ব্র্যান্ডির বোতল থাকা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি বোতলের ছিপি খুলে ঊর্মি'র দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, নাও, এক চুমুক খেয়ে দেখো না।

ঊর্মি' বিস্ফারিত চোখে বললো, তোমার হয়েছে কি ?

কি আবার হবে ? সর্দি হলে ব্র্যান্ডি খেতে হয়, এ তো সবাই জানে।

তুমি, তাই বলে তুমি—

ঊর্মি'কে কথা শেষ করতে দিলাম না। বোতলটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম ওর মুখের দিকে। ঊর্মি' হাত দিয়ে জোরে সেটা ঠেলে দিল।

তুমি এ রকম করছো কেন ? আগে বুঝি কখনো ব্র্যান্ডি খাও নি ?

আর কোনো দিন খাবো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

এটা যেন খুব হাসির কথা, এই রকম ভাবে হেসে উঠলাম আমি। তারপর বোতলটা নিজের মুখের কাছে এনে ঢক ঢক করে ঢেলে দিলাম গলায়। বোতলটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পানীয় একসঙ্গে নামলো আমার গলা দিয়ে, মুখটা একটুও বিকৃত হলো না। খুব তৃপ্তির সঙ্গে আঃ বলে একটা সিগারেট ধরালাম।

ঊর্মি' পাথরের মূর্তি'র মতন দাঁড়িয়ে আছে। আমার মুখের দিকে ওর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ, মনে হয় যেন পলক পড়ছে না।

আমি ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলাম, কি, ও রকম ভাবে কি দেখছো ?

তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

অন্যরকম মানে কি রকম ?

আয়নায় একবার দেখো।

তুমিই তো আমার আয়না।

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে আমি ঊর্মিকে জড়িয়ে ধরলাম। রাস্তা থেকে বারান্দার সব কিছু দেখা যায়—যে কোন পথ-চলতি লোক কিংবা বাড়ির মালী আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পাবে। সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঊর্মি ত্রাসে চেঁচিয়ে উঠলো, ছাড়ো; ছাড়ো।

না, ছাড়বো না।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

আমি তো বরাবরই পাগল।

ঊর্মিকে আর কথা বলতে না দিয়ে সেই অবস্থাতেই টানতে টানতে নিয়ে এলাম শোবার ঘরে, একটানে ওর শাড়ী খুলে ফেললাম।

ঊর্মি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি যেন কোনো নারীকে বলাৎকার করছি এই ভঙ্গিতে অতি দ্রুত ওর ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে শায়ার দড়িয়ে গিঁট পাকিয়ে, ওকে নিয়ে দড়াম করে পড়ে গেলাম বিছানার ওপর। তারপর বর্বরের মতন শুধু সম্ভোগেই মত্ত হয়ে রইলাম।

এই সময়টাতে ঊর্মি একটাও কথা বলে নি। তারপর খুব ধীরে ধীরে ওর বিশ্রস্ত বসন ঠিক করলো। মুখ নীচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। যেন ও খুব অপমানিত হয়েছে। আমি সিগারেট ঠুকতে লাগলাম নখে।

হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে ঊর্মি রীতিমতন দৃঢ় গলায় বললো, আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। মাঝখানে আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল বলে আমি রজতের কাছে চলে গিয়েছিলাম। সেটা ভালোবাসা নয়, শুধুই মোহ—এখন আমি ভালোই বুঝতে পেরেছি! রজত আমার কেউ নয়। রজত বেঁচে নেই। তুমি রজতকে ভুলে যাবে বলেছিলে, তুমি কথা দিয়েছিলে—

তোমরা মেয়েরা বড্ড ন্যাকা হও।

এই কথা বলার সঙ্গেসঙ্গে আমি ঠাস করে ঊর্মির গালে একটা চড় বসালাম। অত্যন্ত জোরে। ঊর্মির ফর্সা মুখে আমার আঙুলের ছাপ বসে গেল।

ওকে সেই অবস্থায় রেখে আমি চলে এলাম বারান্দায়। ব্র্যান্ডির বোতলটা তুলে নিয়ে আবার চুমুক দিলাম। খুব তৃপ্তির সঙ্গে। যেন এ রকম ভাবে ব্র্যাণ্ডি পান করা আমার বহুদিনের অভ্যেস।

বোতলটা পাশে নামিয়ে রাখার পরেই মনে হলো, একি করলাম আমি ? ঊর্মিকে চড় মারলাম ? কোনো দিন স্বপ্নেও এ কথা ভাবি নি। ঊর্মিকে

আঘাত করে আমি আনন্দ পাচ্ছি ? এ কি কখনো সম্ভব ?

আবার দৌড়ে চলে এলাম পাশের ঘরে। ঊর্মি ঠিক সেই একভাবে বসে আছে। আমি ওর পাশে গিয়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলাম, ঊর্মি এ আমি কি করলাম! আমি বুঝতে পারি নি—ঊর্মি আমাকে ক্ষমা করো,লক্ষ্মীটি—

ঊর্মি মুখ তুললো। চোখ দুটো শুকনো। আমার ডান হাতটা চেপে ধরে বললো, তুমি আমাকে মেরেছো, সে জন্য আমি কিছুই মনে করি নি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে—রজতের কোনো স্থান নেই আমাদের জীবনে—সে হারিয়ে গেছে। সে আর কোথাও নেই—

আমার মেজাজটা আবার বদলে গেল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্ষ গলায় বললাম, এসব আজে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে কি লাভ! রান্নাবান্না হয়ে থাকলে খাবার দাবার দিতে বলো—

ঊর্মি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খাবার খেতে বসে আমি দুটো কাঁচালঙ্কা চেয়ে নিয়ে কচ কচ করে চিবিয়ে খেলাম। ঝাল লাগলো না একটুও। কোনো রান্নাই ঠিক পছন্দ হলো না আমার। নানা রকম অভিযোগ করতে করতেও অবশ্য খেয়ে ফেললাম অনেকখানি। আমার সাংঘাতিক ক্ষিদে পেয়েছিল। সারা জীবনে আমি কখনো যেন এত ক্ষুধার্ত বোধ করি নি।

খেয়ে উঠে বললাম, চলো ঊর্মি একটু বেরিয়ে আসা যাক।

ঊর্মি অবাক হয়ে বললো, এই রোদ্দুরের মধ্যে? এখন কোথায় বেড়াতে যাবে ?

চলোই না। বেরিয়ে পড়া যাক। তারপর দেখা যাবে।

না, এখন আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, আরে চলো, চলো।

ঊর্মি এবার খুব কঠোর ভাবে বললো, আমি এখন কোথাও যাবো না। তুমি কি আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চাও ?

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে তুমি থাকো, আমি একাই চললাম।

কোথায় যাবে একা ?

যেখানে খুশী।

যেও না, আমি অনুরোধ করছি যেও না।

শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

চটিটা পায়ে গলিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। হন হন করে খানিকটা হেঁটে এসে সেন লজ-এর কাছাকাছি থমকে দাঁড়ালাম। গেটের পাশ থেকেই দেখা যায় বাগানের ওপরের বাড়িটার বারান্দায় দুটি মেয়ে ও একজন পুরুষ বসে গল্প করছে। এ বাড়িটা একতলা। এরা বেশীর ভাগ সময় সামনের বারান্দাটাতেই কাটায়।

মেয়ে দুটির দিকে আমি খানিকটা লোভের দৃষ্টিতে তাকালাম। দু'জনেই মোটামুটি সুন্দরী। স্বাস্থ্যও ভালো। আমার ইচ্ছে হলো, ভেতরে ঢুকে ওদের সঙ্গে আলাপ করি। অসুবিধের কি আছে, এ বাড়ির দু'জন লোক তো আমাকে যেতে বলেই ছিল।

গেটের কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ আমি কি করছি? ঊর্মি'কে বাড়িতে একা ফেলে রেখে আমি অচেনা দুটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করার কথা ভাবছি? এ রকম মানসিকতা আমার হলো কি করে? আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, স্বেচ্ছায় ঊর্মি'কে এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়াল করবো না। সেই আমিই ঊর্মি'কে ফেলে রেখে এসে…

পেছন ফিরে আবার হন হন করে হাঁটলাম বাড়ির দিকে। গেটের কাছে এসে দেখলাম, বারান্দায় রোদ্দুরের মধ্যে ঊর্মি' দাঁড়িয়ে আছে আমার প্রতীক্ষায়। আমি এক দৌড়ে বাগান পেরিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম। ঊর্মি'কে জড়িয়ে ধরে বললাম, ঊর্মি', ঊর্মি', আমি কি খারাপ হয়ে গেছি? আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি।

তুমি আজ সারাদিন যে-রকম ব্যবহার করছো, তার একটুও তোমার মতন নয়।

কেন আমি এ রকম করছি বলো তো?

তোমার মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ঊর্মি' তুমি আমাকে ভালো করে দাও।

চলো, এখন একটু ঘুমোবে চলো। ভালো করে ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীছেলের মতন আমি ঊর্মি'র সঙ্গে চলে এলাম ঘরের মধ্যে। ঊর্মি' বিছানায় বসে জোর করে আমার মাথাটা তুলে নিল ওর কোলে। আমার

চুলের মধ্যে হাত বোলাতে লাগলো। উর্মি'র হাতের ছোঁয়ায় দারুণ শান্তি পেলাম। কেন আমি বাইরে গিয়েছিলাম রোদ্দুরের মধ্যে? এ রকম ভাবে যদি শুয়ে থাকা যায়, তার চেয়ে আর বেশী শান্তি কিসে?

এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই অজান্তে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তাও জানি না। চোখ মেলে মনে হলো, বিকেল পেরিয়ে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

উর্মি' তখনও আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে। এতক্ষণ এরকম-ভাবে বসে থাকার কোনো মানে হয়, অনায়াসেই নামিয়ে দিতে পারতো।

ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম, তুমি ঘুমোও নি?

না।

কেন? শুধু শুধু বসে রইলে?

আমার ঘুম পায় নি। তোমার এখন কেমন লাগছে।

খুব ভালো। ব্র্যাণ্ডির বোতলটা কোথায় গেল?

তুমি এখন ব্র্যাণ্ডি খাবে নাকি?

তা ছাড়া কি খাবো?

এখন চা খাবার সময়—

না, না, বেশী চা আমার ভালো লাগে না। ব্র্যাণ্ডির বোতলটা দাও না।

তুমি তো আগে কখনো মদ খেতে না!

এখন থেকে খাবো। রোজ খাবো—

না, তুমি ওসব খেতে পারবে না।

আঃ, তর্ক করছো কেন? বলছি বোতলটা এনে দাও, তা নয় যত আজে বাজে কথা—

তুমি যদি এ রকম করো, তাহলে আমরা আর একদিনও এখানে থাকবো না। কালই কলকাতায় ফিরে যাবো।

আমি উর্মি'র কাঁধের কাছটা আঁকড়ে ধরে বললাম, কোথায় যাবে তুমি? আমি আর তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না।

ছাড়ো, অত জোরে ধরেছো কেন, আমার লাগছে। ছাড়ো, ছাড়ো।

না ছাড়বো না! তোমাকে আর কোথাও যেতে দেবো না। দার্জিলিং থেকে পালিয়েছো বলে আবার এখান থেকেও পালাবে?

দার্জিলিং? কি বলছো তুমি?

আমি ঊর্মি'র মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হিংস্র গলায় বললাম, কেন, এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে? দার্জিলিং-এর কথা মনে নেই? মেয়েছেলেরা এ রকমই হয়, তাই না? এত ভালোবাসা ছিল, এত আদর—আর এরই মধ্যে সব ভুলে যেতে পারলে?

ঊর্মি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, ওকি, তুমি আমার দিকে ও রকম করে তাকাচ্ছো কেন? তুমি রজত নও; তুমি রজত নও—

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললাম, চুপ! এখন তো এসব কথা বলবেই! ছেনালি মেয়েছেলে কোথাকার।

আমি ঊর্মি'র ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরলাম। ঊর্মি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো। আমি ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে—

এই সময় দরজার বাইরে থেকে মালী ডাকলো, বাবু, বাবু।

আমি হুংকার দিয়ে বললাম, কে?

আপনাকে ডাকতে এসেছেন।

এখন কথা হবে না, চলে যেতে বলো।

সেন লজ-এর দাদাবাবু আর দিদিমণিরা এয়েছেন। ওনারা বললেন—

ঊর্মি ততক্ষণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে মালীর নাম ধরে বললো, না, না, রতন, ওদের দাঁড়াতে বলো আমি আসছি—কিংবা, রতন ওদের বলো ওপরে আসতে, ওপরে আসতে বলো এক্ষুণি।

আমি উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ালাম। বাগানের মধ্যে সেন লজ-এর দু'জন মহিলা এবং তিন জন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। একজনের সঙ্গে একটা মোটরসাইকেল।

সেটা দেখেই আমার চোখ চক চক করে উঠলো। যেন অনেককালের পুরনো বন্ধুকে দেখলাম। চীৎকার করে বললাম, দাঁড়ান, আমি এক্ষুণি আসছি।

ঝড়ের বেগে দুমদাম করে নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। রক থেকে লাফিয়ে বাগানে নেমে ছুটে ওদের কাছে গিয়ে বললাম, আপনারা এসেছেন? বাঃ খুব খুশী হয়েছি, আসুন, ভেতরে এসে বসুন, আমার স্ত্রী আসছেন।

ওদের কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি মোটরসাইকেলটার কাছে গিয়ে আবার বললাম, বাঃ এটা তো দারুন জিনিস, একেবারে নতুন, তাই না?

মোটরসাইকেলের মালিক বিগলিত হাস্যে বললো, হ্যাঁ, নতুনই প্রায়।

আমি লোকটিকে গ্রাহ্য না করেই বললাম, এটা একটু চালিয়ে দেখবো ? আমার ছেলেবেলা থেকে মোটরসাইকেলের শখ।

লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। সে হ্যাঁ কিংবা না বলার আগে আমি তার কাছ থেকে মোটরসাইকেলটা নিয়ে নিলাম। স্টার্ট দিলাম পা দিয়ে। সেটা গর্জন করে উঠতেই আমার সারা শরীরে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। কি মিষ্টি আওয়াজ।

মোটরসাইকেলটায় উঠে বসেই হুস করে বেরিয়ে গেলাম বাগান থেকে। সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম ঊর্মির চিৎকার, না, না, যেও না। এই, কি করছো! আপনারা ওকে ধরুন। শিগগির ধরুন।

কিন্তু তখন আমাকে ধরার সাধ্য কারুর নেই। বাগান থেকে বেরিয়েই আমি বেঁকে গেলাম ডান দিকে। খোলা রাস্তা দিয়ে গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ছুটে চললো।

হু-হু করছে হাওয়া, তার মধ্য দিয়ে আমি ছুটে যাচ্ছি, অসম্ভব ভালো লাগছে। হাত দিলাম প্যান্টের পেছনের পকেটে, ব্র্যান্ডির বোতলটা বার করার জন্য। সেটা নেই। আনা হয় নি। কেন যে সেটা আনলাম না বুদ্ধি করে!

পরমুহূর্তেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। আমি মোটরসাইকেল চালাচ্ছি! জীবনে কখনো মোটরসাইকেলে উঠি নি। কি করে স্টার্ট নিলাম, কি করে এখনো এর ওপরে বসে আছি!

থামাতে হবে, এক্ষুণি থামাতে হবে। কিন্তু থামাতে তো জানি না। কোথায় ব্রেক ? কোথায় ক্লাচ ? গাড়িটা চলছে কি করে ?

সামনে কতকটা দূরে একটা গরুর গাড়ি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এবার আমি মরবো। গাড়িটা থামাতেই হবে যে কোনো উপায়ে।

আমার মাথার ভেতরে কে যেন ফিস ফিস করে বললো, কোনো ভয় নেই, ঐ তো গরুর গাড়ির পাশ দিয়ে জায়গা আছে।

আমি বুঝলাম, এ টুকু জায়গা দিয়ে আমি যেতে পারবো না। গাড়ি থামাতেই হবে। থামাতে পারছি না। একমাত্র লাফ দিয়ে পড়া—

আবার কে যেন মাথার মধ্যে বললো, কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই, এই তো চমৎকার জীবন, কি দারুণ উত্তেজনা—এখানে কি কেউ ভয় পায় ?

গরুর গাড়িটা খুব কাছে এসে গেছে। অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি, গরুগুলোর জ্বলজ্বলে চোখ, এবার ধাক্কা লাগবে। এখনো যদি লাফিয়ে না পড়ি—

না, না, লাফিও না।

হ্যাঁ, আমাকে বাঁচতেই হবে।

পরক্ষণেই প্রচণ্ড একটা শব্দ। আমার চোখের সামনে চড়াৎ করে তীব্র হলদে আলোর একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারপর সব অন্ধকার।

চোখ মেললাম হাসপাতালে। শরীরে অনেকগুলো ব্যাণ্ডেজ। তবু আমার মনেই পড়ছিলো না কেন হাসপাতালে এসেছি। কি হয়েছিল আমার? কথা বলতে গেলাম। কণ্ঠস্বরই যেন বেরুচ্ছে না। আমি কি কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি?

নিজের শরীরটার দিকে তাকালাম। আমার দু'খানা হাত, দু'খানা পা ঠিকই আছে। আমি শুয়ে আছি হাসপাতালের খাটে। কেন? আমার মনে পড়ছে, রাত্তিরবেলা ঊর্মি ভয় পেয়েছিল, ওকে আমি সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। তারপর থেকে কি হয়েছে?

চোখের সামনে থেকে যেন হালকা ধোঁয়া সরে যাচ্ছে। মাথার মধ্যেও যেন জলস্রোতের শব্দ। না, না, জলস্রোত নয় তো একটা মোটরসাইকেলের আওয়াজ, এবার আমার মনে পড়ছে।

ঊর্মি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে এগিয়ে এলো। তক্ষুণি আমার মনে হলো, ঊর্মিকে একটা অত্যন্ত জরুরী কথা আমার তক্ষুণি জানানো দরকার কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর বেরুচ্ছে না যেন। গলা আটকে যাচ্ছে।

ঊর্মি আমার দিকে ও রকম অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে কেন? ঊর্মি কি এখনো ভুল করছে?

আমার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো।

ঊর্মি আমার খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম, না।

তোমার চোখ দুটো মুছে দিই?

ঊর্মি আমাকে স্পর্শ করা মাত্রই আমার কণ্ঠস্বর ফিরে এলো। আমি মিনতিমাখা গলায় বললাম, ঊর্মি, আমি বিভাস। আমাকে চিনতে পারছো তো?

গল্পমালা

জ্যোৎস্নার বাগান

পন্ডিতিয়ার মোড়ে আমরা চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। আকাশ মেঘলা, যে কোন সময় বৃষ্টি আসবে এই রকম একটা ভাব নিয়ে গত দু'তিনদিন খুব গুমোট গরম চলছে। আমাদের প্রত্যেকেরই মুখ ঘামে তেলতেলে। কথা বলতে বলতে আমিই প্রথম দেখতে পেলাম ঝর্ণাকে। ত্রিকোণ পার্কের পাশ দিয়ে এসে সে এইমাত্র রাস্তা পেরুচ্ছে। ফলসা রঙের শাড়ি পরা, হাতে একটা হলুদ শপিং ব্যাগ।

এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা, এই সময় রাস্তার ট্রাম-বাস, মানুষের ভিড় একেবারে চূড়ান্ত হয়। এই মোড়ে কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই, কিন্তু ঝর্ণা রাস্তা পেরুবার সময় সব কিছু যেন আপনা আপনি থেমে গেল। চারদিকের রাস্তায় চারখানা দোতলা বাস, বিপরীতমুখী দুটি ট্রাম, এমনকি কোনো দুরন্ত ট্যাক্সিও অন্যদের পাশ কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করলো না, সবাই যেন বলছে, এখন ঝর্ণা যাচ্ছে, ঝর্ণা যাচ্ছে, ওকে পথ করে দাও! এ যেন মোজেজের জন্য সমুদ্রের দু'ভাগ হয়ে যাওয়া।

অন্যরা কথা বলছে, ঝর্ণাকে দেখতে পায়নি, আমি চুপ করে আছি। ঝর্ণা কি আমাদের কাছে আসবে? মেয়েরা অনেক সময় পুরুষদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে আসে না। আমি ঝর্ণার চোখ চোখে ফেলার চেষ্টা করলাম, যাতে ও চিনতে পেরে একটু অন্তত হাসে। একটা গুমোট বিকেলে একটু হাসিই যথেষ্ট।

আমাকে দেখতে না পেলেও ঝর্ণা এইদিকেই আসছে। ঈষৎ অন্যমনস্ক। মাটির দিকে চেয়ে হাতের ব্যাগটা দোলাচ্ছে। ঝর্ণার সঙ্গে আমার ততটা পরিচয় নেই, যাতে ওকে ডাকতে পারি। অবশ্য এতজন বন্ধুর মাঝখানে ওকে ডেকেই বা কী হবে? যদি একলা কখনো দেখা হয়, কোনো একটা বাগানের ধারে, আমি ওর সঙ্গে এলেবেলে কথার ছলে ওকে দু' চোখ ভরে দেখবো! ঝর্ণার মুখের মধ্যে কিছু একটা আছে, ঐ মুখের দিকে তাকালেই মনটা আনন্দে ভরে যায়। শুধু চোখে দেখার এমন আনন্দ পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের কাছ থেকে বোধহয় পাওয়া যাবে না।

ঝর্ণা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। আমাকে নয়, সে সুদীপকে দেখতে পেয়েছে।

অন্যদেরও সে চেনে। ঝর্ণা কাছে এগিয়ে আসতেই সবাই কথা থামিয়ে দিল। ঝর্ণার উপস্থিতির সম্মানে সবাই মাথা নীচু করলো।

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ঝর্ণা জিজ্ঞেস করলো এই, তোমরা কেউ ব্যালে দেখতে যাচ্ছো না ?

কয়েক মুহূর্ত কেউ উত্তর দিল না।

সারা শহরে সোভিয়েত ব্যালে নিয়ে দারুণ মাতামাতি চলছে। বিশ্ব-বিখ্যাত বলশয় ব্যালে দল এসেছে, তাই নিয়ে কলকাতার মানুষ একেবারে উত্তাল। টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি। রবীন্দ্রসদনের সামনে, ময়দানে ভোর থেকে লাইন। দু'দিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে সব টিকিট শেষ।

সুদীপ বললো, আমরা কেউ টিকিট পাইনি। ঝর্ণা বললো, আমিও পাইনি। একজন দুটো টিকিট দেবে বলেছিল, তারপর তার পাত্তা নেই। আমি দেখবো না ?

ঝর্ণার মুখে একটুও ঘাম নেই, তার চটি পরা পায়ে একটুও ধুলো নেই, তার গায়ের রং ঝর্ণার জলেরই মতন স্বচ্ছ।

আমার মনে হলো, এই শহরে যদি একজনেরও এ নৃত্য উৎসব দেখার যোগ্যতা থাকে, তবে তা ঝর্ণারই। সে কেন টিকিট পাবে না ?

কর্তাব্যক্তিদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই!

আমাদের সবার মুখে একবার করে তাকিয়ে ঝর্ণা অভিমানের সঙ্গে বললো, আমার এত ইচ্ছে ছিল···

ঝর্ণা চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সুদীপ বললো, এই ঝর্ণা, শোন—

ঝর্ণা তবু দাঁড়ালো না, সে মানুষজনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি তৎক্ষণাৎ দারুণ একটা চাঞ্চল্য বোধ করলুম। ঝর্ণা আমাদের প্রত্যেকের ওপর একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছে। ঝর্ণার জন্য একটা টিকিট জোগাড় করা যাবে না। এ কখনো হতে পারে ?

আমি ঝর্ণার সঙ্গে কখনো সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাইনি। পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে হাঁটিনি। কিন্তু এবারে দুটি ব্যালের টিকিট নিয়ে গিয়ে ঝর্ণাকে অনায়াসে বলতে পারি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? ট্রাম-বাস নয়, পণ্ডিতিয়ার মোড় থেকে ট্যাক্সিতে নিয়ে যাবো ঝর্ণাকে। রবীন্দ্র সদনের সিঁড়ি দিয়ে সে আমার হাত আলতো করে ধরে উঠবে। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সারির ঠিক মাঝখানে বসবো আমরা, নর্তকীরাও আমাদের দেখতে পাবে।

অন্তত তিরিশ জনের কাছে টিকিটের জন্য দৌড়োদৌড়ি করলুম আমি। কয়েকজন পাত্তাই দিল না। কয়েকজন বললো, আগে এলে না কেন? কেউ কেউ ক্ষীণ আশা দিয়ে বললো, কাল সকালে দেখা করো। সকালে গেলে তারা বলে বিকেলে আসতে। কিংবা আবার পরের দিন দুপুরে।

শেষ পর্যন্ত একজন আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে কৃপা করে, প্রায় শেষ মুহূর্তে একখানা মাত্র টিকিট দিল। তাও খুব কম দামের।

ওপরতলায় এত পেছনে বসতে হবে যে সেখান থেকে ভালো করে দেখাই যাবে না। তবু টিকিটটা পেয়েই আমি ছুটে গেলুম ঝর্ণাদের বাড়ি। ঝর্ণা অন্তত জানবে যে আমি তার জন্য চেষ্টা করেছি। আমি তার সঙ্গে যেতে পারবো না, সে একলাই যাক।

ঝর্ণাদের বাড়ির গলির মুখটায় পৌঁছোতে পৌঁছোতেই দেখলুম, একটা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, তাতে ঝর্ণা আর সুদীপ। ব্যালে দেখতেই যাচ্ছে নিশ্চয়ই। সুদীপের বাবার অনেক চেনাশুনো আছে ওপর মহলে। সুদীপ শুধু টিকিটটি জোগাড় করেনি, গাড়িও জোগাড় করে ফেলেছে। সাদা সিল্কের শাড়িতে রাজহংসীর মতন দেখাচ্ছে ঝর্ণাকে। আমাকে ওরা কেউ দেখতে পেল না।

এখন এই টিকিটটা নিয়ে আমি কী করি? এই টিকিট নিয়ে আমি ব্যালে দেখতে যাবো? অসম্ভব! আমি এত স্বার্থপর হতে পারি না। হলেরমধ্যে ঝর্ণা হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে গেলে নিশ্চয়ই ভাববে, আমি তার জন্য টিকিট জোগাড়ের চেষ্টা করিনি, নিজের জন্য করেছি। এত কষ্টে সংগ্রহ করা টিকিটটা আমি ছিঁড়ে ফেললুম।

ঝর্ণা যে শেষ পর্যন্ত দেখতে যেতে পেরেছে, তাতেই তো আমার খুশী হওয়া উচিত। সুদীপের ওপর আমি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু পুরীর টিকিট?

কয়েকদিন পরই ঝর্ণার দাদা অনীশের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় বললো, নীলু, ট্রেনের টিকিটের ব্যাপারে তোর কেউ চেনাশুনো আছে? আমার মায়ের শরীরটা ভাল নেই জানিস তো, মাকে নিয়ে ঝর্ণা পুরী যেতে চাইছে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে কোনো রিজার্ভেশান পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, হ্যাঁ, আমি জোগড় করে দেবো!

কী করে যে বললুম কে জানে! রেলের কোনো লোককে তো আমি

চিনি না। বুকিং অফিসের সামনে বরাবর লম্বা লাইন দেখে এসেছি। তবে, এটাও জানি, সব সীট ভর্তি হয়ে যাবার পরেও কেউ কেউ টিকিট পায়। ভি আই পি কোটা নামে একটা নাকি ব্যাপার আছে। ঝর্ণার চেয়ে বড় ভি আই পি আর কে আছে? ঝর্ণা তার মাকে নিয়ে পুরী যেতে চেয়েছে, তাকে যেতেই হবে।

অনীশ বললো, ওদের দরকার তিনখানা বার্থ রিজার্ভেশান। যদি চারখানা পাওয়া যায়? তাহলে আমিও যেতে পারি ওদের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে ঝর্ণা আমার মুখোমুখি বসবে। ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাবে তার হাসির শব্দ। বাঙ্কে উঠে ঘুমোবে ঝর্ণা। আমি দেখবো তার ঘুমন্ত মুখ। ঝর্ণা সমুদ্রে স্নান করতে নামবে, আমি জানি সমুদ্রের ঢেউ খেলা করবে তাকে নিয়ে, আকাশ ঝুঁকে আসবে তার জন্য।

ট্রেনের টিকিট কে দেয়! বুকিং অফিসে গিয়ে শুনলুম, কোনো আশা নেই। তবু যেতেই হবে। ঝর্ণাদের সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে! বিশ্বদেবদার সঙ্গে অনেক ফুটবল খেলোয়াড়ের চেনাশুনো। খেলোয়াড়রা কি ইচ্ছে মতন টিকিট পায়? বিশ্বদেবদা আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিশ্বদেবদাকে গিয়ে বলবো, আমাকে চাকরি দিতে হবে না। তুমি শুধু আমাকে পুরীর চারখানা টিকিট দাও!

বাস স্টপে একদিন ঝর্ণাকে দেখতে পেলুম দূরে থেকে। একজন সখীর সঙ্গে গল্প করছে হেসে হেসে। আমি চট করে সরে গেলুম অন্যদিকে। পুরীর টিকিট জোগাড় না করে ঝর্ণার চোখের সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার নেই।

বালিগঞ্জ স্টেশানের কাছে একজন নাম করা সাধু মহারাজ এসেছেন। ওঁর নাকি অনেক রকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে। উনি তৈরি কত দিতে পারেন না চারখানা ট্রেনের টিকিট? ওঃ, সে বাড়ির সামনে গাড়িওয়ালা লোকদের ভিড়, আমাকে উনি পাত্তা দেবেন কেন?

ভবানীপুরে এক বাড়িতে টিউশানি করেছিলুম কিছুদিন। যে ভদ্রলোকের ছেলেকে পড়াতুম, তাঁর কাপড়ের ব্যবসা। ছেলেকে তিনি হস্টেলে ভর্তি করে দিয়েছেন। মাস্টার হিসেবে আমাকে তিনি অপছন্দ করতেন না, ছেলেটির মা মারা গেল বলেই তাকে হস্টেলে পাঠানো হলো। সেই ভদ্রলোক কি পারেন টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে?

শেষ পর্যন্ত মনে পড়লো, সুদীপের কাছেই তো যাওয়া যেতে পারে। সুদীপ দুর্লভ রাশিয়ান ব্যালের টিকিট এনে দিতে পারে আর চারখানা ট্রেনের টিকিট দিতে পারবে না?

সুদীপের বাড়িতে যেতেই ওর সঙ্গে দেখা হলো। আমাকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে হলো না, সুদীপ নিজেই জানালো যে পরশু সে পুরী যাচ্ছে অফিসের কাজে। ঝর্ণারাও পুরী যেতে চায় শুনে সে ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে ওদের জন্যও টিকিট কিনে দিয়েছে। মোট চারখানা টিকিট। অতি সহজ ব্যাপার।

এবারেও তো সুদীপের ওপর আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ঝর্ণা তার 'মাকে নিয়ে পুরী যেতে চেয়েছিল, যেতে পারাটাই তো বড় কথা। আমার বদলে চলন্ত ট্রেনের জানলায় ঝর্ণার মুখোমুখি বসবে সুদীপ। সমুদ্রে সুদীপই ওর পাশে থাকবে। ঝর্ণা জানতেও পারবে না, ওদের টিকিট জোগাড়ের জন্য আমি কত চেষ্টা করেছি। আমি পারিনি, কিন্তু আমার বাসনার তীব্রতায় কোনো খাদ ছিল না।

আমি ব্যাপারটাকে খুব শান্ত ভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলুম। সুদীপ ভালো ছেলে, সে ঝর্ণা ও তার মাকে যত্ন করবে। সুদীপের দায়িত্ব জ্ঞান আছে। ওরা তো আবার ফিরে আসবেই, তখন আবার ঝর্ণার সঙ্গে দেখা হবে।

তবু রাত আটটায় আমি ঝর্ণাদের বাড়ির কাছের মোড়টায় না গিয়ে পারলুম না। একবার, এক ঝলক ঝর্ণাকে দেখতে চাই। আর কিছু না, শুধু চোখের দেখা। ঐ মুখখানি দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

ডান দিকের ফুটপাথে আমি কেন দাঁড়িয়েছিলুম! ঝর্ণা বসেছে ট্যাক্সির বাঁ দিকের জানলায়। চোখাচোখি হওয়া তো দূরের কথা, ঝর্ণাকে আমি দেখতেই পেলুম না ভালো করে। ট্যাক্সিটা হুস করে বেরিয়ে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, ঝর্ণা আর কোনোদিনই আমার হবে না। কখনো থিয়েটার বা নাচ দেখতে যাওয়া হবে না তার সঙ্গে, এক ট্রেনের কাম্পর্টমেণ্টে বসে আমরা কোনোদিন বেড়াতে যাবো না। সমুদ্রে স্নান সেরে ঝর্ণা উঠে আসবে, সেখানে আমি থাকবো না। বুকটা এমন মুচড়ে উঠলো যেন আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। পরক্ষণেই নিজেকে বোঝালুম, আরে, এতটা আঘাত পাবার কী আছে? যারা বাসের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, লটারির টিকিট অতি সহজে পেয়ে যায়, তারাই তো নারীদের নিয়ে যায়। সুদীপই

ঝর্ণার যোগ্য, আমি তো একটা এলেবেলে। আমার আবার এত দুঃখের বিলাসিতা কিসের ?

তবু আমি আপন মনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলুম। কোথায় যাচ্ছি তার ঠিক নেই। এক সময় খেয়াল হলো, হাওড়া ব্রীজের কাছে পেঁছে গেছি। আরে যাঃ, এখন হাওড়া স্টেশনে যাওয়া যায় নাকি ? তাছাড়া এতক্ষণে বোধহয় ঝর্ণাদের পুরীর ট্রেন ছেড়ে গেছে।

আবার পেছন ফিরলুম। রাস্তাগুলো ক্রমশ ফাঁকা আর অন্ধকার হয়ে আসছে। এখন সব রাস্তাই অচেনা। কলকাতার এসব অঞ্চলে আগে কখনো আসিনি মনে হয়। বড় বড় বাড়ি, মাঝখান দিয়ে গাছপালা ঢাকা সরু সরু পথ। কোনো কোনো বাড়ির ওপরের দিকের জানলায় আলো।

ক্রমশ পৃথিবীটা খুব নিজস্ব হয়ে এলো। এখন আর কেউ নেই।

কিছুটা পরিশ্রান্ত হয়ে আমি একটি রেলিং ধরে দাঁড়ালুম। কত রাত এখন কে জানে। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। রেলিং-এর ওপাশেই একটা বেশ বড় বাগান। অনেক রকম ফুল, কিন্তু রাত্রি বেলা কোনো ফুলেরই রং বোঝা যায় না। বাতাসে ফুলগুলি দুলছে, আমার নাকে এসে লাগছে সুগন্ধের ঝাপটা।

এত সুন্দর বাগান, এটা কার ?

সেই বাগানের সৌন্দর্য যেন ঝর্ণার মুখের মতন, চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ফেরানো যায় না। এই বাগানটা কোনদিন আমার হবে না, আমি এই বাগানে ঢুকবো না, এর ফুল ছিঁড়বো না। তবু এই বাগানটা আমার বুক ভরিয়ে দিচ্ছে। ফুলগুলো খেলা করছে, ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে। কখনো যেন ঢেউয়ের ঝাপটায় লাফিয়ে উঠছে। শোনা যাচ্ছে জ্যোৎস্নার হাসির শব্দ।

এমন জ্যোৎস্নার একটা বাগান আমি কোনোদিন নিজের করে পাবো না। সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এখানে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। একটা চরম উপভোগে আমার শরীর যেন আবিষ্ট হয়ে আসছে। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিয়েছে রূপ, আমার ওষ্ঠে চুম্বন করছে বাতাসের লাবণ্য। সুদীপ একথা কোনোদিন জানতে পারবে না।

দেখা না-দেখা

কোথাও বেড়াতে গেলে অনেক কিছুই দেখা হয়, কিন্তু একটা কিছু বাকি থেকে যায়। সেই না-দেখা একটা-কিছুর জন্য মন কেমন করে।

শেষরাত্রে নেমেছিলাম জলগাঁও স্টেশনে। ভোর পর্যন্ত বাসে সেখানেই কাটিয়ে তারপর চলে এলাম ঔরঙ্গাবাদ। আগে থেকে হোটেল ঠিক করা ছিল না, বাসেই কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে শস্তা গোছের হোটেলের নাম জেনে নিয়েছিলাম। দু'জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত একটা গুজরাটি হোটেলে জায়গা পাওয়া গেল। আর সবই ভাল, শুধু নিরামিষ খেতে হবে। যাক গে, মোটে তো তিনটে দিন।

তার বেশি আর সময় হাতে নেই। আগামী সোমবার আমাকে বম্বে পৌঁছতেই হবে। একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ের ব্যাপার। মাঝখানে এই ফাকে অজন্তা-ইলোরা ঘুরে যাওয়া।

চা খেয়েই গেলাম বাস-ডিপোয়। অজন্তা-ইলোরা দুটো দুদিকে, বেশ দূরে দূরে। ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়ার অনেক খরচ। টুরিস্ট বাসেও সেদিন কোন জায়গা নেই। এর মধ্যেই সব ভর্তি। তবে পরের দু'দিনের টিকিট আছে। সেই টিকিটই কেটে নিয়ে যেই আবার রাস্তায় এসেছি, অমনি রাহুলদার সঙ্গে দেখা।

দু'জনেই অবাক।

রাহুলদা বললেন, তুই ?

আমি বললাম, আপনি ?

রাহুলদা আমার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মেরে বললেন, কবে এসেছিস এখানে ? আমাকে খবর দিস নি কেন ?

আমি কী করে জানব যে আপনি এখানে থাকেন ?

তোকে দেবু কিছু বলে নি ?

দেবু আমার ছোটকাকা। রাহুলদা তাঁর বন্ধু। কাকার বন্ধুকে কাকাই বলা উচিত। কিন্তু রাহুলদাই আমাদের বারণ করে দিয়েছিলেন। উনি কাকা, জ্যাঠা, পিসেমশাই হওয়া একদম পছন্দ করেন না। বলে

দিয়েছিলেন দাদা বলে ডাকতে। ওর বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। রাহুলদা ইনকাম ট্যাক্স বিভাগে কাজ করেন। কিছুদিন আগে এখানে ট্র্যান্সফার হয়ে এসেছেন।

কোথায় উঠেছিস? চল, আমার ওখানে চল!

আমি বললাম, আমি যে হোটেলে বুক করে ফেলেছি?

কোন হোটেল? চল, আমি দেখছি।

রাহুলদা হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কী সব কথা বললেন, অমনি সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, আমাকে আর টাকা দিতে হল না। একটা গাড়ি ডাকিয়ে সুটকেসটা তুলে রাহুলদা বললেন, আয় আমার সঙ্গে।

রাহুলদা কোয়ার্টার পেয়েছেন চমৎকার। একতলা একটি বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনে-পেছনে বাগান। বড় বড় চারখানা ঘর। রাহুলদার বদলির চাকরি বলে ছেলেমেয়েরা বরাবর হোস্টেলে থাকে। ছেলে শিবপুরে, মেয়ে শান্তিনিকেতনে। বাড়িতে শুধু স্বামী স্ত্রী থাকবার কথা, কিন্তু আর একজন আছে। রাহুলদার স্ত্রীর ছোটবোন যশোধারা। মাস দেড়েক হল সে এখানে এসে আছে। রাহুলদার স্ত্রীর হাঁপানি আছে, মাঝে মাঝে একদম শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এখন সেই রকম অবস্থা।

যশোধারার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েই রাহুলদা বললেন, শোন সুনীল; এর সঙ্গে কিন্তু প্রেম ট্রেম করার চেষ্টা করিস না। এর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আর একুশ দিন পরেই ওর বিয়ে।

যশোধারা ভুরু কুঁচকে রাহুলদাকে ছোট্ট বকুনি দিল।

রাহুলদার এইরকম আলগা রসিকতা করার অভ্যেস বরাবরই। আমি বললাম, তোমার সাবধান করে দেবার দরকার ছিল না। তোমার সুন্দরী শ্যালিকা, তার সঙ্গে কি আমি প্রেম করার সাহস দেখাতে পারি? তুমি থাকতে!

রাহুলদা হা-হা করে হেসে উঠলেন, বৌদি উঠে এসে একটা বেতের চেয়ারে বসেছেন বারান্দায়। তাঁর সামনেই বললেন, সত্যি নিজের বউ অসুস্থ, শয্যাশায়ী, এই সময় সুন্দরী শ্যালিকার সঙ্গে প্রেম করাই উচিত ছিল আমার? ঠিক গল্পে এরকম হয়। রবীন্দ্রনাথের কী একটা উপন্যাস আছে না এরকম।

বৌদি ক্ষীণ ভাবে হেসে বললেন, তা একটু করে নিলেই পারতে। খুকু

আপত্তি করত না।

রাহুলদা বললেন, করতাম। কিন্তু মুশকিল হল কী জান? ঐ যে বিয়ে ঠিক করে ফেলল! কুমারী মেয়ের সঙ্গেও প্রেম করা যায়, বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গেও প্রেম করা যায়। কিন্তু যে-মেয়ের আর মাত্র মাস খানেকের মধ্যেই বিয়ে হবে, নিজেই সে বিয়ে ঠিক করেছে, যে মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে নেই। সেটা আন-এথিক্যাল।

যশোধারা বলল, রাহুলদা, আপনারা বুঝি কোন মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ে যাবার কথা কথা ভাবেন? সেই মেয়েটি রাজী হবে কিনা, সে কথা ভাবেন না? প্রেমে পড়া ছাড়া আর বুঝি কোন কাজ নেই মেয়েদের?

রাহুলদা বললেন, যতই কাজ থাক, তা বলে কি প্রেমটা বাদ দিলে চলে? এই যে সুনীলকে দেখছ এ যে কত মেয়ের সঙ্গে—

আমি বললাম, রাহুলদা, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি বেকার। বেকারকে কোন মেয়েই পাত্তা দেয় না।

বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা জমানো গেল। আমি মাত্র তিনদিন থাকব জেনে ওরা সবাই বেশ আফসোস করতে লাগল। রাহুলদা বললেন, তুই যদি আর কয়েকদিন আগে আসতিস! আমার অফিসের গাড়িতে আমি যশোধারাকে অজন্তা আর ইলোরা সব ঘুরিয়ে দেখালাম। তখন এলে একসঙ্গে হয়ে যেত।

আমি বললাম, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি টুরিস্ট বাসের টিকিট কেটে এনেছি।

রাহুলদা বললেন, অবশ্য ওরা ভালোই দেখায়। অনেকটা সময় দেয়। দু' জায়গা ঘুরতে তোর দু'দিন পুরো লেগে যাবে।

যশোধারা জিজ্ঞেস করল, আপনি ঔরঙ্গাবাদ কেভ্‌স দেখতে যাবেন না?

আমি অবাক হয়ে বললাম, এখানেও কেভ্‌স আছে নাকি? জানতাম না তো।

রাহুলদা বললেন, এখান থেকে খুব কাছেই, পাঁচ সাত মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর কেভ্‌স আছে, অজন্তার মতনই, তার দেয়ালে ছবি আঁকা। অনেকেই এর খবর রাখে না।

যশোধারা বলল, খুব সুন্দর কিন্তু।…কয়েকটা ছবি…আমার খুব ভাল লেগেছে, বিশেষ করে সেই নর্তকী…

রাহুলদা বললেন, ঔরঙ্গাবাদের কেভ্‌স আমরা আজ বিকেলেই সুনীলকে দেখিয়ে আনতে পারি। ঘণ্টার দুয়েক লাগবে। আমি অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি চলে আসব।

সেই রকমই ঠিক হয়ে রইল। রাহুলদা অফিসে চলে গেলেন। আমি খেয়ে দেয়ে একটা ঘুম দিলাম।

চারটের সময় রাহুলদার অফিস থেকে গাড়ি এল। কিন্তু রাহুলদা এলেন না। ড্রাইভারের হাতে দু'খানা চিঠি; একটা আমার জন্য, একটা যশোধারার। আমার চিঠিতে রাহুলদা লিখেছেন, উনি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারছেন না, বম্বে থেকে কয়েকজন অফিসার এসেছেন, তাই একটু বেশীক্ষণ থাকতে হবে, ফিরতে ফিরতে ছ'টা হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে গেলে আর ঐ গুহা-চিত্র দেখতে গিয়ে লাভ নেই। সুতরাং আমি যেন তখুনি ঐ গাড়িতে বেরিয়ে পড়ি।

যশোধারা তার নিজের চিঠিটা পড়ে বলল, একলা একলা আপনার যেতে ভাল লাগবে না। রাহুলদা লিখেছেন আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে।

আমি ভদ্রতা দেখিয়ে বললাম, আপনি তো ক'দিন আগেই ঘুরে এসেছেন, আবার যাবেন কেন? আমি একলাই দেখতে পারব।

যশোধারা বললেন, ওসব জিনিস বার বার দেখা যায়। আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

বেরুতে বেরুতে আরও আধঘণ্টা সময় লেগে গেল। তারই মধ্যে আকাশে ঘনিয়ে এল মেঘ। একটু বাদেই আলো রকম আসবে।

যশোধারা নিজের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বলল, ইস, দেরি করে ফেললাম। চলুন, চলুন, এরপর আর ভালো করে দেখা যাবে না।

ড্রাইভার লম্বা সেলাম করে আমাদের দরজা খুলে দিল। আমরা উঠে বসলাম। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামল।

প্রথম পাঁচ মিনিট আমরা কোন কথা বললাম না। তাতে আমার নিজেরই খুব অস্বস্তি লাগল। যশোধারা নিজের ইচ্ছেতেই যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

আমি বললাম, আপনি এখানে আর ক'দিন থাকবেন?

যশোধারা বলল, আর দিন সাতেক। দিদির শরীরটা একটু ভাল হলে দিদিকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে যাব।

আমি হেসে বললাম, বিয়ের জন্য কেনা-কাটা তো করতে হবে। তার জন্য মাত্র এই ক'টা দিন সময়?

আজকালকার মেয়েরা বিয়ের কথায় লজ্জা পায় না। যশোধারা অম্লান মুখে বলল, সে সব হয়ে গেছে।

আপনার বিয়ে হবে কোথায় ? কলকাতায় ?

আমাকে চমকে দিয়ে বলল, না, বিলেতে।

বিলেতে ?

হ্যাঁ। ও, মানে কৌশিক, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তাঁর আসবার কথা ছিল কিন্তু এই মাসেই ও চাকরি বদলাচ্ছে। নতুন চাকরিতে এখন বেশ কিছুদিন ছুটি পাওয়া যাবে না, তাই আমিই চলে যাব ওখানে।

দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। বিয়ের কনে যাবে বরের কাছে। একা একা ?

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গে কেউ যাবে ?

না।

আপনার বাবা-মায়ের কষ্ট হবে না ? আপনার বিয়ের সময় কেউ উপস্থিত থাকবেন না।

আমার বাবা থাকেন স্বর্গে। তিনি এমনিতেই উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

ও!

গাড়িটা যাচ্ছে খুব জোরে। সামনে দেখা যাচ্ছে পাহাড়। হঠাৎ বেশ জোরে একটা শব্দ হল গাড়ির নীচ থেকে, তারপরই সেটা টালমাটাল হয়ে গড়াতে লাগল বিপজ্জনক ভাবে। মনে হল, গাড়িটা যে-কোন সময় রাস্তার ধার দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবে।

আমার নিজের জন্য কোন চিন্তা হল না। কিন্তু ভাবলাম যদি যশোধারার কিছু হয় ? যদি কোন আঘাত লাগে ? আর ক'দিন পরই তার বিয়ে, তার জন্য বিলেতে একজন প্রতীক্ষা করে আছে। দরকার হলে আমার জীবন দিয়েও ওকে বাঁচাব।

গাড়িটা থেমে গেল রাস্তার এক পাশে।

কী হল ?

ড্রাইভারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে কোন উত্তর না দিয়ে নেমে গেল।

আমিও নেমে পড়লাম। ড্রাইভার উঁকি মারল গাড়ির নীচে। একটু বাদে সে উঠে দাঁড়িয়ে বিবর্ণ মুখ করে বলল, আমরা খুব জোর বেঁচে গেছি।

গাড়ির অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।

এই রে!

যশোধারা মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

আমি বললাম, আমাদের লাক্ খারাপ। অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।

গাড়িটার চেহারা বেশ চকচকে। নতুনের মতন। কিন্তু এই সব দিশী গাড়ি কখন যে খারাপ হবে, তার কোন ঠিক নেই।

যশোধারা নেমে এসে বলল, গাড়িটা ঠিক করতে কতক্ষণ লাগবে?

ড্রাইভারের বদলে আমিই উত্তর দিলাম, লোক ডেকে আনতে হবে। আজ তো হবেই না—

যশোধারা কিন্তু একটুও ঘাবড়ালনা সে বলল, আর বেশী নয়, ঐ তো সামনেই দেখা যাচ্ছে, বড়জোর এক মাইল হবে, চলুন হেঁটেই যাই।

হেঁটে যাব? তারপর ফিরব কী করে?

সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে কিছু। ওখানে নিশ্চয়ই অন্য লোকদের গাড়ি কিংবা ট্যাক্সি থাকবে। কারুর কাছে লিফ্‌ট চাইলেই হবে।

যশোধারা নিজে দেখেছে ঐ গুহা-চিত্র। তবু আমাকে দেখাবার জন্য ও হেঁটে যেতে চাইছে। মনে মনে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।

কিন্তু বেশীক্ষণ হাঁটা গেল না। বৃষ্টিটা একটু থেমেছিল, আবার হঠাৎ এসে পড়ল হুড়মুড় করে। এমন জোরালো বৃষ্টি যে কিছু চিন্তা করারও সময় দিল না।

কাছাকাছি আশ্রয় নেবার মতন কোন জায়গা নেই। এদিকে বাড়ি-ঘর নেই একটাও। খানিকটা দূরে একটা একটা গুলমোর গাছ রয়েছে।

যশোধারাকে বললাম, চলুন ঐ গাছটার নীচে দাঁড়াই।

আমি বলতে না বলতেই যশোধারা ছুটতে শুরু করেছে। শাড়ি পরেও ও বেশ ভাল দৌড়োতে পারে।

কিন্তু গাছতলায় পেঁছিবার আগেই আমরা দু'জনে বেশ ভিজে গেলাম। গাছতলায় দাঁড়িয়ে যশোধারা আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

আমি বললাম, ইস, শুধু শুধু আমার জন্য আপনি এলেন, আর এই রকম ভিজতে হল!

যশোধারা হেসে বলল, একটু ভিজলে কী হয়েছে? বেশ একটা অ্যাড-ভেঞ্চার হল আজ।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়ো বাতাস। শুকনো পাতা আর ফুল ঝরে পড়ছে গাছটা থেকে। একটু বাদেই গাছটা আর আমাদের আশ্রয় দিতে পারল না। গাছের পাতা চুঁইয়ে বৃষ্টির চেয়েও জোরে জল পড়তে লাগল আমাদের ওপরে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া উপায় নেই। আমরা আমাদের গাড়িতে ফিরে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারতাম। কিন্তু গাড়িটা থেকে প্রায় আধমাইল দূরে চলে এসেছি। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এতখানি রাস্তা হেঁটে যাওয়াও সহজ নয়।

আধঘণ্টার মধ্যেও বৃষ্টি থামল না একটুও। দুজনেই ভিজে চুপচুপে। যশোধারা একটুও ঘাবড়ায় নি। সে বেশ হাসিমুখেই বলল, আপনার আর ঔরঙ্গাবাদ কেভ্‌স দেখা হল না। এরপর একদম অন্ধকার হয়ে যাবে।

ভিজে শাড়িতে যশোধারার সুন্দর শরীরের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাকে দেখাচ্ছে কোন শিল্পীর গড়া মূর্তির মতন কিংবা হেমেন মজুমদারের আঁকা ছবি। আমি দু-একবার গোপনে ওর দিকে তাকাতে লাগলাম।

ঠিক গল্পের মতন রোমাণ্টিক পরিবেশ। ফাঁকা রাস্তায় একঠি মাত্র গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা দুজনে। বৃষ্টিতে ভিজছি। একটু একটু শীত করছে। এই সময় যশোধারার গলা জড়িয়ে ধরে…

না, না, একুশ দিন পরে যে-মেয়ের বিয়ে হবে, তার সঙ্গে প্রেম করতে নেই। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু তার দিকে মাঝে মাঝে তাকানোও কি অপরাধ? সুন্দর কোন দৃশ্য দেখায় তো পাপ নেই। তাই যশোধারাকে আমি চোখ ভরে দেখতে লাগলাম।

খানিকটা পরে উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে পর পর দুটো গাড়ি এল। আমরা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওদের থামতে বললাম। যশোধারা একটা গাড়ির একেবারে সামনে এগিয়ে গেল।

দুটো গাড়িতেই লোক ভর্তি ছিল। তবু কোনরকমে জায়গা হয়ে গেল। আমরা গাড়িতে ওঠবার পর একজন লোক ইংরাজিতে বলল, আপনার স্ত্রী গাড়িটার দিকে অমন বিপজ্জনক ভাবে ছুটে আসছিলেন…বৃষ্টির সময় একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যেতে পারত…

যশোধারাও শুনেছে কথাটা। সে মুচকি হাসল। আমি আর প্রতিবাদ

করবার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

এর পরের দু'দিন আর একটুও সময় পেলাম না আমি। অজন্তা ইলোরা দেখায় কেটে গেল। তারপর রাত্তিরের বাসে চেপে বম্বে। ঔরঙ্গাবাদ কেভ্‌স আর দেখা হয় নি।

কিছুদিন আগে একটি ইতিহাসের বইতে ছবি দেখছিলাম সেই কেভ্‌সের। সেই বিখ্যাত নর্তকী। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অত কাছে গিয়েও দেখা হয় নি। আর কি কোন দিন দেখা হবে?

ঔরঙ্গাবাদ কেভ্‌সের নর্তকীকে আমি দেখি নি। তার বদলে দেখেছিলাম এক জীবন্ত ছবি। সেই গুলমোর গাছের নীচে, বৃষ্টির মধ্যে, যশোধারার সুঠাম শরীর, হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। যশোধারা এখন বিলেতে, তার সঙ্গে হয়তো জীবনে আর কখনো দেখা হবে না। কিন্তু তার বৃষ্টি-ভেজা ছবিটি বহুদিন বাঁধানো থাকবে আমার বুকের মধ্যে।

তাঁর পুত্র

গেটের কাছে অনেকক্ষণ ধরেই ঘুরঘুর করছিল ছেলেটি। এক সময় সাহস করে কলিংবেল বাজালো।

দরজা খুলল একজন পৌঢ় লোক, কোন কিছু জিজ্ঞেস না করে প্রশ্নসূচক চোখে চাইল ছেলেটির দিকে। ছেলেটির বয়েস একুশ কি বাইশ, প্যাণ্ট ও শার্ট পড়েছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় ও দুটোই তার নিজস্ব নয়, প্যাণ্টটা বেশ বড় ও ঢলঢলে, শার্টটা খুবই ছোট। বুট জুতো পড়েছে, তবে জুতোর ওপর দিকটা ফাটা ফাটা।

ছেলেটি সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, গগনবাবু কি বাড়ি আছেন?

আছেন।

একটু দেখা করতে পারি?

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি ছেলেটির আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিয়ে বলল, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

আমি? আমি বৌবাজারে থাকি।

বিশেষ কোন দরকার আছে? উনি এই সময়টা ব্যস্ত থাকেন।

আমি, মানে, গগনবাবুর চেনা একজনের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি—ওনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

ঠিক আছে, এস।

ছোট বারান্দা পেরিয়ে বসবার ঘর, সেখানে ঢুকতে গিয়ে ছেলেটি জুতো খুলতে যাচ্ছিল, প্রৌঢ়টি বলল, জুতো খুলতে হবে না, ঠিক আছে।

ভেতরে সোফা-কৌচ সাজানো। ছেলেটি বসল অত্যন্ত সন্তর্পণে। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে বিদেশের কোন কুসুম-উদ্যানের অপরূপ দৃশ্য। অন্যদিকেয় দেয়ালে একটা চিত্রিত মুখোশ।

চটি ফটফটিয়ে এলেন গগনেন্দ্রনাথ, ষাটের কাছাকাছি বয়েস, স্বাস্থ্য এখনও ভাল আছে, তবে মাথার চুল সব সাদা। হাতে একখানা ইংরেজি বই, সেই বইটা খোলা অবস্থাতেই ধরা রইল, গগনেন্দ্র ভুরু কুঁচকে তাকালেন ছেলেটির দিকে। এই ভুরু কোচকানো কোন বিরক্তির চিহ্ন নয়, চশমা না

থাকলে তিনি এই ভাবেই তাকান।

ছেলেটি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টেবিলে একটা ধাক্কা খেল। বেশ লেগেছে, কিন্তু ব্যথার জায়গায় হাত বুলোবারও সুযোগ পেল না, তাড়াতাড়ি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গগনেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে। গগনেন্দ্রনাথ আঁতকে উঠে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। দেশের আবহাওয়া এমনই বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল যে কোন অচেনা যুবককে কাছে এগিয়ে আসতে দেখলেই মানুষ ভয় পেত। এখানে ব্যাপারটা সে রকম নয়। ছেলেটি প্রণাম করতে গিয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে, অতি ব্যস্ততার জন্য তার ভঙ্গিটি স্বাভাবিক হয়নি।

গগনেন্দ্রনাথ ব্যাপাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে বললেন, আরে, হয়েছে, হয়েছে! বস, বস।

ছেলেটি তবু দাঁড়িয়েই রইল।

গগনেন্দ্র নিজে বসে তারপর হুকুম করলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস। কি ব্যাপার ?

ছেলেটি বসে পড়ে, মাথা নিচু করে নোখ খুঁটছে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। গগনেন্দ্রনাথের বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে ছেলেটি খুবই ছোট হয়ে গেছে।

গগনেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার ?

সত্যকাম দত্ত।

কোথায় থাক ?

বৌবাজারে।

আমার কাছে কি জন্য এসেছ।

ছেলেটি আবার ইতস্তত করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি এবার পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছি। আমার ইচ্ছে আছে, পাশ করে ডাক্তারি পড়ব।

তা বেশ তো!

আমি খুব ছোটবেলা থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, আমি বড় হয়ে ডাক্তারি পড়ব।

ডাক্তারিতে আজকাল ভর্তি হওয়াই তো খুব শক্ত। ভালো রেজাল্ট না করতে পারলে তো সুবিধে হবে না!

আমার আশা আছে, আমার রেজাল্ট ভালোই হবে। আরও একটু ভালো হত, যদি পরীক্ষার আগেই আমার টাইফয়েড না হত। সেইজন্যই

বোধহয় স্কলারশীপ পাব না—

তুমি ম্যাট্রিকে কোন ডিভিসানে গিয়েছিলে।

ম্যাট্রিক তো নয়, স্কুল ফাইন্যাল। তাতে স্কলারশীপ পেয়েছিলাম—তা না হলে তো আমার পড়াশুনোই হত না।

হুঁ, বেশ।

সেইজন্যই ভাবছি, এবার যদি স্কলারশীপ না পাই, তাহলে ডাক্তারি পড়ব কি করে?

গগনেন্দ্রনাথ মনে মনে শঙ্কিত হলেন, এ তো মনে হচ্ছে সাহায্য চাইবার আবেদন।

গগনেন্দ্রনাথ হাতের বইখানার দিকে মনোযোগ দিলেন। দু এক লাইন পড়ে ফেলে চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি করতে পারি, বল তো?

আপনি আমাকে একটা থাকার জায়গা দেবেন?

কেন তোমার থাকার জায়াগা নেই? বৌবাজারে এখন কোথায় থাকো?

একটা মেসে। সেখানে তিরিশ-বত্রিশজন থাকে। আমার কাছ থেকে পয়সা অনেক কম নেয়। কিন্তু ওখানে পড়াশুনো করা যায় না। খুব হৈ চৈ হয়। ওখানে থাকলে আমার ডাক্তারি পড়া অসম্ভব; তা ছাড়া স্কলারশীপ না পেলে ঐ খরচই বা চালাব কি করে?

ধর, তুমি যদি একটা থাকার জায়গা পেয়েও যাও, তারপর পড়ার খরচ চালাবে কি করে? ডাক্তারি পড়ার খরচ তো কম নয়!

সে আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। ডাক্তারি আমাকে পড়তেই হবে। আমাদের মেসের এক ভদ্রলোক আমাকে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু আমি চাকরি করব না, পড়ব।

তোমার বাবা কি করেন? তোমার বাড়ির লোকজন কোথায় থাকেন?

আমার বাড়ির লোকজন কেউ নেই।

হুঁ! দ্যাখো, তোমার পড়াশুনোর দিকে এত উৎসাহ, তোমাকে দেখে আমার ভালোই লাগছে। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশীই হতাম। কিন্তু ভাই আমার বাড়িতে তো তোমাকে রাখতে পারছি না। আমার বাড়িতে জায়গা তো নেই! বাড়ি-ভর্তি লোকজন, আমার বড় ছেলের বিয়ে হল গত মাসে।

যে-কোন একটা ছোটখাটো ঘর, ছাদে কিংবা সিঁড়ির নিচে, আমি যাতে একটু পড়াশুনো করতে পারি।

সে রকম জায়গাও নেই। তাছাড়া আর একটা কথা তোমাকে খোলাখুলিই বলছি-তোমাকে তো ভাই আমি চিনি না শুনি না—একজন অজ্ঞাত কুলশীলকে তো বাড়িতে জায়গা দেওয়া যায় না!

ছেলেটি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। গগনেন্দ্রর প্রখর চোখের দিকে তাকিয়ে বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারল না। হাঁটু দুটোকে জোড়া করে আবার ফাঁক করলে। সোফার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেলান দিয়ে বলল, আমি আপনার খুব অচেনা নই। আমার মায়ের নাম মমতা।

ছেলেটি খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল বলেই বোধহয় গগনেন্দ্র ঠিক শুনতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মায়ের কি নাম বললে? আমি চিনি?

আমার মায়ের নাম মমতা।

মমতা? মমতা কি? তোমার বাবার নাম কি?

ছেলেটি আরও আস্তে আস্তে তখন খুব ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, আমার বাবাকে আমি কখনো দেখি নি। আমার মা বলেছিলেন, আমার বাবার নাম গগনেন্দ্রনাথ দত্ত।

গগনেন্দ্র আমূল চমকে উঠলেন। প্রায় চিৎকার করে বললেন, মমতা? মিথ্যে কথা বলেছে। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। মমতা কোথায়? সে তো বেনারসে—

বেনারসেই আমার জন্ম।

এখন সে কোথায়?

মা মারা গেছেন।

গগনেন্দ্র নির্বাক ভাবে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। ছেলেটির মুখে মমতার মুখের আদল আছে। কুড়ি-বাইশ বছর আগে মমতাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কাশীতে। অবনী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে অবনী বলেছিলে, মমতা এক ধনী মাড়োয়ারীর নজরে পড়েছে, তখন তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

বিধবা হবার পর মমতাকে গগনেন্দ্র আর অবনী একটা বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিল রামবাগানে। মমতার শরীরে তখন রূপের আগুন, আত্মীয়-

স্বজনহারা নিরাশ্রয় সেই মেয়েটিকে অন্যরা ছিঁড়েখুঁড়ে খেতই—গগনেন্দ্র আর অবনী সে সুযোগ দেন নি, তাঁরা দুজনে মিলেই ভাগ করে নিয়েছিলেন। তখন তাদের দুজনেরই মধ্য-যৌবন, ভোগ-বাসনা তখন খুব তীব্র হয়, কয়েকটা মাস খুব মাতামাতি করে কেটেছিল। অবনী আর গগনেন্দ্র দুজনেই বিবাহিত, বাড়িতে ছেলেপুলে আছে—সুতরাং ব্যাপারটা চালাতে হয়েছিল অতিশয় গোপনে।

কিছুদিন বেশ ভালই কাটছিল, কিন্তু গণ্ডগোল লাগল অন্যদিক থেকে। মমতাকে যে পাড়ায় ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছিল, সে পাড়ার কয়েকজন মাস্তান ছেলের নজর পড়েছিল মমতার দিকে। তারা পিছনে লাগল। সে পাড়া থেকে উঠে গিয়েও নিস্তার পাওয়া গেল না—ছেলেগুলো ঠিক গন্ধ শুঁকে শুঁকে এল এবং হামলা করতে লাগল। ব্যাপারটা এমনই যে এ-জন্য পুলিশে খবর দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে অবনী আর গগনেন্দ্র মমতার কাছে গেলে সাংঘাতিক একটা কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। মমতার বাড়ির সামনে মাস্তান ছেলেগুলো চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়, তারা ওদের দেখলেই হৈ-চৈ বাধিয়ে পাড়ার সব লোক জড় করবে।

সবচেয়ে বড় ভয়, পারিবারিক ভাবে জানাজানি হয়ে যাবার ভয়। গগনেন্দ্র একবার ভেবেছিলেন, তিনি বেমালুম কেটে পড়বেন। অবনীরও তখন সেই রকম মনোভাব। কিন্তু মমতাকে একেবারে এ সব নেকড়েদের মধ্যে ছেড়ে দেবারও বিপদ আছে। পুরোপুরি বেশ্যা হবার মতন বুদ্ধি নেই তার, সে নরম স্বভাবের মেয়ে। যদি পুলিশে ধরা পড়ে আর কান্নাকাটি করে সব বলে দেয়—তাহলেই গগনেন্দ্র আর অবনীর নাম জড়িয়ে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত ও'রা ঠিক করলেন, মমতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়ার। আর কোন উপায়ান্তর নেই। অবনীই সেই ভার নিয়েছিল। বেনারসই বাঙালী বিধবাদের আদর্শ জায়গায়। গগনেন্দ্র বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, অবনী বেনারসে গিয়ে আরও কিছুদিন ফুর্তি লুটবে। সুতরাং অবনীরই বেশী টাকা দেওয়া উচিত।

সে-সব কতকাল আগের কথা। কুড়ি-বাইশ বছর পেরিয়ে গেছে। রক্তের জোর কমে যাওয়ায় ও সব এখন অতীতের দুঃস্বপ্ন। অবনী মারা গেছেন গত বছর, হঠাৎ হার্ট স্ট্রোকে একদিনেই শেষ। গগনেন্দ্র খাওয়া-দাওয়ার

ব্যাপারে সাবধানী, সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন আস্তে আস্তে, তাঁর মেজমেয়ের দুই সন্তান—নাতি নাতনীদের নিয়ে তিনি এখন পরিতৃপ্ত দাদু।

একটা কথা গগনেন্দ্রর স্পষ্ট মনে আছে, বেনারস যাবার সময় মমতা গর্ভবতী ছিল না। সে রকম কোন কথা সে জানায় নি ঘুণাক্ষরেও। সুতরাং তার পরেও যদি কিছু হয়ে থাকে, সে দায়িত্ব অবনীর কিংবা বারোভূতের। ওঃ, অবনীটা এত শয়তান, কোনদিন এসব কথা বলে নি। ভাবতে ভাবতে গগনেন্দ্রর ঘাম এসে গেল।

গগনেন্দ্র ছেলেটির দিকে তীব্র চোখে চাইলেন। এ ছেলেটা কি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে? এক পয়সাও দেবেন না তিনি, দেখা যাক ও কি করতে পারে। অতদিন আগেকার ব্যাপার, স্ক্যান্ডাল রটালেও কেউ বিশ্বাস করবে না। গগনেন্দ্র সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ, তার বিরুদ্ধে ঐটুকু একটা ছেলের মুখের কথার কি মূল্য আছে।

গগনেন্দ্র কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এতদিন বাদে তুমি আমার কাছে এসেছ কি মতলবে?

ছেলেটি লজ্জায় প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বলল, আমি আসতাম না। কিন্তু কলকাতা শহরে কে আমাকে থাকার জায়গা দেবে? টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আপনার ঠিকানা পেলাম—

টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে তো অনেক লোকেরই নাম-ঠিকানা থাকে। আমি তোমাকে জায়গা দিতে পারব না।

আমার মা বলেছিলেন, যদি কখনো কোন বিশেষ দরকার হয়, আপনার সঙ্গে দেখা করতে—এতদিন দেখা করি নি, আমার লজ্জা করত।

মমতা যে তোমার মা, এর কোন প্রমাণ আছে?

প্রমাণ? মানে, না তো। প্রমাণ কি থাকবে?

তোমার মা কবে মারা গেছেন?

তিনবছর সাড়ে তিন বছর আগে। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে থাকতাম।

তোমার মা আমার ছাড়া আর কারুর নাম বলেন নি?

না তো। মনে পড়ছে না।

তোমার মাকে আমি সামান্য চিনতাম। কিন্তু তার এসব কথা বলার মানে কি?

ছেলেটি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। মাথা নিচু করে বসে রইল। গগনেন্দ্র একবার ভাবলেন, কিছু টাকা দিয়ে ছেলেটিকে বিদায় করবেন। মনটা একটু নরম হয়ে এসেছিল। মমতা অবনীর আগেই মারা গেছে। তবুও সে অবনীর নাম বলে নি। লোহার কারবার করে অবনী শেষ দিকে ফুলে উঠেছিল। ব্ল্যাকমেল করতে হলে গগনেন্দ্রর চেয়ে অবনী অনেক বেশী শাঁসালো মক্কেল। তবুও মমতা গগনেন্দ্র নাম করেছে। গগনেন্দ্রর বরাবরই সন্দেহ ছিল, মমতা অবনীর চেয়ে তাঁকেই বেশী ভালবাসে। অবনীর চেহারা ছিল গরিলার মতন, মেয়েমানুষের ভালবাসার মূল্য দেবায় ক্ষমতা ছিল না তার।

গগনেন্দ্র এখন বৃদ্ধ, মমতা মারা গেছে—তবু যৌবন বয়েসের ভালবাসার স্মৃতি মনটা নরম করে দেয়। অবনী বেশী টাকাপয়সা খরচ করলেও মমতা যে অবনীর চেয়ে গগনেন্দ্রকেই বেশী ভালবাসত—এই তথ্যটা আবার জেনে অদ্ভুত ধরনের তৃপ্তি আসে। ছেলেটিকে কিছু টাকা সাহায্য করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আবার কঠোর হয়ে উঠলেন। নিজেকে সতর্ক করে দিয়ে ভাবলেন, একবার সাহায্য করলেই ছেলেটি লাই পেয়ে যাবে, বার বার আসবে। প্রথমবার সাহায্য করে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি থাকবে না। বাড়ির লোকেরা সন্দেহ করতে পারে। এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়। উঃ, এই শয়তানটা বলে কি না এ তাঁর ছেলে! এই বয়েসে এত বড় অপবাদ…যদি কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে…

গগনেন্দ্রর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, তোমার মা একটা বেশ্যা ছিল। বেশ্যার ছেলের আবার কোন বাবা থাকে? তোমার মায়ের এত সাহস যে সে আমার নাম জড়িয়ে দিতে চেয়েছে!

গগনেন্দ্র একথা বললেন না। ছেলেটি এতই বিনীত এবং এত ভদ্র ভাব করে আছে যে এর সামনে এর মায়ের কুৎসা গাওয়া চলে না। গগনেন্দ্রও এইটুকু অন্তত রুচি আছে যে, ছেলের সামনে তিনি মায়ের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না।

গগনেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বললেন, তোমার মা যাঁর কথা বলেছেন, সে নিশ্চয়ই অন্য লোক।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, তা হতে পারে।

এই নামে অনেক লোক থাকা সম্ভব। আছেও। টেলিফোন গাইডেই

দু'তিনজন আছে। তোমার মাকে আমি সে-রকম ভাবে চিনতাম না।

আমি শুধু একটু থাকার জায়গা চাইতে এসেছি। বাইরেই খেয়ে নিতাম, শুধু একটু পড়াশুনোর জন্য।

আমার বাড়িতে তা সম্ভব নয়।

কোন রকমেই সম্ভব নয় ?

গগনেন্দ্র অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললেন, না!

ছেলেটি চুপ করে রইল। গগনেন্দ্রর চোখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিল, তারপর বলল, ঠিক আছে, আমি তা হলে যাই ?

এসো।

ছেলেটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে আবার ফিরে এসে পায়ের ধুলো নিল গগনেন্দ্রর। গগনেন্দ্র কোন আশীর্বাদ করল না। ছেলেটি আবার বলল, আচ্ছা যাচ্ছি। গগনেন্দ্র উত্তর দিলেন না।

ছেলেটি চলে যাবার পর গগনেন্দ্র হাতের বইখানা ধপাস করে রেখে দিলেন টেবিলে। দোতলায় তাঁর নিজের ঘরে এসে আলমারি খুলে বার করলেন একটা ছবির অ্যালব্যাম। পাতা উল্টে উল্টে তাঁর চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর বয়েসের একটা ছবি বার করলেন। এই সময় মমতার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল। সে-সময় সত্যিই তিনি সুপুরুষ ছিলেন। সরকারী খাদ্য দপ্তরের বড়বাবু ছিলেন, হাতে বেশ উপরি দু'পয়সা আসত। অবনীর পয়সা আরও বেশী ছিল, তবু মমতা তাকে ভালবাসে নি। মমতা ভালবাসতেই চেয়েছিল, চেয়েছিল একটা আশ্রয়। সেই সময় তাকে থিয়েটারে নামাবার একটা প্রস্তাব হয়েছিল, মমতা তাতে রাজী হয়নি। তার সাধ ছিল কারুর সঙ্গে ঘর বেঁধে থাকার। সে সুখ তার জুটল না, সেটা তার কপালের দোষ।

কিন্তু ঐ ক'মাসের ভালবাসার জন্য একটা ছেলের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া! মমতার মনে মনে এত বিষ ছিল! কাশীতে গিয়ে কত কীর্তি করেছে, তা কে জানে! শেষ জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনে থাকত, তার আগের কথা কি কেউ জানে ?

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে গগনেন্দ্র চলে এলেন আরও গোড়ার দিকে। তাঁর একুশ বাইশ বছরের ছবি। গগনেন্দ্র দারুণ চমকে উঠলেন, একটু আগে যে ছেলেটি এসেছিল, ওর সঙ্গে তাঁর ঐ বয়েসের চেহারার দারুণ মিল! তবে কি ? না, না, হতেই পারে না! অসম্ভব! এ-রকম মিল

হঠাৎ হয়ে যেতেও পারে! কি ভাগ্যিস তাঁর বাড়ির আর কেউ ছেলেটিকে দেখেনি। শুধু বনমালী দেখেছে, সে কিছু বুঝবে না। তাঁর গিন্নী দেখলে নিশ্চয় কিছু সন্দেহ করত। মেয়েরা চেহারার মিল বেশী বুঝতে পারে। ছেলেটা কি আবার ফিরে আসবে? বনমালীকে বলে দিতে হবে, অচেনা কোন ছেলে-পুলে এলে কোনক্রমেই যেন বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না দেওয়া হয়। ছেলেটা বনমালীকে বলেছিল, ও একটা চিঠি এনেছে, কই চিঠি তো দেখাল না। কার চিঠি, মমতার? তবে কি? না, না, হতেই পারে না! মমতা বেনারস যাবার সময় কিছুই বলেনি!

অ্যালবামটা বন্ধ করে সন্তর্পণে রেখে দিলেন আলমারিতে। তারপর ইজিচেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে চোখ বুজলেন। সঙ্গে সঙ্গে গগনেন্দ্রর চোখে ভেসে উঠল একটি একুশ-বাইশ বছরের ছেলের চেহারা। ঐ ছেলেটির নয়, তাঁর নিজের। তাঁর প্রথম যৌবন বয়েস। বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েই গগনেন্দ্র খুব বিপদে পড়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর বাবা মারা যান। অনেকগুলো ভাই-বোন নিয়ে বিষম আর্থিক দুরবস্থা। বি. এ. পরীক্ষার ফি পর্যন্ত যোগাড় করতে পারেন নি, সাহায্য করার কেউ ছিল না। দূর সম্পর্কের এক কাকার কাছে গিয়েছিলেন পরীক্ষার ফিয়ের টাকাটা চাইতে—সেই স্বার্থপর কৃপণ কাকা মাত্র দুটো টাকা দিয়ে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে…

আজ এই ছেলেটিকেও ফিরিয়ে দিলেন গগনেন্দ্র। ছেলেটির পড়াশুনো করার আন্তরিক সাধ। শেষ পর্যন্ত বোধহয় ওর ডাক্তারি পড়া হবে না। কেরানীর চাকরিই নিতে হবে। গগনেন্দ্রর সামর্থ এবং ইচ্ছে থাকলেও ওকে সাহায্য করার উপায় নেই। এই বয়েসে আর বিপদের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। মমতা তাঁকে ভালবাসত, কিন্তু সেই ভালবাসার মূলে এত অশান্তি! ছেলেটি যদি মমতার নাম উচ্চারণ না করত, তা হলে কি তিনি তাকে সাহায্য করতে পারতেন? ছেলেটি পড়াশুনো করার জন্য একটু থাকার জায়গা চেয়েছিল—কিন্তু যে পুত্র পরিচয় দেয়, সে যদি সম্পূর্ণ বাড়ির অধিকার দাবি করে? ঐ ছেলেটি তা করেনি—

বৃদ্ধ গগনেন্দ্রর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে নেমে এল। তিনি যে দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেললেন, সেটি তাঁর যৌবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস।

ট্যাক্সিতে হেলান দিয়ে বসে সুরঞ্জন একটা বই পড়ছিল। বইটা এতই আকর্ষণীয় যে সারাদিন সে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে, একটু সময় পেলেই পড়ে নিচ্ছে কয়েক পাতা। এবং পড়তে শুরু করলেই গভীর মনোযোগ এসে যায়।

এখনও সে বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়ছিল, তবু হে কেন হঠাৎ চোখ তুলে জানালার বাইরে তাকাল—সে নিজেই জানে না। সম্ভবত পুলিসের হাতের সামনে ট্যাক্সিটা অনেকক্ষণ থেমে থাকায় একটু অস্বস্তি বোধ করছিল, কিংবা এমনিই মানুষের চোখ মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে যায়।

কাছেই বাস-স্টপে যে মেয়েটি পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখে মনে হয় টুলটুলের সঙ্গে বেশ মিল আছে, সেই রকমই লম্বা, মুখের পাশটাও একরকম।

এমন সময় পুলিসের হাত নামল, ট্যাক্সিটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সুরঞ্জন যে-বইটা পড়ছিল, সেটার কথা মাথার মধ্যে ঘুরছে, টুলটুলের মতন চেহারায় মেয়েটিকে দেখে টুলটুলের কথাও মনে পড়ল—এই দু'রকম ব্যাপার একসঙ্গে জট পাকিয়ে যাওয়ায় তার চিন্তা স্বচ্ছ হতে একটু দেরি লাগল।

ট্যাক্সিটা একটু দূরে এগিয়ে যাবার পর বিদ্যুৎচমকের মতন তার মনে হল যে মেয়েটিকে টুলটুলের মত দেখতে—সে যদি সত্যিই আসলে টুলটুল হয়?

সঙ্গে সঙ্গে সে ড্রাইভারকে বলল ট্যাক্সি ঘোরাতে। কিন্তু এসপ্লানেডে অত সহজে ট্যাক্সি ঘোরানো যায় না। ড্রাইভার সেই মর্মে বিরক্তিসূচক কোন মন্তব্য করায় সুরঞ্জন সেইখানেই ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল। তারপর দ্রুত হেঁটে ফিরে এল পেছন দিকে।

মেয়েটি এর মধ্যে বাসে উঠে চলে যেতে পারত, কিন্তু যায় নি। একটি লম্বা চুলওয়ালা খুব বুদ্ধিমান চেহারার যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। যুবকটির

ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে যখন-তখন এই গোটা পৃথিবীটাকে কিনে আবার বিক্রী করে দিতে পারে।

কাছাকাছি এগিয়ে সুরঞ্জন বুঝতে পারল, মেয়েটি সত্যিই টুলটুল নয়, তার ছোটবোন তাতা।

এমনিতে টুলটুল আর তাতার চেহারার কোন মিল নেই। পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হবে দুটি আলাদা চেহারা ও চরিত্রের মেয়ে। টুলটুলের মুখখানা গোল ধাঁচের, তাতার মুখখানা লম্বাটে। কিন্তু এক মায়ের পেটের ভাইবোনদের চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল থেকে যায়—কোন একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে হঠাৎ একরকম মনে হয়। ট্যাক্সির জানালা থেকে সুরঞ্জন যে মিলটা খুঁজে পেয়েছিল, এখন আর সেটা পাচ্ছে না।

এগিয়ে গিয়ে তাতার সঙ্গে কথা বলতে তার লজ্জা করে। তাতার সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছে। তাতার বন্ধুটি হাত-পা নেড়ে এমন ভাবে কথা বলছে যেন দুনিয়ার কারুকেই সে গ্রাহ্য করে না। ছেলেটি নিশ্চয়ই বেকার —তাই ওর চোখের সামনে এখনো অনেক স্বপ্ন আছে।

সুরঞ্জন তাতার কাছ থেকে টুলটুলের খবরটা জেনে যেতে চায়। টুলটুল তার স্বামীর বাড়ি থেকে রাগ করে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, ফিরেছে কি? অবশ্য টুলটুলের ফেরা না-ফেরায় সুরঞ্জনের কিছু যায় আসে না। টুলটুল এখন অন্য জগতের মানুষ। তবু পুরো ঘটনাটা জানার জন্য সবারই কৌতূহল থাকে।

সুরঞ্জনের তো হাতে কোন কাজ নেই, সে তার হোটেলেই ফিরছিল— এখানে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ক্ষতি কি?

সুরঞ্জনকে অবাক করে দিয়ে তাতার ছেলে-বন্ধুটি হঠাৎ দৌড়ে একটা বাসে উঠে পড়ল। ভিড়ের বাসের পা-দানিতে একলাফে উঠে হ্যাণ্ডেল ধরে আর একটা হাত নেড়ে দিল তাতার দিকে। সুরঞ্জন ভেবেছিল, ঐ ছেলেটিই তাতাকে আগে বাসে তুলে দেবে, কিংবা একসঙ্গেই দুজনে যাবে। তাদের বাল্যকালে কোন ছেলে কোন মেয়েকে একলা ফেলে রেখে নিজে আগে বাসে ওঠার নিয়ম ছিল না। এখন নিয়ম-কানুন অনেক বদলে গেছে।

সুরঞ্জন কাছে এগিয়ে এসে বলল, তাতা, তুমি এখানে?

তাতা সুরঞ্জনকে দেখে চমকাল না, খুশী হল না, বিব্রতও বোধ করল না।

এত কম বয়েসেই তাতা এমন একটা রহস্যময় ব্যক্তিত্ব অর্জন করে ফেলেছে যে সুরঞ্জনের কাছে ওকে খুব অপরিচিত মনে হয়। শেষবার কলকাতায় সুরঞ্জন তাতাকে দেখে গিয়েছিল একটি বারো বছরের ছটফটে মেয়ে—যেমন সরল, তেমনি দুরন্ত। সে এখন অনেক বদলে গেছে।

তাতা বলল, ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছি। বাসে উঠব।

এদিক থেকে ?

এদিকে আমার এক বন্ধুকে হাওড়ার বাসে তুলে দেবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। এবার ওদিকে যাব।

টুলটুলের খবর কি ?

জানি না তো। এ ক'দিন আর অমিতদাদের বাড়িতে যাইনি।

ফিরে এসেছে কিনা তাও জান না ?

হ্যাঁ, তা জানি। ফেরেনি।

কি নিশ্চিন্তভাবে কথা বলে তাতা। তার নিজের দিদি সম্পর্কেও একটুও চিন্তা নেই—এইটাই কি আজকালকার নিয়ম ? বাবার অমতে বিয়ে করেছিল বলে টুলটুল আর বাপের বাড়িতে আসে না। এদিকে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে কোথায় চলে গেছে। দু বাড়ির মধ্যে যোগসূত্র শুধু তাতা—কিন্তু এ ব্যাপারে সে যেন মাথাই ঘামাতে চায় না। তার দিদি নিরুদ্দেশ—অথচ সে এখানে তার ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছিল।

আগের দিন যখন তাতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তাতা বলেছিল, ছোড়দি নিশ্চয়ই যা ভালো বুঝেছে, তাই করেছে। ছোড়দি তো আর ছেলেমানুষ নয়।

কিন্তু মেয়েদের যা খুশী করার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা বিপদের আশঙ্কাও থাকে, তা কি ও বোঝে না ?

সুরঞ্জন বলল, তাতা, তোমাকে কি এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে হবে ? কোথাও বসে একটু চা খেতাম।

তাতা একটুক্ষণ দ্বিধা করে। তারপর বলে, আচ্ছা চলুন।

স্পষ্টই বোঝা যায়, তাতার ইচ্ছে নেই। নিছক ভদ্রতার জন্যই সে প্রত্যাখ্যান করল না। এ ব্যাপারটা বুঝেও সুরঞ্জন তাতাকে ছাড়তে চাইল না। সন্ধ্যাবেলাটায় সে একেবারেই একা—কথা বলারও কেউ নেই।

কোন দোকানে যাওয়া যায় বল তো? পার্ক স্ট্রীটে যাবে?

কেন, এই তো সামনেই দোকান আছে একটা।

অর্থাৎ তাতা ব্যাপারটা সংক্ষেপে সেরে ফেলতে চায়। পার্ক স্ট্রীটে যেতেও তো সময় লাগবে। আর, পার্ক স্ট্রীটের কোন দোকানেই শুধু এক কাপ চা পাওয়া যায় না।

রাস্তা পেরিয়ে এসে ওরা একটা চায়ের দোকানে ঢুকল, বাইরে কিছু টেবিল রয়েছে এবং রয়েছে কয়েকটা পর্দা-ঢাকা ক্যাবিন। সুরঞ্জনের সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে বলেই বেয়ারারা একটা খালি ক্যাবিনের পর্দা তুলে ধরে বলল, আসুন, এখানে আসুন।

সুরঞ্জন একটু ইতস্তত করে তাতার মুখের দিকে তাকাল। তাতা বেশ সহজ ভাবেই বলল, বাইরেই বসি, ভেতরে বড্ড গরম।

সুরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাইরেই ভাল।

কোণের একটা ফাঁকা টেবিলে বসল দু'জনে। তাতা রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। তাতার বাইশ বছরের সুশ্রী মুখখানি ঝক ঝক করছে। সব সময়েই সে সপ্রতিভ। রেস্টুরেন্টে কোন মেয়ে এসে বসলেই অন্যরা তার দিকে চোরা চোখে তাকায়। তাতা সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপও করে না।

মেনু-কার্ডটা হাতে নিয়ে সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, তুমি চা খাবে, না ঠাণ্ডা কিছু নেবে? এখানে আইসক্রীমও পাওয়া যায়।

শুধু চা।

সঙ্গে আর কিছু?

না।

সুরঞ্জনের মনে পড়ল, বাচ্চা বয়েসে তাতা আইসক্রীম খেতে দারুণ ভালবাসতো। এখন কি সে কথা ওকে মনে করিয়ে দেওয়া যায়? আরও অনেক কিছুই মনে করিয়ে দেওয়া যায় না—যেমন, তাতার হাত দিয়ে টুলটুলকে একটা বই পাঠাবার সময় সুরঞ্জন তার মধ্যে একটা চিঠি ভরে দিয়েছিল। তাতা হঠাৎ বইটা খুলে চিঠিটা দেখেই বলেছিল, এটা কার চিঠি? সুরঞ্জন তো দারুণ লজ্জা পেয়েছিলই—ভয়ও পেয়েছিল, যদি অন্য কেউ শুনতে পায়। টুলটুলের সঙ্গে রোজ দেখা হলেও সুরঞ্জন তাকে মাঝে এ রকম ভাবে চিঠি পাঠাত, এর মধ্যে একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে।

সুরঞ্জনকে ভয় পেতে দেখেই তাতা আরও মজা পেয়ে গিয়েছিল। ছেলেমানুষী করে বলেছিল, কার চিঠি ? কার চিঠি ?

সুরঞ্জন যতই কাকুতি-মিনতি করেছে, তাতা তত বেশি জোরে জোরে বলেছে।

দশ বছরে অনেক কিছুই বদলে যায়। তাতার কি মনে আছে সে কথা ? এখন তার নির্লিপ্ত গম্ভীর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। এখন টুলটুলও এক আর্টিস্টকে বিয়ে করে অন্যরকম হয়ে গেছে।

সুরঞ্জন নিজেও যে অনেক বদলে গেছে—সেটা তার মনে নেই। সে তাতাকে দেখছে এখনো ছেলেমানুষী চোখ দিয়ে—তাতার যে-কোন ব্যবহার দেখেই তার তুলনা করতে ইচ্ছে করছে আগেকার দিনগুলোর সঙ্গে। কিন্তু তাতার জীবন এখন অন্যরকম—তার সঙ্গে আগেকার জীবনের কোন যোগ নেই।

সুরঞ্জন কি ভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছে না। তাতা নিজেই জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আরও কিছুদিন এখানে থাকবেন ?

সুরঞ্জন বহুদিন কলকাতা ছাড়া। অফিসের কাজে এখানে এসেছে।

তাতার প্রশ্ন শুনে তার মনে হল, সে তাড়াতাড়ি চলে গেলেই কি তাতা খুশী হয় ? হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছে কেন ?

অবশ্য এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। তার থাকা না-থাকায় তাতার কি আসে যায় ? তবু যারা এ রকম বড় শহরে একলা হোটেলে থাকে—তাদের মনের মধ্যে এরকম অভিমান জন্মাতেই পারে। বিশেষত, এককালে এই শহরে সুরঞ্জনের মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেক ছিল, প্রেম-ভালবাসাও ছিল। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সব ছিন্ন হয়ে গেছে। সে বলল, আমার কালকেই চলে যাবার কথা ছিল, অফিসের আর একটা কাজের জন্য আর দু'দিন থেকে যেতে হচ্ছে। শনিবার ঠিক চলে যাব—টিকিট কাটা হয়ে গেছে প্লেনের।

তাতা চুপ করে রইল।

সুরঞ্জন আবার বলল, যাবার আগে টুলটুলের খবরটা জেনে যেতে পারলে ভাল লাগত।

তাতা চ'য়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে বলল, আপনি ছোড়দির জন্য চিন্তা করবেন না।

চিন্তা করা আমার উচিত নয়। তবু মন মানে না। টুলটুল কি আগেও এরকম বাড়ি ছেড়ে গেছে?

না।

তবে? তোমাদের দুশ্চিন্তা হয় না?

ছোড়দি খুব শক্ত মেয়ে। ও নিজের ভাল-মন্দ বোঝে। টুলটুলের সঙ্গে সুরঞ্জন প্রায় শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত একসঙ্গে কাটিয়েছে। কত বই ওরা একসঙ্গে পড়েছে, কত স্বপ্ন-বিনিময় হয়েছে—সেই টুলটুল কি রকম মেয়ে, তা কি সুরঞ্জন জানবে না? তাতার কাছ থেকে শুনতে হবে? বোধহয় সুরঞ্জন সত্যিই তেমন ভাবে চেনে না টুলটুলকে। টুলটুল কারুকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে যাবে—এ কি সে ভাবতে পেরেছিল?

সুরঞ্জন তাতার চোখের দিকে চোখ চেয়ে জিজ্ঞেস করল, টুলটুল কোথায় আছে, তুমি সত্যি জান না?

জানলে বলব না কেন? অমিতদা সব জায়গায় খুঁজে দেখেছেন।

আশ্চর্য! কি যে হল! সেরকম কিছু ঝগড়াও তো হয়নি শুনেছি।

তাতা হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করল, ছোড়দি কোথায় থাকতে পারে, তা আপনিও সত্যি জানেন না?

সুরঞ্জন অবাক হয়ে বলল, আমি? আমি কি করে জানব?

তাহলে আপনি এতবার ছোড়দির কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? সুরঞ্জন একটু আহত বোধ করল। তাতার কথার মধ্যে একটা ঝাঁঝ ফুটে বেরুচ্ছে। এ রকম ভাবে সে কথা বলবে কেন? যাই হোক। তাতা ছেলেমানুষ, তার ওপর রাগ করা চলে না।

সুরঞ্জন পুরনো চোখ দিয়ে তাতাকে এখনো ছেলেমানুষ ভাবছে। কিন্তু তাতা যে এখন একজন যুবতী, তার অন্যরকম জীবন আছে, আলাদা অহংকার আছে—সেটা খেয়াল করছে না। সুরঞ্জন শান্ত গলায় বলল, তোমার ছোড়দির খোঁজখবর নেওয়া কি আমার পক্ষে অপরাধ?

আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা আপনার পক্ষে অপমানজনক?

কেন?

ছোড়দির সঙ্গে আপনার আগে খুব ভাব ছিল। এতদিন পর আবার আপনাদের দেখা হয়েছে। এখন ছোড়দি হঠাৎ তার স্বামীর কাছ থেকে চলে

গেলে সবাই ভাবতে পারে যে সে আপনার সঙ্গেই চলে গেছে কোথাও।

তুমি বিশ্বাস কর, সে আমাকে কিছুই বলে নি।

সেই কথাই তো বলছি। ছোড়দি আপনার সঙ্গে যায় নি, আপনাকেও কিছু বলে নি—তার মানে আপনার আর কোন মূল্যই নেই ছোড়দির কাছে।

সুরঞ্জনের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাতা একটা জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়। সুরঞ্জন ওদের আর কেউ না। টুলটুলও সুরঞ্জনকে কোন গোপন কথা বলারও যোগ্য বলে মনে করে না।

সুরঞ্জন টেবিলে দাগ কাটতে কাটতে বলল, তোমার ছোড়দি আমার সঙ্গে কোথাও যেতে চাইলেও আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতাম অমিতবাবুর কাছে। আমি তো তার জীবনের কোন ক্ষতি করতে আসি নি।

ছোড়দির জীবনটাই আজ অন্য রকম। আপনি তো অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন না।

সেই জন্যই আমি কিছু বুঝতে পারি না! কলকাতা শহর বাইরের লোককে কিছুতেই আর ভেতরে ঢুকতে দেয় না। চেনা মানুষরাও অচেনা হয়ে যায়। এই সময় অন্য টেবিল থেকে একটি ছেলে উঠে এসে তাতাকে বলল, এই প্রতীতি, তুমি কখন এসেছ? অরিন্দমের খবর শুনেছ তো? অরিন্দম দিল্লীতে।

ছেলেটি যে টেবিল থেকে উঠে এসেছে, সেই টেবিলে অনেক ছেলে-মেয়ে বসে আছে। ছেলেটি এখানে এসে একটা চেয়ার টেনে অবলীলাক্রমে বসে পড়ল এবং সুরঞ্জনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাতার সঙ্গে কথা বলতে লাগল অনর্গল।

তাতার ভাল নাম যে প্রতীতি, তা মনেই ছিল না সুরঞ্জনের।

ছেলেটি ঝড়ের বেগে কথা বলা একটু থামতেই তাতা বলল, আলাপ করিয়ে দিই, এর নাম সঞ্জয় মজুমদার—আমরা বি. এ. ক্লাসে একসঙ্গে পড়তাম। আর সঞ্জয়, ইনি হচ্ছেন—

তাতা একটু থামল, দু-এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, ইনি হচ্ছেন সুরঞ্জনদা, আমেদাবাদে থাকেন—

তাতা ঠিক কি পরিচয় দেবে বুঝতে পারছিল না। চায়ের দোকানে এক টেবিলে একটি পুরুষ আর নারী বসে থাকলে সকলেই প্রথমে ধরে নেয় ওরা

প্রেমিক-প্রেমিকা। সেই ভুল ভাঙাবার জন্য তাতা কি বলবে? একথা তো বলতে পারে না যে ইনি এক সময় আমার ছোড়দিকে ভালবাসতেন—এখন অবশ্য ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেছে, এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই—

সব ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক।' এটা বুঝতে পেরে সুরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেল।

সঞ্জয় বলল, আপনারা আমাদের টেবিলে আসুন না। আমরা অনেকে আছি।

কলেজের ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে আড্ডা দিতে বসে। ওদের একটা আলাদা জগৎ, আলাদা ধরনের কথাবার্তা, সেখানে সুরঞ্জন নিজেকে মানিয়ে নেবে কি করে? শুধু শুধু তাতাকে অস্বস্তিতে ফেলা হবে।

সে তক্ষুণি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাতা, তুমি ওদের সঙ্গে বস। আমাকে তো এখন চলে যেতে হবে—জরুরী কাজ আছে।

ওদের কোন বাধা দেবার সুযোগ না দিয়ে সুরঞ্জন বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

তারপর অনেকক্ষণ একা একা হেঁটে বেরাল রাস্তায় রাস্তায়। অন্ধকার ময়দানে। তার কোথাও যাবার জায়গা নেই। এত বড় শহরে এত মানুষ—তবু এর মধ্যেও সে নিঃসঙ্গ। তার পকেটে টাকা আছে—এত ঝলমলে দোকানপাট—সে অনায়াসেই যে-কোন একটাতে ঢুকে বসে থাকতে পারে—কিন্তু কোথাও একজনও আপনজন পাবে না। পুরান সম্পর্ক ধরে যাদের সে খুঁজতে গিয়েছিল—দেখা গেল, সম্পর্কের সূত্রগুলো এতদিনে ছিঁড়ে গেছে।

মনে হয় যে, সবাই যেন বদলে গেছে এর মধ্যে। তার নিজের বদলটাও সে মেনে নিতে পারে না। ছেলেবেলার চোখ দিয়ে সে যে কলকাতাকে খুঁজতে এসেছে—সেই কলকাতা আর কোথাও নেই। তার নিজের ছেলেবেলাটাও তো সে আর ফিরে পাবে না।

দূরদৃষ্টি

১

ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে উঠে কী করে যে সরস্বতী পুজো কমিটির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম কে জানে! কোন নির্বাচনের ভোটাভুটি হয়নি, এমনিই আট-দশজন ছাত্রের ওপর এসে পড়লো চাঁদা তোলা ও অন্য সব কিছু ব্যবস্থার ভার। সেই সময় থেকেই গা থেকে কৈশোরের গন্ধ মুছতে শুরু করে দিল, পা বাড়ালুম সাবালকত্বের দিকে। টাকা-পয়সার হিসেব রাখা, নিজের হাতে বিশ-পঞ্চাশ টাকার জিনিস কেনা, এসব অভিজ্ঞতা তো একেবারে নতুন। ইস্কুলে নিয়মিত ক্লাস চলছে, কিন্তু আমরা পুজো কমিটির মেম্বাররা কুমোরটুলিতে যাচ্ছি ঠাকুর অর্ডার দিতে, আমাদের পছন্দই চূড়ান্ত; ডেকরেটর, লরিওয়ালাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে আমাদেরই, এরই মাঝে মাঝে অবশ্য ক্লান্ত হয়ে আমরা চায়ের দোকানে কাটলেট খাচ্ছি।

সরস্বতী পুজো উপলক্ষেই প্রথম বাড়ির বাইরে রাত্রিবাসের অনুমতি পাওয়া যায়। পুজোর ঠিক আগের রাত্রিটিতে ঠাকুর পাহারা দেবার একটা ব্যাপার আছে। প্যাণ্ডেল একেবারে ফিটফাট, আলো টালো সব জ্বলছে, সেখানে অপরূপ রূপসী এক নারী মূর্তিকে ঘিরে কয়েকজন কিশোর। প্রথমবার এই রকম সরস্বতী পুজো প্যাণ্ডেলে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আমার এমন একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা আজও উজ্জ্বল ভাবে মনে আছে।

সরস্বতী ঠাকুর ভাসান হয়ে যাবার পর অধিকাংশ কমিটি মেম্বারের দু' তিন দিন গলা ভাঙা থাকে। ক্লাশ টেনের ছেলেদের আবার কিছুদিন পরেই ফাইন্যাল পরীক্ষা। এক মাস্টার মশাই শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন, ওরে, পুজোর সময় যতোই চ্যাঁচা, অ্যালজ্যাব্রা-জিয়োমেট্রি ভুল করলে সরস্বতী ঠাকরুণ ক্ষমা করবেন না!

ইস্কুলের সরস্বতী পুজোর অভিজ্ঞতাবলে পাড়ার বারোয়ারি সরস্বতী পুজোর দায়িত্বও এরপর স্বভাবতই আমরা পেয়ে যাই। পাড়ার সরস্বতী পুজোর ব্যবস্থাপনায় উত্তরাধিকারের ব্যাপার আছে। সদ্য-যুবকরাই এই দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করে। পাড়ার পুজোর একটা রোমাঞ্চ আছে, তাছাড়া

কয়েক দিনের জন্য অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে সেই সব যুবকদের যখন গোঁফ দাড়ি বেশ কড়া হয়ে যায়, ওদিকে চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে দিতে একটা কিছু জুটে যায়, তখন তারা সরস্বতী পুজো চালাবার ভার পরবর্তীদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়।

বারোয়ারি সরস্বতী পুজোগুলির আবার বংশবৃদ্ধির ওপর খুব প্রবণতা আছে। যে-পাড়ায় আগে দুটি পুজো ছিল, সে পাড়ায় এখন পাঁচটি প্যাণ্ডেল। মুখোমুখি মাইক। তারপর সে পাড়ায় যদি মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং ওঠে তাহলে সেখানেও আর একটি। জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীদের নিজস্ব সীমানা ভাগ করা আছে। কেউ অন্যের সীমানায় হানা দেয় না। কিন্তু এক পাড়ায় পাঁচটি বারোয়ারি পুজো হলে পাঁচটা দলই চাঁদার জ্য হানা দেয় সব বাড়িতে।

দুর্গাপুজোর কমিটি আবার একটু ভারিক্কি গোছের ব্যাপার। সেখানে ছেলে-ছোকরাদের স্থান নেই। পাঁচদিন ব্যাপী পুজো, অনেক খরচের ব্যাপার, সেই জন্যই পল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই ভার নেন। একজন শাঁসালো ব্যক্তিকে করতে হয় সভাপতি, যিনি প্রয়োজনে অন্তত পাঁচটি হাজার টাকা খসাতে রাজি হবেন। আজকাল তো আর জমিদার বা রায় বাহাদুরদের যুগ নেই। সেই জায়গা নিয়েছেন মালটি ন্যাশনাল কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটার বা কোনো সরকারি কন্ট্রাক্টর। পাড়ার মধ্যে এ রকম কারুকে পাওয়া গেলে তো ভালোই, নইলে কোনো মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতাদেরও ধরা যায়। এনারা নিজের পকেট থেকে এক পয়সা খরচ না করলেও বহু টাকা জোগাড় করে দিতে পারেন অনায়াসে। আমাদের ছেলেবেলায় বড় বড় বারোয়ারি দুর্গা পুজোগুলোতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ বোধহয় বিশেষ ছিল না। তবে এই সব পুজো কমিটির সেক্রেটারির পদ নিয়ে বেশ রেষারেষি ছিল। অন্তত সাতটি দিনের জন্য এই সেক্রেটারি মহোদয় একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁর কথায় সন্দেশও কর্পূর হয়ে যেতে পারে। মণ্ড সজ্জা, আলোক সজ্জার প্রতিযোগিতায় এই পাড়াটি অন্য সব বারোয়ারিকে কতখানি টেক্কা দিল, তার ওপরে নির্ভর করে সেক্রেটারির কৃতিত্ব। পুজোর পাঁচটা দিন জমজমাট রাখার জন্য 'কালচারাল ফ্যাংশন' 'গুণীদের সংবর্ধনা' ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করতে হয়। এই সব হ্যাপা সামলানো তো কম কথা নয়!

আমি কোনোদিন দুর্গাপুজোর কমিটিতে ওঠার মতন যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। তবে বাবা-কাকা শ্রেণীর গুরুজনদের হুকুমে ভলান্টিয়ারি করেছি, ফাই ফরমাস খেটেছি।

কিন্তু কালীপুজোর ব্যাপারটা কারা চালায় তা আমার জানা নেই। আমার চেনাশুনো কেউ কখনো কালী পুজোর কমিটিতে থাকেনি। এই হিসেবে তো মা দুর্গাও যা মা কালীও তা, দুজনেই শিব ঠাকুরের পত্নী, দু'জনেই যুদ্ধ পটিয়সী। তবু মা কালীই যে বিশেষ করে কেন ডাকাতদের প্রিয় কে জানে। বহু ডাকাত পুজিত কালীর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান আমরা শুনেছি। এখনো কি সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে? কলকাতার বেশ কয়েকটি বারোয়ারি কালী পুজোই এক একজন বিশেষ উদ্যোক্তার নামে পরিচিত। তারা ডাকাত সর্দার কিনা আমি জানি না, তবে তাঁদের নাম শুনলে অনেকেই ভয় পায়। কালীপুজোর চাঁদা আদায়ের ভাবের মধ্যেও খানিকটা ডাকাতি গন্ধ রয়ে গেছে। আদায়কারীরা এসে 'আপনি কত দিবেন' জিজ্ঞেস করে না, 'আপনাকে এত দিতে হবে' বলে দাবি জানায়। কালী পুজোর চাঁদা আদায় উপলক্ষে দু একটা খুনজখমের খবরও প্রায় শোনা যায়।

কলকাতার বড় বড় বাজারগুলিতে বারোয়ারি কালীপুজো হয়। আজকালকার দিনে দোকানদারদের সঙ্গে ডাকাতদের তুলনা দিতে অনেক মধ্যবিত্তই প্রলুব্ধ হবেন। এই সব বাজারে কিন্তু সরস্বতী পুজোও হয়।

আজকাল পারিবারিক পুজো প্রায় উঠেই যাচ্ছে। বারোয়ারি পুজোর উদ্যোক্তারা আশ্বিন থেকে ফাল্গুন এই কয়েকটা মাস অন্তত দেশটাকে উৎসবে জমজমাট করে রাখে। দেশ ভর্তি লক্ষ লক্ষ বেকার, তারা তবু মাঝে মাঝে আমোদ-ফুর্তি করতে পারে। চাঁদা তোলার নামে যে জোর-জুলুমের কথা সংবাদপত্রে ছাপা হয়, তার অনেকটাই বোধহয় অতিরঞ্জিত। এত বড় ব্যাপারে এই সব বিক্ষিপ্ত ঘটনা দু' পাঁচ জায়গায় হয়তো হয়। আমি এত বছর কলকাতায় আছি, কোনো দিন তো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়নি। শিক্ষিত এবং শক্ত সমর্থ ছেলেদেরও আমরা কোনো কাজ দিতে পারি না, বছরে কয়েকটা মাস এইসব উৎসবে একটু হাত খুলে চাঁদা দিলে নিজের বিবেকেও তো খানিকটা পুলটিস দেওয়া যায়।

২

পুজোর সময় সকলেই মনে মনে ছোটবেলায় ফিরে যায়। শৈশব ও কৈশোরের মুগ্ধতার ছবিতেই এখনো আমরা দুর্গাপুজোর মতন উৎসবকে উপভোগ করি।

পোশাকের দোকানগুলিতে প্রাক-পুজোর সাজ-সাজ রব উঠে গেলেই বাচ্চা বয়েসে এই সময়টায় কী রকম উন্মুখ হয়ে থাকতুম। খুব যে একটা জামা-প্যান্টের শৌখিনতা ছিল তা নয়, কিন্তু নানা রকমের নতুন জিনিস আসবে, সেটাই ছিল আকর্ষণ। নতুন পোশাকের গন্ধই আলাদা, কেন যেন মনে পড়ে, পুজোর জামা-কাপড়ে আরও একটু বিশেষ রকম গন্ধ পেতুম। সেই রঙের উজ্জ্বলতাও একবারই দেখা যায় নববধূর কপালের সিঁদুরের মতন।

বড়দের পোশাকের ফ্যাসান ঘন ঘন পাল্টায় না। সেই তো কত বছর ধরে শুধু হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট দেখে আসছি। প্যান্টের পায়ের দিকের ঘের মাঝে মাঝে কমে বা বাড়ে। কিন্তু ছোটদের পোশাকের ফ্যাসান প্রত্যেক বছর পাল্টায়। কোনোবার পুজোতেই তো আমরা এক রকম জামা-প্যান্ট পেতুম না। প্রত্যেকবার আলাদা কায়দা, আর সেই জন্যই তো অত কৌতূহল।

প্রায় একশখানা শাড়ী, পঞ্চাশ-ষাটখানা ধুতি, কুড়ি-পঁচিশটা থান আর ছোটদের জন্য বাণ্ডিল্স বাণ্ডিল জামা নিয়ে এক সময় কর্তারা যেতেন কলকাতা থেকে। এসব পূর্ববঙ্গের বাল্যকালের কথা। প্রায় যেন মনে হয় গতজন্মের, অথচ চোখের সামনে ঝকঝক করে সেই সব দিনগুলি। দেশ বিভাগের ফলে আমরা অনেকেই জাতিস্মর হয়ে গেছি!

স্টিমার ঘাটাতেই আমরা ভিড় করে দাঁড়াতুম। কর্তাদের নিয়ে আসা সেই সব পোশাকের বাণ্ডিলকে মনে হত ম্যাজিসিয়ানের ঝুলি, ভেতরে কী আছে তা জানবার উপায় নেই। কেননা নতুন জামা-কাপড় ষষ্ঠী পুজোর আগে গায়ে দেওয়া যাবে না বলে দেখানোও হবে না। আমরা যৌথ পরিবারের একগাদা বাচ্চা এই নিয়ে জল্পনা করি, কেউ কেউ সেই পোশাকের

বাণ্ডিল গোপনে খুলে দেখবার চেষ্টা করে ধমক খাই। ষষ্ঠী পুজোর যে ঠিক কত দিন দেরি সে সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। নৌকো চড়ে কুমোর আসে, প্রতিমা এক মেটে দো মেটে করে দিয়ে যায়, তারপর যেদিন দুর্গাঠাকুরের চক্ষুদান হয়, সেদিনই বুঝতে পারি পুজোর আর মোটেই দেরি নেই। এদিকে হাট থেকে কিনে আনা চারটি বলির পাঁঠাকে এতদিন ধরে ঘাস খাইয়ে নধর করে তোলা হয়েছে।

ষষ্ঠী পুজোর দিন সকালেই যে নতুন জামা-প্যাণ্ট পাওয়া যাবে তাও নয়। তার আগে স্নান করতে হবে। ভোর হতে না হতেই দৌড়ে গিয়ে ঝুপ ঝাপ্ করে লাফিয়ে পড়তুম পুকুরে। বাঙাল দেশের বাচ্চা মানেই তো জলের পোকা, চার-পাঁচ বছর বয়েসেই সাঁতার শিখে তুরতুর করে পুকুরের মাঝ বরাবর গেছি। আর দশ-বারো বছর বয়েসে তো রীতিমতন সাঁতারু।

স্নান-টান সেরে সব বাচ্চারা একসঙ্গে এসে দাঁড়ালে পরিবারের যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠা গৃহিণী, অথাৎ আমাদের বড়মা সবার হাতে তুলে দিতেন পোশাক। আর সেই সঙ্গে কেন যে একটা করে সিকি বা আধুলি দিতেন, তা আজ আর মনে নেই। সেই পোশাক হাতে পাওয়ামাত্র আমরা আবিষ্কার করতুম, এবারের ফ্যাসান তোয়ালের মতন রোঁয়া রোঁয়া কাপড়ের কলার দেওয়া হাফহাতা গেঞ্জি-জামা, সামনের দিকে জিপার, যাকে তখন আমরা বলতুম চেইন!

আমরা যারা গ্রামের সাড়ম্বর পুজোর উৎসব দেখেছি, তাদের কাছে শহুরে পুজো অন্যরকম লাগবেই। তাছাড়া আমরা নাস্তিকতার আবহাওয়ায় মানুষ, পুজো মানে আমাদের কাছে শুধুই আনন্দ উৎসব, বড় হয়ে ওঠার পর আমরা পুজোমণ্ডপের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছি। উৎসবের ভারও দিয়ে দিয়েছি ছোটদের হাতে।

তাছাড়া আস্তে আস্তে একটা বয়েস আসে, যখন পাওয়াটা কমতে কমতে একেবারে থেমে যায়, দেওয়ার দিকটাই ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। ভূমিকা বদল হয়ে যায়, সেই বাচ্চা-আমি এখন বয়স্ক-ভারিক্কি হয়েছি, পুজোর আগে হিসেব কষতে বসি, এবার তাহলে সব মিলিয়ে কত খরচ করতে হবে, টাকাটা কোথা থেকে আসবে? আগেকার দিনের কত্তারাও কি এ রকম হিসেব করতেন? তাঁদের হাসি মুখ দেখে তো কিছু বোঝা যেত না। এক

এক সময় আমার মনে হয়, আমি কারুকে কিছু দিইনি, শুধু পেয়েই গেছি!

এখনকার দেওয়ার ব্যাপারটা চলে গেছে পুরোপুরি মেয়েদের হাতে, দোকানে-দোকানে শুধু মেয়েদেরই ভিড়। অনেক সময় দোকানের বাইরে বেচারি-বেচারি মুখ করে স্বামীরাও দাঁড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের যুদ্ধে যেসব স্বামীরা বিজয়ী কিংবা ঠিক এই সময়টায় যে-সব পুরুষ দারুণভাবে নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তারা শুধু টাকাটা জুগিয়েই খালাস। এটা অবশ্য শহরের চিত্র, হয়তো গ্রামের দিকের কর্তারা আগেকার মতনই আছেন।

এখন আর দেওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে সেই উৎসবের ঔজ্জ্বল্য নেই। বাচ্চা-কাচ্চা মিলিয়ে সব আত্মীয়স্বজন আর এক সঙ্গে মেলে না। দূর দূরের আত্মীয় পরিজনের কাছে পুজোয় জামা-কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হয় পুজোর অনেক আগেই। পুরো পোশাকের বদলে অনেক সময় প্যাণ্টের পীস, শার্টের কাপড়। দর্জিরা ভীষণ ব্যস্ত বলে সেগুলো আলমারিতেই বন্দী হয়ে থাকে অনেক বাড়িতে। এমনকি হিসেব কষে শুধু কিছু টাকা দিয়ে দেওয়ারও অতি আধুনিক হৃদয়হীন প্রথা চালু হয়ে গেছে। কিংবা, কে ঠিক কত দামের জিনিস দিয়েছে, তাকেও ঠিক টায় টায় সেই মূল্যেরই উপহার দিতে হবে!

আমি লিখতে যাচ্ছিলুম, আমাদের ছেলেবেলার মতন এখনকার পুজোর উৎসবের উপহার পাওয়া আর দেওয়ার ব্যাপারটা তেমন আনন্দময় নেই, কিন্তু লিখতে লিখতেই মত বদল করলুম। এখনকার চেয়ে আগেকার জিনিস ভাল ছিল, এ-রকম চিন্তার মধ্যেই যেন একটা বুড়োটেপনা এসে যায়। তাছাড়া, এখনকার বাচ্চারা বোধহয় এসব প্রথাবদল গ্রাহ্য করে না, তারা এখনকার রীতির মধ্যেই চমৎকার আনন্দ খুঁজে নিচ্ছে!

৩

কচু গাছ কাটতে কাটতে যেমন কেউ কেউ ডাকাত হয়ে যায়, সেই রকম ভাবে আমি কবে যেন লেখক হয়ে গেছি! মনে হয়, এই তো সেদিনও আমি ছিলাম পাঠক, শুধুই পাঠক, বাংলা অক্ষর পড়ার একটা অদম্য ক্ষুধায় ছটফট

করতাম। শারদীয় সংখ্যাগুলি পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতুম আষাঢ়-শ্রাবণ মাস থেকে। ভাবতুম, রাজশেখর বসু এবার কি লিখবেন ?

তারাশঙ্কর ?

বাল্য বয়েসে তো বটেই, যৌবনেও অনেকদিন সব কটা শারদীয় সংখ্যা কেনার ক্ষমতা তো দূরের কথা, সে রকম একটা বাসনা প্রকাশের দুঃসাহস ছিল না। অথচ সবগুলোই চাই। বাড়ি থেকে কেনা হত হয়তো এক-দুখানা, বাকিগুলো ঠিক জুটে যেত কোনও-না-কোনও ভাবে। এরতার কাছ থেকে ধার করে। কোন্ পুজোসংখ্যায় কার কী ভাল লেখা বেরিয়েছে তা রটে যেত হাওয়ায় হাওয়ায়, সেই লেখাটা না পড়া পর্যন্ত জল খেয়েও ঠিক স্বাদ পেতাম না। সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জনের মোহে, না একখানা পুজোসংখ্যা বিনা মূল্যে পাবার লোভে আমি প্রথম প্রথম অনেক পত্রিকায় কবিতা পাঠাতে শুরু করি, তা ঠিক বলা যায় না। হয়তো দ্বিতীয়টাই সত্যি। আমার কবিতা কেউ পড়বে না, কিন্তু আমি অন্যদের লেখাগুলো পড়তে পাব, এটাই ছিল আমার প্রকৃত মনোভাব। অর্থাৎ লেখক হওয়ার চেয়েও আমার পাঠক সত্তাটাই প্রবল ছিল।

সব লেখাই পড়তুম বটে, তবে বিশেষ প্রিয় একজন লেখক, যাঁর লেখা প্রথম পড়ার জন্য, সেরকম লেখকের নামও এতগুলি বছরে কখনও কখনও বদলেছে। রাজশেখর, তারাশঙ্কর, তারপর কিছুদিনের জন্য সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কয়েক বছর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসু, এখন সত্যজিৎ রায়।

বাংলা পত্র-পত্রিকায় শারদীয় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বয়েস বেশিদিন নয়। বিশের দশকের মাঝামাঝি বোধহয়। গবেষকরা ভাল বলতে পারবেন। প্রথম দিককার কাগজে তেমন চাকচিক্য ছিল না। উপন্যাসের রমরমা ছিল না, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধেরই ছিল প্রাধান্য। শারদীয় সংখ্যার সম্পাদকদের তাড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বহুদিন বাদে আবার ছোট গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কোনও বছরে আনন্দবাজারের শারদীয় সংখ্যায় ছাপা হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস। মোটামুটি সেই সময় থেকেই আমি ছোটদের বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে বড়দের বইয়ের নিষিদ্ধ পৃষ্ঠার দিকে ইতিউতি দৃষ্টি দিতে শুরু করেছি।

প্রথম প্রথম বেশ কয়েক বছর আমরা সব বড় বড় পুজোসংখ্যায় একটাই

উপন্যাস দেখেছি। বড় বড় লেখকরা মনোযোগ দিয়ে ছোট গল্প লিখতেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক ছিল ছোট গল্পের স্বর্ণযুগ। প্রতিটি শারদীয় সংখ্যাতেই যেন ছোটগল্পের প্রতিযোগিতা। সুতরাং উপন্যাসের বদলে গল্প নিয়েই আলোচনা হতো বেশি। পঞ্চাশের দশক থেকেই আধুনিক কবিতা থেকে আধুনিক শব্দটা বাহুল্য বোধে বাদ যেতে যেতে, সমসাময়িক কালের কবিতা শুধু কবিতা হিসেবেই পরিচিত হতে শুরু করে। শারদীয় সংখ্যার পাতায় একাধিক উপন্যাস এসে স্থান জুড়ে বসার ফলে ছোটগল্পের জায়গা খেয়ে নেয় অনেকখানি।

সিনেমা পত্রিকাগুলিই প্রথম চার-পাঁচখানা উপন্যাস দিয়ে চমকে দিতে শুরু করে। প্রথম দু'এক বছর সেইসব পুজোসংখ্যাগুলিকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হল, নাক সিঁটকে বলা হল, এক সংখ্যায় পাঁচ খানা উপন্যাস, ওগুলো আবার উপন্যাস নাকি ? ছোটগল্পকেই একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখা, ফলে ওগুলো ছোটগল্প হিসেবেও জাত খুইয়েছে, উপন্যাস হিসেবেও উতরোয়নি! অবশ্য তারাশঙ্কর-মানিক-বনফুলের মতন প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধেয় উপন্যাসিকরাই ওই সব পত্রিকায় উপন্যাস লিখতে শুরু করেন।

বড় বড় পত্রিকাগুলিও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে রাজি হল না। সেখানে উপন্যাসের সংখ্যা বাড়তে লাগল। 'দেশ' পত্রিকায় সেই বছরই প্রথম শারদীয় সংখ্যায় একটার বদলে তিনটে উপন্যাস ছাপা হল, যে-বছর কনিষ্ঠ উপন্যাস-লেখক হিসেবে আমার আত্ম-প্রকাশ ঘটে। তারপর কয়েকটি বছরের মধ্যেই আমি দশচক্রে পাঠকদের দল থেকে লেখকদের দলে চলে এলাম। পুজোসংখ্যা পাঠের আগ্রহ আর পুজোসংখ্যায় নিজের লেখা শেষ করার দুশ্চিন্তা, এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল আমার সত্তা। এখন পুজোসংখ্যা সম্পর্কে মতামত দিতে গেলে আমি কী হিসেবে দেব, পাঠক হিসেবে, না লেখক হিসেবে ? পুজোসংখ্যা যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তাতে আমার কী প্রতিক্রিয়া হবে ? আমি খুশি হব, না হতাশ হব ? এক এক সময় আমার শখ হয় কোনও একটা বছর একদম লেখালেখি থেকে ছুটি নিলে কেমন হয় ? বিশেষত এই বছরটা আমি খুব বাইরে ঘোরাঘুরি করছি, এই বছর সব লেখা বন্ধ রাখলে বেশ হত! কোনও কারণে, পুজোসংখ্যা একটাও বের না হলে আমার তো খুশি হবারই কথা।

আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, নিজে এক বছর লেখা বন্ধ রাখলে আমি পড়ার সময় অনেক বেশি পাব। তখন শারদীয় সংখ্যাগুলির অভাব পূর্ণ হবে কী

দিয়ে ? পাঠক হিসেবে তো শারদীয় সংখ্যা আরও বেশি করে চাই।

চোখ বুজে ভাবি, আকাশের কালো কালো মেঘগুলি সাদা হয়েছে, ফুটে বেরুচ্ছে নীল রঙ, কাশফুল ও শিউলি ফুল ফুটেছে, আউস ধানের ক্ষেত গর্ভবতী হয়েছে, দুর্গাপ্রতিমা একমেটে দুমেটে হয়েছে। অথচ খবরের কাগজগুলিতে শারদীয় সংখ্যার বিজ্ঞাপন নেই, কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় চাঞ্চল্য নেই! সেই অবস্থা কি আমি সহ্য করতে পারবো ? না, মনে হবে এটা একটা দুর্ভিক্ষের বছর।

শারদীয় সংখ্যা এখন বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। পুজোর সময় নতুন শাড়ি জামা-জুতো কেনার মতনই দু'একখানা শারদীয় সংখ্যা কেনা মধ্যবিত্ত বাঙালির একটা অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এটা ভাল না মন্দ, সে প্রশ্নই ওঠে না। বাঙালির মাছ-ভাত খেতে ভাল লাগে, এটা ভাল না মন্দ অভ্যেস ?

বাইরে বেড়াতে গেলে সঙ্গে পুজো সংখ্যা চাইই। প্রবাসে যাঁরা আছেন, তাঁরা পুজোসংখ্যার জন্য কীরকম হা-পিত্যেশ করে থাকেন, তা আমি অনেকবার স্বচক্ষে দেখেছি। লণ্ডন-আমেরিকায় বাঙালিদের মধ্যে পুজোসংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়। পাশের বাংলাদেশেও তো সেই অবস্থা। সেখানকার পত্র-পত্রিকারও ইদানীং বিশেষ ঈদ সংখ্যা বেরোয়, সেগুলো তো শারদীয় সংখ্যাই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখন শারদীয় সংখ্যায় মজেছে।

শারদীয় সংখ্যার জন্য অনেক সময় লেখকরা চাপে পড়ে লেখেন, হুড়োহুড়ি করে লেখেন, এরকম অভিযোগ শোনা যায় মাঝে মাঝে। পাঠক হিসেবে আমি নিজেও এরকম কথা ভেবেছি কখনও কখনও। লেখক হিসেবে স্বীকার করি এ অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে নয়। কিন্তু চাপে পড়ে বা হুড়োহুড়ি করে লিখলেই যে সে লেখা খারাপ হবে আর ধীরে সুস্থে, ভেবে চিন্তে লিখলেই যে সেটি রসোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ হবে, তার কি কোনও গ্যারাণ্টি আছে ? সম্পাদকের তাগাদায় অনেক সার্থক সৃষ্টি হয়েছে। ডস্টয়েভস্কি একবার সমালোচকদের উপহাস করে বলেছিলেন, বিজ্ঞ সমালোচক আমার উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ সম্পর্কে বলেছেন, তাতে বড় বেশি পরিশ্রমের গন্ধ। সমালোচক বেচারা জানে না যে ওই সংখ্যাটি আমি লিখেছি প্রেসে বসে, খুব ব্যস্ততার মধ্যে! ডস্টয়েভস্কির নাম উচ্চারণ করা একটু বেশি বেশি হয়ে গেল ? সম্পাদকের তাগিদ না পেলে রবীন্দ্রনাথ কি

শেষ জীবনে আবার "তিন সঙ্গীর" দুটি গল্প লিখতেন ? শুনেছি, সমরেশ বসুকে 'গঙ্গা' উপন্যাসটি নাকি কোনও ঘরে বন্ধ করে জোর করে লেখানো হয়েছিল। সুবোধ ঘোষের অনেকগুলি ছোটগল্প পত্রিকা প্রকাশের একেবারে দু'একদিন আগে লেখা। তারাশঙ্করও অনেক লেখা চাপে পড়ে লিখেছেন শুনেছি। শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও এরকম কাহিনী আছে। লেখকরা তাড়াহুড়ো করে লিখছেন, না এক বছর ধরে একটু একটু করে লিখছেন, সেটা পাঠক-দের বিচার্য নয়। লেখকদের মাথার রান্নাঘরে কী ব্যাপার চলছে, তা অন্যদের জানবার কথা নয়। সারা বছর যে ফাঁকি মেরে শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের ঠিক আগেই কলম ধরেছে, সে কি সত্যিই সারাবছর ফাঁকি মারে ?

যারা বলে, লেখকরা আজকাল শুধু টাকার জন্যই লেখে, তারা নিজেরাই অর্থলোভী। তাদের মাথায় সব সময় টাকার কথা ঘোরে। লেখাটার পাঠকদের কাছে লেখকের একমাত্র পরিচয়, তিনি তার জন্য টাকা পাচ্ছেন না বিনা পয়সায় লিখছেন, তা নিয়ে পাঠকদের মাথাব্যথা হবে কেন ?

রবীন্দ্রনাথ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলেন, ছোটগল্পের জন্য আশি টাকার বদলে একশো টাকা না পেলে তিনি আর গল্প লিখতে চান না !

আমি 'যদি' শিরোনামে একসময় অনেক উদ্ভট লেখা লিখেছি, কিন্তু যদি শারদীয় সংখ্যা আর না বেরোয়, এই বিষয়টা আমার মাথায় কোনও কল্পনার উদ্রেক করে না, বরং একটা শূন্যতার অনুভব হয়। আমি বরং চাই, আমার লেখা না ছাপা হোক, তবু শারদীয় সংখ্যাগুলি, ছোট, বড়, মাঝারি, খুদে, সবগুলিই বেরোতে থাকুক, বেরিয়েই চলুক। প্রতি বছর বছর মা ষষ্ঠীর কৃপায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক !

৪

একটা সময় ছিল, যখন মাইলগুলো ছিল দারুণ লম্বা লম্বা। এখনকার কিলোমিটারের অন্তত পাঁচ ছ'গুণ তো হবেই। কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরত্ব তো বিরাট ধু-ধু করা ব্যাপার। এই তো কলকাতা থেকে যশোর এখনকার হিসেবে মাত্র একশো মাইল, যে-কোনো গাড়িতেই বড় জোর চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। আর এক সময় কলকাতা থেকে সকালে বেরিয়ে যশোরে পেঁছোতুম মাঝ রাত্তিরে। আমাদের বাড়ি থেকে মামাদের বাড়ি ছিল পঞ্চাশ-ষাট মাইল

দূরে। বছরে দু'বারের বেশী সেখানে যাওয়া যেত না, ঐ পঞ্চাশ-ষাট মাইল পার হতে লাগতো পাক্কা দেড় দিন। সেটা অবশ্য নৌকো পথে।

আর মুঙ্গের-ভাগলপুর এসব তো ছিল বহু দূরের দেশ, সেই পশ্চিমে, মীরাট-দেরাদুনের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নেই। সেখানে যারা যায়, তারা নির্বাসনেই যায়। ক্বচিৎ তারা ফিরেও আসে।

সেই রকমই একবার শুনলুম, আমাদের ভাগলপুরের মাসীমা এবারে পুজোতে আসছেন। আমার এই মাসীমার মুখও আমার ভালো মনে নেই, অনেক ছেলেবেলায় এঁকে দেখেছি, অবশ্য অন্যান্য মামা-মাসী ও মায়ের কাছে এঁর গল্প শুনি প্রায়ই। ভাগলপুরে আমার দু'জন মাসতুতো ভাইও জন্মে গেছে এর মধ্যে। তাদের একেবারেই চিনি না, শুধু নাম জানি।

আমাদের মামাবাড়ির পুজোয় লোক আসতো অনেক। দাদুশ্রেণী এবং মামাশ্রেণীর অনেকেই চাকরি করতেন প্রবাসে, কেউ রেলে, কেউ কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ সাহেব কোম্পানিতে। পুজোর সময় সবার দেশের বাড়িতে আসা চাই। কিন্তু বিবাহিতা মাসীমা যারা দূরে চলে গেছেন, তাঁদের আর দেখতে পেতুম না বিশেষ। তার মধ্যে সেই সুদূর ভাগলপুর থেকে আমার নতুন দুটি ভাই সমেত এক মাসী আসছেন শুনেই বেশ একটা চনমনে আনন্দ হতে লাগলো। সেই একটা বয়েস যখন বিস্মিত হবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে থাকে।

বাস-ট্রেন-স্টিমার ও নৌকো চেপে আসতে হবে ওঁদের, তিন-চারদিন তো লাগবেই। গরু আর শরৎচন্দ্র, এই দুটি ব্যাপারেই শুধু ভাগলপুর আমাদের কাছে পরিচিত। আমাদের ধারণা, বেলুনের মতন বাঁটওয়ালা প্রচুর গরু সেখানে ঘুরে বেড়ায়, রাস্তার পাশের নর্দমাতেও দুধ গড়িয়ে যায়। আর শরৎচন্দ্র ওরফে শ্রীকান্তের বন্ধু ইন্দ্রনাথ নামে দুর্দান্ত একজন মানুষ ওখানে থাকে। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হতো, আমাদের এখানে আকাশ যেমন নীল, ভাগলপুরের আকাশও কি সে রকম? সবাই যে বলে পশ্চিমের দেশগুলো খুব শুকনো খটখটে!

প্রবল বর্ষায় নদী-নালা-পুকুর-খাল-বিল সব অতিরিক্ত উচ্ছল। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে নৌকো উল্টে যাবার খবর আসে। বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলেও প্রায়ই চোরা ঝড়বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। নৌকো-দুর্ঘটনার কথা শুনে বাড়ির সবাই ভয়ে কাঁটা। ভাগলপুরের মাসীরা আসবার পথে যদি দৈবাৎ

এরকম কিছু হয় ? অন্য কারুর সম্পর্কে এ ভয় নেই, নৌকো উল্টোলে কিছু জিনিসপত্র নষ্টহবে বড়জোর, প্রাণের কোনো ভয় নেই। আমরা তো ইচ্ছে করেই কতবার ডিঙি নৌকো উল্টেছি। ভরা বর্ষার সময় বন্ধুর বাড়িতে যেতে হলে নৌকোর জন্য বসে থাকিনি, প্যান্টুল আর গেঞ্জি খুলে বাঁ হাতে উঁচু করে ধরে ডান হাতে সাঁতরে চলে গেছি।

কিন্তু ভাগলপুরের মাসতুতো ভাইরা তো সাঁতার জানে না! ভাগলপুরের মেসো সারাজীবনই কাটিয়েছেন ঐ দেশে, তিনি নাকি জলকে খুব ভয় পান।

সেই জন্য একখানার বদলে তিনখানা নৌকো পাঠানো হলো ওঁদের আনবার জন্য। মাইল সাতেক দূরে স্টিমার ঘাটা। তবে সে সাত মাইল তো যে সে পাঁচ মাইল নয়, তার মধ্যে অনেক হ্যাপা।

নৌকো একেবারে আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় আনবার ব্যবস্থা আছে, যদিও বাড়ির পাশে নদী নেই। সামনের দিকের বারোয়ারি দিঘিটি বিরাট, তার একটা দিক খুলে দিলে (স্থানীয় ভাষায় যান কাটা) একটা মাঝারি খালের সঙ্গে সংযোগ হয়। অর্থাৎ নদী থেকে নৌকো আসবে সেই খালে, তারপর খাল থেকে পুকুরে। বাড়ি পর্যন্ত মটোরেবল রোডের মতন নৌকো পথ।

সারা বাড়ির তিরিশ-চল্লিশজন লোক পুকুর ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অধীর প্রতীক্ষায়। এক সময় খাল দিয়ে তিনটি নৌকো ঢুকলো দিঘিতে। সবাই নিরাপদেই পেঁছেছে। সামনের নৌকাটিতেই দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ভাগলপুরের মেসো। ফর্সা, ছিপছিপে চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল, হিটলারি গোঁফ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতি, কাঁধের ওপর পাট করা শাল। কেন জানি না, শরৎচন্দ্রেরই লেখা নতুনদা চরিত্রটা মনে পড়লো সেই মেসোকে দেখে।

প্রায় সেই রকমই একটা কাণ্ড করলেন তিনি। ঘাটে নৌকো লাগবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতি উৎসাহে দিলেন একটি ছোট্ট লাফ। লাফ দিলেই যে পায়ের তলা থেকে নৌকো সরে যায় সেটা তিনি জানতেন না, সুতরাং তাল সামলাতে না পেরে ঝপাং করে পড়লেন জলে। একেবারে তীরে এসে তরী ডোবার মতন ব্যাপার। তিরিশ-চল্লিশজন মানুষ একসঙ্গে ই শব্দ করলো।

ভাগলপুরের মেসো অবশ্য বেশ স্মার্টভাবেই জল থেকে উঠে এসে বললেন, আরে, কিছু হয়নি। তোমাদের একটু চমকে দিলুম আর কি।

আমাদের ওপর আগে থেকেই নির্দেশ ছিল যে অনেকদিন পরে মাসী-মেসো আসছেন, কথা বলার আগেই পায়ের ধুলো নিতে হবে। এখন যদিও ধুলো নেই, তবু ভাগলপুরের মেসোর ভিজে পায়ের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তিনি সস্নেহে আমার থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে তারপর নিজের হাতটায় চুমু খেয়ে বললেন, কেমন আছিস রে, বেটা?

এর আগে আমি কখনো কারুকে এরকম নিজের হাতে চুমু খেতে দেখিনি। তার চেয়েও আশ্চর্য হলুম বেটা কথাটা শুনে। আমাদের এখানে বেটা তো গালাগালের সময় বলে। তাও তো ছোট ছেলেদের বলে না কেউ। অবশ্য ভাইপোকে অনেকে ভাইয়ের ব্যাটা বলে বটে। কিন্তু সেটা ভালো না খারাপ অর্থে, সে ব্যাপারে কখনো নিশ্চিন্ত হতে পারিনি।

আমার মাসীকে প্রণাম করায় তিনি বললেন, ও মা, সুকুমার, তুই এত বড় হয়ে গেছিস? অ্যাঁ?

তখন পাশ থেকে আমার অন্য এক মামাতো ভাই বললো, আমার নাম সুকুমার।

তখন মাসী বললেন, ও, ভুল হয়েছে তো, তুই বুঝি তবে চণ্ডীচরণ? কী সুন্দর চেহারা ছিল তোর ছোটবেলায়।

চণ্ডীচরণ নামে অবশ্য কারুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপরে প্রত্যেকদিনই দেখেছি, আমার ভাগলপুরের মাসীর নাম ভুলে যাবার এক দুরন্ত প্রতিভা আছে। বাড়ির কোনো লোককেই উনি ঠিক নামে ডাকেন না। তবে চমৎকার মধুর স্বভাব তাঁর। কী করে সবাইকে খুশী রাখবেন এই নিয়ে তিনি নিরন্তর ব্যস্ত।

আমার মাসতুতো ভাই দুটির সঙ্গে কিন্তু ভাব জমলো না প্রথম দিন। দুই ভাই সব সময় পাশাপাশি থাকে, খুব গম্ভীর, আমাদের দিকে আড়চোখে তাকায়। কিছু জিজ্ঞেস করলেও সহজে উত্তর দেয় না। তবে কি আমাদের ওরা গাঁইয়া ভাবছে? আমরা জানি, কলকাতার ছেলেরা খুব কাউডিস মার্কা হয়। কিন্তু ওরা তো ভাগলপুরের, ওদের কি অত যোগ্যতা আছে? অবশ্য আমি লক্ষ্য করেছি, ওরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চুল আঁচড়ায়। আমাদের তো চিরুনির সঙ্গে সম্পর্ক দিনে একবারই, দুপুরে স্নানের পর।

তাও এক একদিন বাদ যায়।

একদিন বাদে বুঝতে পারলুম ওদের আসল অসুবিধেটা। ওরা ভাল বাংলাই বলতে পারে না। আমরা বলি, উনি আমার মামা। ওরা বলে, উনি আমার মামা হচ্ছেন! তাই শুনে সুকুমাররা ফাজলামি করতে লাগলো, ও উনি এখনো পুরোপুরি মামা হননি তাহলে, তৈরি হচ্ছেন?

তাছাড়া আমরা বাঙালরা সূর্যবংশীয় কিনা, তাই কথায় কথায় চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি না। এরা আবার ঘোর চন্দ্রবংশীয়, এত যে চন্দ্রবিন্দু ছিল তা আমরা জানতুমও না। আমরা দাঁতকে বলি দাত। হাঁসকে বলি হাস। আর এরা বলে দাঁ-আঁ-আঁ-ত্‌ঁ! হাঁ-আঁ-আঁ-স! এমনকি ভাতকেও বলে ভাঁ-ত্‌ আর ঘি-কে বলে ঘিঁ। আমরা ভাতের সঙ্গে ঘি খাই আর ওরা ভাঁতের সঙ্গে ঘিঁ খেতেই চায় না, এদেশের ঘিঁ-তে নাকি ওদের গঁন্ধ লাগে!

দু'দিনের মধ্যেই অবশ্য এসব দূরত্ব ঘুচে যায়। পায়েসের মধ্যে কিসমিসের মতন ওরা বাড়ির একদঙ্গল ছেলেমেয়ের মধ্যে একটু আলাদা হয়ে থাকলেও মানিয়ে যায় চমৎকারভাবে। আমরা ওদের নিয়ে মজা করি, ওরাও আমাদের নিয়ে মজা করে। ভাগলপুরের ছেলেদের আর একটা চমৎকার গুণ আমাদের চোখে পড়ে। ওরা কক্ষনো কোনো ব্যাপারেই মা-বাবার কাছে নালিশ করতে যায় না। ওরা আমাদের চেয়েও বেশী হাসতে পারে।

ভাগলপুরের মাসী সম্পর্কে সবাই বলতে লাগলো, ও একদম বদলায়নি, বিয়ের আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমন, আর ভাগলপুরের মেসোকেও দেখা গেল দারুণ রগুড়ে লোক, উনি নুচি আর নেবু মার্কা কথা বলেন আর দিনে সাত-আট কাপ চা খান বটে, কিন্তু ওঁর কাছে অফুরন্ত গল্পের স্টক।

হুস্‌ করে কখন দিনগুলো কেটে যায় খেয়ালও থাকে না। এই পুজো পুজো বলে এতদিনের প্রতীক্ষা, হঠাৎ একদিন শুনতে পাই ঢাকে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। কী যেন আছে এই বাজনার মধ্যে, বুকটা ধড়াস ধড়াস করে, একটু একটু জালা করে চোখের কোনাগুলো। এতো শুধু বিসর্জন নয়, এ যে আত্মীয়-বিচ্ছেদেরও সময়। বাইরের কেজো পৃথিবী একটু দূরে হাঁ করে বসে আছে, সবাইকেই এবারে যে-যার জায়গায় ফিরে যেতেই হবে।

ঘটনাটি আমার নিজের চোখে দেখা। দক্ষিণ ভারতের দিকে দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোক রয়েছে আমায় কামরায়, অনেকেরই এখন মুখ চিনি। চার পাঁচজন বাঙালি যুবকও রয়েছে, বেশ সুঠাম চেহারা ও সুবেশ, দেখলেই মনে হয় কোনো ভালো কোম্পানির জুনিয়ার এক্সিকিউটিভ। আমি যখন ট্রেনে একলা ভ্রমণ করি, তখন আমি প্রায় বোবা, সুতরাং নিশ্চয়ই বাঙালি থাকি না।

এক একদিকে চলছিল এক এক ধরনের আলোচনা। এক কোণে কয়েক-জন কেরালার ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত তর্কে মেতেছিলেন, মাঝেমাঝেই তাঁরা মাতৃভাষা ছেড়ে ইংরেজি বলছিলেন যে জন্য বুঝতে পারছিলুম যে তাঁদের কথাবার্তা সাহিত্য বিষয়ক। এই রকম কিছুক্ষণ চলার পর বাঙালি যুবকদের মধ্যে একজন অন্যদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের সুরে বললো, হুঁঃ! এইসব ইড্‌লি-ধোসাদের আবার সাহিত্য কী? আমাদের রবীন্দ্রনাথের নখের যোগ্য কেউ আছে ওদের? জিজ্ঞেস কর না।

বাইরে ভ্রমণ করার সময় বাঙালিরা ভুলে যায় যে বাংলা ভাষা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য প্রদেশের কিছু কিছু লোক এখনো শখ করে বাংলা শেখে। তাছাড়া কলকাতার মতন বিশাল শহরে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে মানুষজন এসে দীর্ঘদিন থাকে এবং বাংলাভাষা জেনে যায়। সুতরাং ভারতের যত্রতত্র গোপন কথা কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাংলায় বলা চলে না।

এ ক্ষেত্রেও তাই-ই হলো। কেরালার ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন কথা থামিয়ে বাঙালিদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তারপর অত্যন্ত বিনীত-ভাবে ইংরেজিতে বললেন যে, মহাশয়, আপনি ঠিকই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ টেগোর একজন অসাধারণ লেখক, এ রকম লেখক এক শতাব্দীতে একজন মাত্র জন্মায়। তাঁর তুল্য কোনো লেখক আমাদের মালয়ালম ভাষায় নেই। রবীন্দ্রনাথ টেগোরের কবিতার সব অর্থ না বুঝলেও ধ্বনি শুনতেও আমাদের ভালো লাগে। হে প্রিয় বাঙালিবন্ধু, আপনি কি আমাদের একটি

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন ?

এর প্রতিক্রিয়া যা ঘটলো তাতে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। যুবকরা থতোমতো খেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতাকি করতে লাগলো, এ ওকে ঠেলাঠেলি করে বলতে লাগলো, তুই বল্ না। তুই বল্ না! তারপর কেউ এক লাইন, কেউ দেড় লাইন বলে থেমে গেল। আমার ভয় হতে লাগলো, এর পর না তারা জন-গণ-মন বলতে শুরু করে!

কেরালিয়ান ভদ্রলোক তীব্র চোখে ওদের দিকে চেয়েছিলেন। এবারে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, বলতে পারলেন না তো ? এবারে আমি বলি, শুনবেন ? কোন্‌টা বলবো, 'এবার ফিরাও মোরে', না 'আফ্রিকা' ? আচ্ছা, একটা ছোট শোনাই, 'বাঁশীওয়ালা'। 'ওগো বাঁশীওয়ালা, বাজাও তোমার বাঁশী, শুনি আমার নতুন নাম···।'

সেই বঙ্গ-নন্দনেরা যে এতে যে খুব একটা লজ্জা পেয়েছিল তা মনে হয় নি, কিন্তু বাকি রাস্তা আমি ভুলেও একবারও বাংলায় কথা বলিনি।

ইন্দোরের বিখ্যাত ওস্তাদ আমীর খান প্রায়ই আসতেন কলকাতায়, আমাদের সঙ্গে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল। মানুষটি অত্যন্ত মেজাজী, ধরা বাঁধা নিয়মকানুনের ধার ধারেন না। যখন তখন গান শোনাতে বললে তিনি সে অনুরোধ তো রক্ষা করতেনই না, বরং বেশ বিরক্ত হতেন। আমাদের এক বন্ধুর খুব আগ্রহ ছিল তাঁর গলায় দরবারির কিছু ছেড়-ছাড় শোনার, কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া যাচ্ছিল না।

আমীর খান বাঙালিদের খুব প্রশংসা করতেন। তিনি বলতেন, কলকাতার আসরে গান গেয়ে আরাম আছে, এখানকার শ্রোতারা আসল আসল জায়গাগুলো ঠিক বুঝতে পারে।

তারপর একদিন সেই ঘটনাটি ঘটলো। আমরা কয়েকজন আমীর খানকে নিয়ে রাত্তিরবেলা নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। এক সময়ে ময়দানে গিয়ে বসেছি, সে রাত্রির আবহাওয়া ছিল চমৎকার, আকাশ ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। হঠাৎ একসময় আমীর খান দরবারির তান লাগালেন। আমরা সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ। কিন্তু অচিরেই এক বিকট উৎপাত ঘটলো। একটু দূরে গোল হয়ে বসে ছিল আর একটি দল। তাদের দু'তিনজন আমীর খানের সুরকে ভেংচে উঠলো অ্যা অ্যা করে! আমরা ছুটে গিয়ে সেই যুবকদের কাছে হাত জোড় করে বুঝিয়ে বললুম, ইনি ভারত-বিখ্যাত গায়ক আমীর খান,

এই পরিবেশে এঁর গান শুনতে পাওয়া এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমাদের মিনতি অনুরোধে সেই দলটি কর্ণপাত করলো না। আমীর খান থেমে গেলেন, তাদের ভ্যাঙচানি চলতেই থাকলো।

এই ঘটনাটি আমি আগেও অন্যত্র উল্লেখ করেছি। যখনই মনে পড়ে, তখনই লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।

কিছুদিন আগে রেডিও-তে একটা অনুষ্ঠান শুনছিলাম। অনুষ্ঠানটি যেমন চকমপ্রদ তেমনি শিক্ষাপ্রদ। সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপ ঃ

আপনারা ক'জন ক্যান্ডিডেট এখানে আছেন ?

আমরা স্যার এখানে আছি ছাব্বিশজন। টোয়েন্টি সিক্স! অ্যাপ্লিকেশান পড়েছিল অনেক, তার মধ্যে আমরা এই ক'জন সিলেকটেড হয়েছি, আমাদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়, বলতে পারেন আমরা লাকি টুয়েন্টিসিক্স।

আপনাদের তো থাকার অ্যাকোমোডেশানও এখানে রয়েছে ? খাওয়া দাওয়াও এখানেই ?

হ্যাঁ। ফুডিং-লজিং-এর জন্য আমাদের কিছু খরচা দিতে হয়। কিচেন ম্যানেজ করার ভার আমরা নিজেরাই ডিস্ট্রিবিউট করে নিয়েছি।

আপনাদের এই ট্রেনিং-এর পর ফিউচার প্রসপেকট কী রকম ?

আমাদের থ্রি মান্থস ট্রেনিং। আপ টু নাউ আমরা কাজ যা শিখেছি তাতে এটুকু কনফিডেন্স আছে যে যে-কোনো জায়গায় এনিহোয়ার যদি কাজ পাই তাহলে আমরা প্রুফ করতে পারবো।...ইত্যাদি ইত্যাদি।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতারা একটিও নির্ভুল বাংলা বাক্য বলছেন না। অকারণ, অপ্রয়োজনীয় ও অধিকাংশই ভুল ইংরেজি শব্দ এঁরা ব্যবহার করে যাচ্ছেন অম্লানবদনে। আমাদের দেশের বেকার যুবকদের এমন ইংরেজিপ্রীতি বিস্ময়কর। অথচ আমাদের এক কবি গান লিখে গেছেন, 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'। তামিল বা গুজরাটি ভাষায় এরকম গান আছে কিনা জানি না, কিন্তু ঐ ঐ ভাষার দু'জন লোক যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলেন, তখন ক্কচিৎ ইংরেজি শব্দ শোনা যায়।

বাংলাদেশ থেকে দু'জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একদিন এসেছেন আমাদের বাড়িতে। একজন খুব বড় পণ্ডিত ও গবেষক, অন্যজন ছবি আঁকেন। বসবার ঘরে আরও লোকজন রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন আমার এক বন্ধু

ও তাঁর স্ত্রী। নানা রকম বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। কথায় কথায় লণ্ডন প্রবাসিনী আমাদের এক বান্ধবীর প্রসঙ্গ উঠলো। গুজব শোনা গিয়েছিল যে তিনি সদ্য বিয়ে করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম কাকে বিয়ে করেছে? কোনো সাহেবকে? না বাঙালিকে?

বন্ধু পত্নীটি হঠাৎ বলে উঠলেন, ও যাকে বিয়ে করেছে তাকে আমি চিনি। সে বাঙালি নয়, মুসলমান!

বাংলাদেশ থেকে আগত দু'জন ভদ্রলোক পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকালেন। একজন হাসতে হাসতে বলে ফেললেন, আপনি তা হলে আমাদেরও বাঙালি মনে করেন না?

বন্ধু-পত্নীর মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে, নিজেকে সংশোধন করার জন্য তিনি তোতলাতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ যে-ধরনের কথা তিনি বাড়ির মধ্যে প্রায়ই বলেন, সেই কথা বাইরের লোকদের সামনে হঠাৎ বলে ফেলেছেন বলেই তাঁর এত লজ্জা।

ভদ্রমহিলাকে অবশ্য আলাদাভাবে দোষ দেওয়া যায় না। কবি সত্যেন দত্ত বাঙালির গর্বের তালিকা নিয়ে একখানা কবিতা লিখেছিলেন, সে কবিতাটি বহু বছর ধরে স্কুল-পাঠ্য ছিল, এখনো আছে কিনা জানি না। সেই কবিতায় একজনও মুসলমানদের নাম নেই। বছরের পর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাঙালি বলতে শুধু হিন্দুদেরই বোঝায়। অথচ, কবিতাটি যখন রচিত, তখনকার অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশীই মুসলমান, এবং তাদেরও আবার শতকরা নব্বইজন বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানে না।

৬

হাটে বাজারে, গঙ্গার ধারে, কফি খানায়, ক্রিকেট খেলার মাঠে, এমনকি সিনেমা-থিয়েটার হলেও এক একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আমাকে দেখলেই কাছে এগিয়ে আসেন, কথা বলার আগে কপাল কুঁচকে যায় খানিকটা, তারপর বলেন, কলকাতা শহরটার দিন দিন কী অবস্থা হচ্ছে দেখছেন না? আপনারা এই বিষয়ে কিছু লিখুন!

চরিত্র প্রায় এক, বক্তব্য নানা ধরনের। কেউ বলেন, ছেলেমেয়েদের

লেখাপড়া তো সব গোল্লায় গেল। কলকাতা-যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কী কাণ্ড হচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনারা কিছু লিখতে পারেন না? কিংবা, মাছের দাম কী রকম বাড়ছে টের পাচ্ছেন না? কিছু লিখুন আপনারা। কিংবা, সিগারেট খাওয়া কত ক্ষতিকর, এ সম্পর্কে আপনারা কিছু লিখতে পারেন না? কিংবা, সব বাঙালি মেয়েরা আজকাল চুল ছেঁটে মেমসাহেব হয়ে যাচ্ছে, এসব আপনাদের চোখে পড়ে না? এই বিষয়ে কিছু লিখুন। কিছু লিখুন। কিছু লিখুন…

আমার ধারণা, সব সাহিত্যজীবীকেই এই রকম উপরোধ শুনতে হয় অনবরত।

লেখকদের দেখলেই অনেক মানুষের মনে দেশ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা জাগে। কিংবা সমাজ সম্পর্কে কিংবা সাম্প্রতিক কোনও সমস্যা…। তাঁরা সেই সব সমস্যা সমাধানের ভার লেখকদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এই সব ক্ষেত্রে, এড়িয়ে যাবার জন্য আমি প্রকাশ্যে বলি, হ্যাঁ, লিখবো, লিখবো, নিশ্চয়ই লিখবো।

কখনও কখনও মনে মনে বলি, বাঃ বেশ, বেশ, কলকাতা শহরের উন্নতির জন্য আপনি নিজে কিছু করবেন না, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘোচাবার জন্য আপনি নিজে কোনও উদ্যোগ নেবেন না, মাছের দাম বাড়লেও আপনি ঠিকই কিনবেন, শুধু এই সব সমস্যা ঘোচাবার দায়িত্ব নিতে হবে বেচারি লেখকদের!

কিংবা, কখনও মনে মনে বলি, কলকাতার সমস্যা নিয়ে কি আমরা লিখিনি? অন্তত তিরিশ চল্লিশবার আমি নিজেই লিখেছি। কী হয় লিখে? সবই আজকাল রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত, রাজনৈতিক দলের কর্তারা লেখকদের কথায় কর্ণপাত করেন না। মেট্রো রেল ময়দানের ওপর যেখানে সেখানে যখন ঘর বাড়ি বানাতে শুরু করল, আমরা দাবি জানিয়েছিলুম যে, এ সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত নেওয়া উচিত। তারা গ্রাহ্য করেনি। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার নাম যে হুটহাট করে পাল্টানো হচ্ছে, সে বিষয়ে লেখকদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত নয়?

সাহিত্যের কাছে মানুষ কী চায়?

এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ পাঠক সাহিত্য কী তাই-ই জানে

না। তারা বই পড়ে, তারা গল্প-উপন্যাস পড়ে, তারা অনেক সময়ই বই পড়ার পর লেখকদের নাম মনে রাখে না, বা এক লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের রচনা গুলিয়ে ফেলে। সাহিত্য নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই, গল্পটা ভালো লাগলো কি ভালো লাগলো না, সেটাই একমাত্র বিচার্য। কোন গল্প-উপন্যাস সাহিত্য আর কোন গল্প-উপন্যাস সাহিত্যপদবাচ্য নয়, সে রকম বোঝার মতন পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা খুব বেশি নয়।

যারা সাহিত্য বোঝে না তারাই ছাপার অক্ষরের কাছ থেকে অনেক কিছু দাবি করে। তারা খবরের কাগজের দৈনন্দিন লেখা ও সাহিত্যিকের লেখার মধ্যে কোনও তফাৎ করে না। খবরের কাগজে প্রতিফলিত সমস্যাগুলি তারা সাহিত্যিকদের দিয়ে সমাধান করাতে চায়। রাজনৈতিক নেতাদের তারা হাতের কাছে পায় না। পেলেও মুখের ওপর কিছু বলার সাহস হয় না, কিন্তু সাহিত্যিকদের সব কিছু বলা যায়।

সাম্প্রতিক কালের গল্প উপন্যাসে অনেক পাঠক-পাঠিকাই নিজের ছায়া দেখতে পায়। তাতে মনে হয় যে, সাহিত্যিকরা তাদের মনের কথা জানে। তা হলে সাহিত্যিকরা তাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ দূর করার দায়িত্ব নেবে না কেন?

অনেকেরই প্রশ্ন, সাহিত্যিকরা নানা রকম সংকটের ছবি ফুটিয়ে তোলেন, কিন্তু কোনও সমাধানের পথ দেখান না কেন?

গল্পের নায়ক-নায়িকার শেষ পর্যন্ত বিয়ে দিয়ে দিলে সব কিছুর সমাধান হয়ে যায়। লেখকের কলমের খোঁচায় তা অনায়াসেই সম্ভব। কিন্তু গল্পের বেকার যুবক শেষ পর্যন্ত চাকরি পায় না। কেন লেখক তাঁর কলমের দয়ায় ওকে একটা ভালো চাকরি দিয়ে দেন না? লেখক কি কৃপণ, না নির্দয়? লেখক এই রাজ্যের চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ বেকারের চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন?

এক সময় সব সমস্যার সমাধানমূলক এক ধরনের গল্প-উপন্যাস লেখা বেশ চালু হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে। সব গল্পের শেষেই একটা লাল সূর্য উঠত। আশার প্রতীক। কিংবা বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের দল এক কাট্টা হয়ে হৈ হৈ করে ছুটে গিয়ে জমিদার বা জোতদারের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে। কল্পনায় রাবড়ি খাওয়ার মতন এক কাল্পনিক বিপ্লব। কিংবা বিপ্লবের মেড-ইজি। সেই সব কৃত্রিম অবাস্তব রচনা এখন বিস্মৃতির

আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবতার একটা সম্পর্ক থাকেই। সাহিত্য কখনও হুবহু বাস্তব হয় না আবার বাস্তববিবর্জিতও হতে পারে না। প্রকৃত লেখক বাস্তবের ছবি আঁকতে বাধ্য, তা নিষ্ঠুর, নৈরাশ্যমূলক হলেও। এ রকম ছবি আঁকার উদ্দেশ্য, পাঠক সমাজকে সচেতন করা, পাঠক যাতে সেই অবস্থাটা বদলাবার জন্য একবার অন্তত চিন্তা করে। সেইটুকুই যথেষ্ট। তার বদলে লেখক যদি একটা কষ্টকল্পিত ভবিষ্যতের ছবি এঁকে দেন, পাঠকের উদ্দেশে একটা নীতি-লেকচার ঝাড়েন, তবে তা সাহিত্যও হয় না, তাতে পাঠকদের কোনও লাভও হয় না।

জনপ্রিয় উপন্যাসে যেমন একটা প্রেম কাহিনীর ফর্মুলা থাকে, দুটি ছেলে একটি মেয়ে, একজন বড়লোক একজন গরিব, একজন দুশ্চরিত্র পরে ভালো হয়ে গেল, একজন সতী-লক্ষ্মী জননী দুঃখ পেয়ে পেয়েও শুধু আত্মত্যাগ করে গেল ইত্যাদি, সেইরকম আর এক ধরনের লেখায়, যাকে বলে প্রগতিশীল সাহিত্য, তাতেও বেশ একটা ফর্মুলা আছে। আজকাল ফিল্মে, থিয়েটারে, অনেক গল্প উপন্যাসে এই ফর্মুলাটা চলছে। অজ পাড়া গাঁ-র একদল খুব নিপীড়িত মানুষ, হরিজন বা আদিবাসী, তারা এক জোতদার বা মিল মালিকের অত্যাচারে ধুকছে, এর মাঝখানে রয়েছে একজন আদর্শবাদী ইস্কুল মাস্টার, লেলিন-মার্ক্স-বুদ্ধ-রবীন্দ্রনাথ সব মিলিয়ে যার সৃষ্টি, একজন ভণ্ড মন্ত্রী, একজন বিপ্লবে নিবেদিত-প্রাণ পার্টি কর্মী, একটা-দুটো খুন, হরিজন বা আদিবাসী পল্লীর অতীব তেজী ও সুন্দরী একজম রমণী, তারপর একটা মিনি-বিপ্লবের ইঙ্গিত।

শুধু সাদা বা শুধু কালো, এই দুটি রং সাহিত্যে একেবারেই চলে না. তবু পাপ-পুণ্য, প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল এইসব ছদ্মবেশে ওই সাদা-কালোরং বারবার ফিরে আসে, এসে সাহিত্যের নামে ছাপা কাগজের আবর্জনা বাড়ায়। আকাশের রামধনুর চেয়েও রস-সাহিত্যের রং অনেক বেশি, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর চেয়েও অনেক বেশি সুর মিশলে সেই রচনা রসোত্তীর্ণ হয়।

শিল্পের জন্যই শিল্প, এই তত্ত্বটিকে ইদানীং অনেকেই বাতিল করতে চান, তা করুন, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে তার বক্তব্যটুকুই আসল, এই মত যাঁরা আঁকড়ে ধরতে চান, তাঁরা সাহিত্যের কিছুই বোঝেন না। সাহিত্যের

মধ্যে লেখকের বক্তব্য যত নিরুচ্চার থাকবে ততই বেশি তা পাঠকের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। সমস্ত লেখকই সামাজিক অসাম্য দূর করায় বিশ্বাসী, কিন্তু যে-সব কলমধারী চিৎকার করে সেই কথাটা বলতে চায় তারা তকমা আঁটা বড় প্রগতিশীল বলে পরিচিত হতে পারে কিন্তু তাদের রচনার রস আমার কাছে গ্যাঁজানো মনে হয়। আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত, তাঁর কাজ ছিল সূক্ষ্মসূতোর।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যখন দেখি কবিতার মধ্যেও অনেকে প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল চিহ্ন খোঁজে। শব্দ-সাহিত্যের মধ্যে কবিতাই সবচেয়ে সূক্ষ্ম। কবিতার মধ্যে বক্তব্যের অংশ অকিঞ্চিৎকর, শব্দ-ব্যঞ্জনাই তার প্রাণ। কবিতা অবশ্য বিনি সূতোর শব্দের মালা নয়, কবির একটা চিন্তার প্রতিফলন তাতে থাকেই, তার মধ্যে অনেকখানিই স্বপ্ন-দর্শনের মতন, তার লজিক সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু বক্তব্যটুকু ছেঁকে তোলা যায় একমাত্র অ-কবিতা থেকে। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা কবিতার মূল ধারা ব্যঞ্জনামূলক, বক্তব্যমূলক নয়।

বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের প্রাণের স্পন্দন টের পাওয়া যায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলি থেকে। কোন লিট্‌ল ম্যাগাজিনই তেমন দীর্ঘজীবী হয় না, কিন্তু স্রোত সব সময় অব্যাহত। এত দারিদ্র্য, এত হতাশার মধ্যেও যুবসমাজ সাহিত্যের জন্য প্রাণপণ করে। সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখাই রসোত্তীর্ণ হয় না, অনেকে হাত পাকাবার আগেই ছাপা লেখার আসরে অনধিকারীর মতন এসে পড়ে। কিন্তু সব মিলিয়ে বলা যায়, লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলিতে বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাই কাজ করে যায়।

৭

ছাত্র বয়েসে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়, আমার হঠাৎ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার সাধ জাগে। তখন উত্তর কলকাতায় থাকি, কলেজ যাওয়া-আসার পথে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ব্রাহ্মসমাজের একটি বাড়ি চোখে পড়তো, একদিন সেখানে ঢুকে দেখা গেল বিনা পয়সায় পড়ার জন্য একটা চমৎকার লাইব্রেরি আছে কিন্তু পড়ুয়া বিশেষ কেউ নেই। সেই লাইব্রেরিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী এবং রামতনু লাহিড়ী ও

তৎকালীন বঙ্গসমাজ, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ইত্যাদি (এসব বই তখন সহজলভ্য ছিল না), পাঠ করে আমার মাথার মধ্যে একটা ঘোর লাগে, আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহীরুহ সদৃশ মানুষগুলির মানসিক সাহচর্য বোধ করি যেন। তাছাড়া, সেই বয়েসে আমি রবীন্দ্র রচনায় আচ্ছন্ন, রবীন্দ্রনাথ আমার আদর্শ পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্ম ছিলেন, তখন আমারও ব্রাহ্ম না হবার কোনোই কারণ থাকতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে আমার তখন কোনোই ধারণা ছিল না। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী কারুকে চিনতুম না, কী ভাবে ব্রাহ্ম হতে হয় তাও জানি না, কিন্তু মনের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা জন্মেছিল। অবশেষে একদিন ঐ গ্রন্থাগারের বৃদ্ধ লাই-ব্রেরিয়ানের শরণাপন্ন হলাম। এমন অনেক দুপুর গেছে যখন ঐ গ্রন্থাগারে আমি আর তিনি ছাড়া আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি থাকতেন না। সুতরাং তিনি আমার মুখ চিনতেন। প্রথমে তিনি আমার প্রস্তাবটি শুনে বিশ্বাস করতে পারেননি, দু তিনবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, সত্যি তুমি দীক্ষা নিতে চাও ?

নতুন একটি খদ্দের পেয়ে তিনি আগ্রহের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েননি, আমার কথা শুনে উপহাসও করেননি, মা-বাবার অনুমতি আনার আদেশ দেননি, বরং সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছিলেন, এত ব্যস্ততার কী আছে, তুমি আরও পড়াশুনো করো, নিজেকে বারবার যাচাই করে দেখো, আরও কিছুদিন সময় যাক, তারপর না হয় তোমার সিদ্ধান্ত নিও।

সেই বৃদ্ধের নাম আমার মনে নেই, আজও তাঁর মুখটি আমার চোখে ভাসে, আমার কাছে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধেয়। আর কিছুদিন পরেই আমার ধর্ম বদল করার ইচ্ছে লোপ পায়, ধর্ম ব্যাপারটা থেকেই আমি নিজেকে নিযুক্ত করে নিতে সক্ষম হই।

ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম বলে আমারও যথানিয়মে কৈশোরকালে উপনয়ন হয়েছিল : মুণ্ডিত মস্তকে আমি মুষ্টি ভিক্ষা নিয়েছি। কিন্তু দ্বিজত্বে পরিণত হয়েও আমার মধ্যে কোনো ব্রাহ্মণ্য-অহংকার জাগার সুযোগ হয়নি। অল্প বয়েস থেকেই আমি ব্রাহ্মণদের ঘোরতর অপছন্দ করতাম। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে কষ্ট পেতে হয়েছিল, অথচ চোখের সামনে অনেক জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণকে দেখতে পাই, যারা মনুষ্য পদবাচ্যই নয়। আসলে

আমাকে পৈতের অনুষ্ঠান মানতে হয়েছিল বাবার আদেশে, বাবার কোনো কথার প্রতিবাদ করার সাহস সে বয়েসে ছিল না। তাছাড়া নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলেদের পৈতে অনুষ্ঠানটি লোভনীয় ছিল একটি কারণে, ঐ সময়ে আত্মীয়বর্গের কাছ থেকে কিছু টাকাপয়সা, কলম, টর্চ ইত্যাদি উপহার পাওয়া যেত। আমার এক সহপাঠী তার পৈতের সময় সোনার বোতাম ও সাইকেল পেয়েছিল। আমার বাসনা ছিল একটি সাইকেলের, কিন্তু কেউ তা আমায় দেয়নি, তবে সর্বমোট আমি পেয়েছিলাম চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনা, আমার জীবনে সেই প্রথম স্বাধীন ভাবে খরচ করার মতন একটি অর্থ-ভাণ্ডার। মা অবশ্য বলেছিলেন টাকাটা তাঁর কাছে জমা রাখতে, আমি রাখিনি।

গায়ত্রী মন্ত্রটন্ত্র আমার মুখস্থ ছিল, সকাল-সন্ধ্যা আহ্নিকও করতে হয়েছে কিছুদিন, কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর বই পড়ার অনেক আগেই আমি উপবীত ত্যাগ করি। দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে একদিন সাঁতার কাটতে গিয়ে পৈতেটি গা থেকে খুলে নিমজ্জিত হয়, সেটি উদ্ধার করার কোনো ব্যস্ততা আমার জাগেনি, পৈতের মহিমা আগেই মন থেকে অপসৃত হয়েছিল।

আমার পৈতে হয়েছিল কালীঘাট মন্দিরে। সেই প্রথম আমার সজ্ঞানে কালীঘাট মন্দির দর্শন। সেই মন্দিরে কয়েকটি ঘণ্টা কাটানোই, যে-কোনো কিশোরের মনে ভক্তির বদলে চিরস্থায়ী বিভীষিকার ছবি এঁকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ভিড়, ঠ্যালাঠেলি, নোংরামি, রক্ত, পয়সার জন্য সর্বক্ষণ ছিনিমিনি, পুরুত-পাণ্ডাদের লোভ, চতুর্দিকে ধূর্ত মুখ, আমার বাবা অবিরাম খরচ বাঁচানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করছেন, কেউ শুনছে না, এইসব দেখেশুনে আমি ঘৃণার সঙ্গে ভেবেছিলাম, এই কি হিন্দুধর্মের পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র? এখানে আমি প্রণাম করবো? ছিঃ! সেই অনুভূতি এমনই তীব্র যে আমার চোখে জল এসে যায়। আমার বাবা যেখানে ধর্ম ভক্তি বা ধর্মভীতির কাছে অসহায়, সেখানে আমি তাঁর মানসিক সঙ্গী হতে পারছি না, সেই বয়েসে এই উপলব্ধি খুবই দুঃখময়।

তারপর আমি দেওঘরের মন্দির, পুরীর মন্দির ও অন্যান্য যে সব মন্দিরে গেছি, সর্বত্রই দেখেছি টাকার খেলা, টাকার লোভ। হিন্দুরা টাকা দিয়ে পুণ্য কিনতে চায়, টাকা দিয়ে ধর্ম রক্ষা করে। সেই বয়েসেই আমার মনে হতো, যারা ধর্ম বিক্রি করে, যারা পুরোহিত, পাণ্ডা, মোহন্ত বা গুরুদেব তারা

নিজেরা নিশ্চিত ধর্মবিশ্বাসী নয়, তারা পাপের পরোয়া করে না, না হলে আরাধ্য বিগ্রহের সামনেই তারা লোক ঠকায় কী করে? শ্রাদ্ধের সময়, বিয়ের সময়, নারায়ণ শিলার সামনেই পুরুতদের দেখেছি দক্ষিণা ও দান-সামগ্রী নিয়ে দরদাম ও ঝগড়া করতে, ঐ জিনিসটা নেই তো মূল্য ধরে দাও বলতে, অথচ এই সব লোকদেরই হিন্দুরা শুভকাজে ডাকে? এরা ধর্মের প্রবক্তা, না ধর্মের দালাল?

অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজনরা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সামনেই এমন সব বিষয় আলোচনা করতেন যা শুনে মনের মধ্যে গভীর ভাবে একটা দাগ কেটে যেত। যেমন কোনো বিয়ের সম্বন্ধের সময় পাত্র বা পাত্রীপক্ষ খাঁটি কুলীন না ভঙ্গজ, না শ্রোত্রীয়, রাঢ়ী না বারেন্দ্র এই সব বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা। আমার এক উচ্চশিক্ষিত মামা একবার একটি পাত্রপক্ষ সম্বন্ধে বলেছিলেন, আরে দূর দূর ওরা রাঢ়ী না বৈদিক! কথাটা আজও আমার কানে বাজে। রাঢ়ীদের তুলনায় বৈদিকরা যে কেন অতখানি অবজ্ঞার যোগ্য, তা আমি আজও বুঝিনি। কিন্তু তখনই আমার সখেদে মনে হয়েছিল, এই কি তবে হিন্দু ধর্ম? যে ধর্মে মানুষে মানুষে এত বিভেদ, তা কি কোনো-ক্রমেই শ্রদ্ধেয় হতে পারে? ইস্কুল-কলেজে আমাদের পড়ানো হয় যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কত বড় মহাপুরুষ, অথচ সমাজে তাঁদের বাণী ও আদর্শের কোনো প্রতিফলন নেই। বিদ্যাসাগরকে যারা শ্রদ্ধা করে, তারাও মনে রাখে না যে ঐ তেজস্বী ব্রাহ্মণটি বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছিলেন। যারা বাড়িতে ঐ সব মহাপুরুষদের ছবি টাঙায় তারাও বামুন-কায়েত-শূদ্রের তফাৎ করে প্রতি পদে পদে, তারা হরিজনদের হাতের জল খায় না, কিন্তু হরিজনদের রক্ত নিঙড়ে খেতে আপত্তি নেই। যারা মুসলমানদের বাড়ির মধ্যে বসতে দেয় না, তারাই সাহেবদের পা চাটে। নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, ভণ্ডামিতে হিন্দুরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ।

অল্প বয়েস থেকেই আমি ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু। গুরুজনেরা যা বলে দিয়েছেন তা নির্বিচারে মেনে নিইনি, ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা-গুলির মধ্যে কোনো সত্যতা আছে কিনা তা অনবরত জানতে ইচ্ছে হয়েছে। পঞ্চাশের দশকেও, আমাদের কৈশোরে, জীবনের নানা স্তরেই ধর্ম অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে তখন প্রভেদ ছিল যথেষ্ট। কোনো বামুনের ছেলে কোনো অব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে, এ

ঘটনা ছিল অকল্পনীয়। অপরপক্ষে, আমি একবার উলুবেড়িয়ায় আমার এক কায়স্থ বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, আমার সেই বন্ধুর মা, আমার সদ্য পৈতে হয়েছে শুনে, জোর করে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। অল্পবয়েসী, অশিক্ষিত পুরুতদের পায়ে হাত দিয়ে বয়স্ক, উচ্চশিক্ষিত অব্রাহ্মণরা প্রণাম করছে, এ তো সব সময়েই দেখা যেত। কিন্তু আমি উলুবেড়িয়ার ঐ ঘটনায় দারুণ কষ্ট পেয়েছি, অনেকদিন আমার মনের মধ্যে সেই যাতনা ছিল। ধর্মের নামে এই এক অন্যায়ের অংশভাগী হতে হলো কেন আমাকে? পরবর্তীকালে সামান্য ইতিহাস নাড়াচাড়া করে দেখেছি, আমাদের দেশে যারা ব্রাহ্মণ সেজে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বিশেষ কোনো ঋষির নামে গোত্র পরিচয় দেয়, তাদের অনেকেরই ব্রাহ্মণ হিসেবে ধারাবাহিকতা নেই, মধ্য যুগে রাজাদের ঘুষ দিয়ে অনেক অন্য জাতের লোকও ব্রাহ্মণ হয়েছে, আজকাল যাকে এফিডেভিট করা বামুন বলে। উপাধ্যায়দের বিশেষ প্রতিপত্তি সহ্য করতে না পেরে ধরাসুর রাজার পরবর্তী আমলে অনেক অন্যান্য ব্রাহ্মণ—অব্রাহ্মণ গাঞী পরিচয় ত্যাগ করে বা গোপন করে উপাধ্যায় বনে যেতে থাকে। সে কারণেই বর্তমানে চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যেদের এত সংখ্যাধিক্য। আমাদের পরিবারটিও সেই জাতীয় ভেজাল বামুন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েসেই আমার মনে সংশয় জাগে, ঈশ্বর বলে কিছু আছে না নেই? প্রথম যৌনতার উন্মেষ ও ঈশ্বর বিষয়ে সংশয় মনকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করে। যে-কোনো মানুষের জীবনেই এটাই বোধ হয় সবচেয়ে সংকটময় সন্ধিকাল। বহু শতাব্দী ধরে মানুষ যে ঈশ্বরকে অবলম্বন করে আছে, ঈশ্বরকে ভয় পেয়েছে, আবার বিপদে সান্ত্বনা পাবার জন্য ঈশ্বরকেই স্মরণ করেছে, দুঃখে বা কৃতজ্ঞতায় কেঁদেছে, আমি একজন সামান্য মানুষ হয়ে কী করে তাঁর স্বরূপ বুঝবো? ঠাকুর-দেবতাদের ব্যাপার নয়, একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, তিনি কি আমার মতন একজন ক্ষুদ্র মানুষের প্রতিও নজর রাখছেন? সত্যিই কি সে রকম কোনো একক শক্তির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? থাকলেও, আমার জীবনে তাঁর ভূমিকা কী?

আমার জীবনেও এই দ্বন্দ্ব বছরের পর বছর চলেছে। আশেপাশের অনেককে দেখতাম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবধারিত এটা মেনে নিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা

করে, যেখানে সেখানে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে, কিন্তু জীবন যাপনে লোভ-লালসা, ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতা ইত্যাদি বর্জনের কোনো চেষ্টা নেই। সামাজিক বঞ্চনাগুলি আস্তে আস্তে আমার চোখে প্রকট হয়, তেতাল্লিশের বাংলার মন্বন্তর, পঁয়তাল্লিশের জাপানে পারমাণবিক বোমা, ছেচল্লিশে ভারতব্যাপী দাঙ্গা, এই সব কিছুর মধ্যে আমি সর্বশক্তিমান কোনো ঈশ্বরের মহিমা খুঁজে পাই নি।

স্কুল-কলেজে আমি ভালো ছাত্র ছিলুম না, কিন্তু আমি শখের ইতিহাস-পড়ুয়া। মনুষ্য জাতি ও সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস আমাকে রোমাঞ্চ কাহিনীর মতন টানে। এই ইতিহাস আমার চোখ খুলে দেয়।

ঈশ্বর নামের বিশ্বাসটি এই পৃথিবীর মধুরতম ও নৃশংসতম গুজব। ব্যক্তিগত জীবনে এই ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষকে এক প্রগাঢ় কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে পারে, তাতে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হয়। সন্ত-সুফী-সন্ন্যাসীরা ঈশ্বর আরাধনায় রচনা করেছেন বহু উৎকৃষ্ট কাব্য, শিল্পীরা নির্মাণ করেছেন চিরস্থায়ী সৌন্দর্য, সাধকদের কণ্ঠস্বর দিয়ে নির্গত হয়েছে মরমী সঙ্গীত। এই ঈশ্বর বিশ্বাসকে অবলম্বন করে কোনো কোনো মানুষ নৈতিক উন্নতির শিখরেও উঠতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু যখনই এই ঈশ্বর হয়েছেন সমষ্টিগত ভাবে বন্দনীয়, তখনই তিনি ভয়াবহ। যে ঈশ্বর কোনো ধর্ম বিশ্বাসের প্রধান, তিনি বীভৎস সব মারণ যজ্ঞের কাণ্ডারী। ধর্মীয় সংঘর্ষে আজ পর্যন্ত যত নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে, বড় বড় রাজ-নৈতিক যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা সেই তুলনায় নস্যি। ধর্মের নামে যে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা যুগ যুগ ধরে ঘটে যাচ্ছে, তার তুলনায় সাধারণ চোর-ডাকাত-খুনীদের নিষ্ঠুরতা কিছুই না। পৃথিবীর কোনো ধর্মেই মানবতার বোধ নেই, আছে শুধু স্বার্থপরতা।

ধর্মগ্রন্থগুলিতে যতই গালভরা প্রেমের কথা বা বিশ্বমানবতার কথা থাকুক, আসলে প্রত্যেই ধর্মই অন্য ধর্মাবলম্বীদের হীন চক্ষে দেখে। নইলে ধর্ম নিয়ে এত সংঘর্ষের তো প্রশ্নই উঠতো না!

ধর্মগুলি আসলে কতকগুলি মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সংস্কার মাত্র। রোমান আমলে যখন দুর্নীতি-ব্যভিচার ও দুর্বল-পীড়ন চরমে উঠেছিল, তখন একজন শুদ্ধ সৎ মানুষ সেই সব কিছুর প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি সাধারণ মানুষকে সাম্যের কথা ও কতকগুলি সরল সামাজিক ন্যায়-নীতির কথা শুনিয়েছিলেন। সেই মানুষটির ওপর অলৌকিকত্ব আরোপ ও তাঁকে

ঈশ্বরের অবতার বলে প্রচার করলে আপামর জনসাধারণ তাতে আকৃষ্ট হয়। মনে রাখতে হবে, সেই সময় সাধারণ মানুষের, ভূত, প্রেত, জাদু, রূপকথা, পরী, দেবদূত যমদূত ইত্যাদিতে গভীর বিশ্বাস ছিল। অনেকে এইসব স্বচক্ষে দেখেছে বলেও দাবি করতো, সুতরাং ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার মাটিতে নেমে এসে মানুষের রূপ ধরে হেঁটে বেড়াবে, এটা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হত না। আরব দেশে যখন দলাদলি উঠেছিল চরমে, বিভিন্ন প্রতীক পূজক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা উপজাতিগুলি নিজেদের মধ্যে হানা-হানি করে শক্তি ক্ষয়ে মেতেছিল, তখন একজন বাস্তবজ্ঞানী মানুষ এঁদের সংঘবদ্ধ করার জন্য এক নিরাকার ঈশ্বরের বাণী শোনান, এদের এক পতাকার তলায় আনতে চান। প্রতিবেশী জুডাপন্থী ও যীশুপন্থীদের মতন এই আরবদের কোনো গ্রন্থ ছিল না, ইনি তাদের দিলেন নেই গ্রন্থ। অসাধারণ দূরদৃষ্টির জন্য ইনি মহাপুরুষ।

ইতিহাসের এক একটি সন্ধিক্ষণে পৃথিবীর অন্যত্রও এরকম ঘটেছে অনেকবার। এই সব মহাপুরুষেরা নিজেরাই নিজেদের দেবপ্রভ কিংবা ঈশ্বর মনোনীত বলেছিলেন, না পরবর্তীকালে ভক্ত-শিষ্যরা তাঁদের ওপর এই পরিচয় চাপিয়ে দিয়েছিল, তা আর জানবার উপায় নেই। তবে, এটুকু জানা যায় যে মঠ-মসজিদ-গীর্জাগুলি পরবর্তীকালে সৃষ্টি, এই সবের যারা পরিচালক ধর্ম তাঁদের কাছে কোনো পবিত্র আচরণীয় ব্যাপার নয়। ধর্ম তাদের একটি লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসার মূলধন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস প্রবণতা, এই ব্যবসায়ীদের খাওয়া-পরার চিন্তা করতে হয় না। অন্যান্য আরামের উপকরণও জুটে যায় প্রচুর। এমনকি অনেক সময় এরা রাজা বাদশাদের মুকুট নিয়েও ছিনিমিনি খেলেছে।

অনেকের মতেই হিন্দু ধর্মটি কোনো ধর্মই নয়। একটি দর্শন, এবং কতকগুলি সংস্কারের বন্ধন একে ধরে রেখেছে। বেদ নামে চার খণ্ডের একটি বইকে যে কেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলা হয় তা আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আজও বুঝি না। অবশ্য, আমার অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদকে পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি নামক কাব্য সংকলনের সঙ্গে তুলনা করে গেছেন অনেক আগেই। আমি সংস্কৃত জানি না, তবে বাংলা অনুবাদে বেদ পড়েছি একাধিকবার। যে-সব কবি বা ঋষি এই শ্লোকগুলি রচনা করেছেন, তারা ছিলেন টোটেম-উপাসক। অগ্নি, সূর্য,

সোম, পর্জন্য, বরুণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির নামে শ্লোক অসংখ্য। বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র, ইনিও মূলত একটি টোটেম, আদি অর্থে ইনি ইরা বা অন্ন দান করেন, মেঘ অথবা শষ্যবীজ বিদীর্ণ করেন। অর্থাৎ বৃষ্টি, কর্ষণ ও ফসলের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক। ক্রমে ক্রমে ইনি অবশ্য বিচিত্রকর্মা একটি চরিত্র হয়ে ওঠেন, এঁর স্তুতির মধ্যে এক জায়গায় এঁকে পিতৃহন্তা বলেও বন্দনা করা হয়েছে। "হে ইন্দ্র, তুমি ভিন্ন কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে?" এই সব শ্লোকের অবশ্য রূপক ব্যাখ্যা করার চেষ্টার অন্ত নেই।

নানারকম দেবতাদের অদ্ভুত কীর্তিকলাপ, বৈষম্য মূলক আচরণ (সূর্যপত্নী সংজ্ঞা ও সূর্যের কোনো এক সময় ঘোড়ার রূপ ধরে নাসিকা দিয়ে রমণ, যম কর্তৃক সংমা-কে লাথি মারতে যাওয়া, মাতা কর্তৃক পুত্র ত্যাগ, যেমন অদিতি ও মার্তণ্ড, সূর্য আর যম কখনো অভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আবার যমের দুটি কুকুর চন্দ্র-সূর্য হয়ে যাচ্ছে) এই সবের মধ্যে মানুষের নৈতিক জীবন উন্নত করার কোনো কথা নেই। নিরাকার একেশ্বরে কথা আছে একমাত্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, কিন্তু অনেক পণ্ডিতেরই মত এই যে, ঐ দশম মণ্ডলটি ভাষার তফাতের জন্য, অনেক পরবর্তীকালের রচনা, এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

মনুসংহিতা নামে হিন্দু সমাজের আর একখানি অর্বাচীন গ্রন্থ আছে। এরকম একটি নীরস, প্রতিক্রিয়াশীল, কাপুরুষোচিত, কুসংস্কারগ্রস্ত রচনাকে যে সঙ্গে সঙ্গেই বর্জন করা হয়নি, তাতেই হিন্দু সমাজের মানসিক দৈন্য ও ব্যাধি সূচিত করে। বর্ণাশ্রম প্রথা যে এককালের গৌরবময় আর্য ভারতের ধ্বংস ডেকে এনেছে, তা আজও অনেকে মানতে চান না দেখে বিস্ময় লাগে।

আদি-মধ্য যুগের গ্রামীণ সভ্যতার যে সব নীতিকথা ধর্ম নামে চলেছিল, তৎকালীন পরিবেশে সেগুলির মহৎ ভূমিকা ছিল নিশ্চিত। কিন্তু একালেও যদি কেউ নির্বিচারে, অন্ধ বিশ্বাস বা ভক্তিতে সেগুলি মান্য করে চলে, তা হলে আমি তাদের সংস্কারের ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। ইতিহাস থেকে মানুষকে শিক্ষা নিতে হয়, শিল্প-বিপ্লব ও পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞান মানুষকে যুক্তিবাদী হতে শিখিয়েছে। যুক্তি দিয়ে আমরা এখনো অসীম বিশ্বের কূলকিনারা পাইনি তা ঠিক, মানুষের জীবনে একটা রহস্যবাদ হয়তো চিরকালই থেকে যাবে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে এগোতে এগোতে যখন কোনো দেয়ালের কাছে এসে আটকে যাই, তখনই সেই দেয়ালের সামনে

হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়া কিংবা সেই দেয়ালটাকেই চরম মনে করে হার স্বীকার করা মানুষের চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। একটার পর একটা দেয়াল ভেঙে এগোনোই মানুষের নিয়তি।

এই পৃথিবী ও বিশ্বের, এমনকি মানুষের শরীর ও মন নামক বিচিত্র বস্তুটির অনেক রহস্যের সন্ধান আমরা এখনো জানি না! কিন্তু যুক্তি দিয়ে মানুষ এইটুকু অন্তত নিশ্চিত বুঝেছে যে অন্তরীক্ষে ঈশ্বর নামে এক সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব কল্পনা করা নিছক বাতুলতা। ঈশ্বরই নেই, তবে তাঁর আবার পুত্র-কন্যা বা অবতার-অনুগৃহীত কী? যেসব জ্ঞানী মানুষ সাধারণের ঊর্ধ্বে উঠে মানব সমাজের মঙ্গলের কথা বলেছেন, তারা শ্রদ্ধেয় কিন্তু অতি মানব হতে পারেন না। গত শতাব্দীতে কার্ল মার্কস মানুষের মঙ্গল ও মুক্তির সবচেয়ে নতুনতম তত্ত্ব দিয়েছেন। সেজন্য তাকে তো ঈশ্বরের পুত্র সাজতে হয়নি। তিনি অবশ্য ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। আমেরিকার টিভিতে আমি উচ্চশিক্ষিত পাদ্রীকে দৃপ্ত কণ্ঠে বাইবেলের সমর্থনে বলতে শুনেছি যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র ছ'হাজার চার বছর আগে। ডারউইন ভ্রান্ত! এর নাম শিক্ষা? হিন্দু মৌলবাদীদের যুক্তি বিবর্জিত উক্তির মধ্যে সর্বক্ষণ প্রতিফলিত হচ্ছে হিংসা। কোরাণ সম্পর্কে গোঁড়ামির দৃষ্টান্তও অনেক দেখেছি, কিন্তু সে সম্পর্কে কিছু বলতে সাহস করি না।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার প্রায় সম সময়েই আমি আত্মার অস্তিত্ব, স্বর্গ-নরক, ভূত, ভগবান ও ধর্মটর্মের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনেও স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমি নিজেই নিজের প্রভু, আমার নিয়তি আমার ডান হাতে ঠিক হয়। গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের মতনই আমি নিজের জীবন সৃষ্টি করে চলেছি। মৃত্যু ছাড়া আমার সম্মুখে বাধা হিসেবে আর কিছুই নেই। এই চিন্তাই এক চমৎকার মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। পাপের ভয় নেই বলে পুণ্য লোভও নেই। আমার প্রতি অন্যের কাছ থেকে আমি যে-রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করি, অন্যের প্রতিও আমি সেইরকম ব্যবহারই করতে চাই, এই পারস্পরিক সাম্যের মনোভাবই আমার মতে মানবধর্ম।

জীবনকে যা ধারণ করে থাকে, তাই-ই নাকি ধর্ম। এটা মোটেই সত্য নয়। প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলি কতকগুলি বহুকথিত সংস্কারের পুনরুক্তি মাত্র, আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে তার প্রায় কোনো যোগই নেই। পৃথিবীর

সমাজতন্ত্রী দেশ সমূহে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানব সমাজ ধর্ম ও ঈশ্বর বর্জন করে দিব্যি বেঁচে আছে। সমাজতন্ত্রী দেশগুলি সম্পর্কে আর যাই-ই সমালোচনা করা হোক না কেন, একথা মানতেই হবে যে সে সব দেশে চুরি-ডাকাতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংখ্যা খুবই কম, নৈতিক জীবনেও তারা যথেষ্ট উন্নত। জীবনকে যা আসলে ধারণ করে রাখে তার নাম ভালোবাসা। কোনো ধর্মেই ভালোবাসার স্থান নেই।

অল্প বয়সে ট্রামে যাবার সময় দেখতুম একদল বয়স্ক লোক ঠনঠনের কালীবাড়ি এলেই প্রায় যন্ত্রের মতন হাত দুটি তুলে কপালে ঠেকাতো। তখন আমি ভাবতুম, এই জেনারেশনের মানুষেরা পৃথিবী থেকে চলে গেলে এই যান্ত্রিক ভক্তিটক্তির ব্যাপারগুলোও উঠে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এতদিন পরেও দেখি যে ট্রামে-বাসে ঠিক ওইরকম একদল মানুষ এখনও রয়ে গেছেন, প্রায় একই রকম চেহারা, হয়তো ধুতির বদলে প্যাণ্ট শার্ট পরা, মন্দির দেখলেই হাত তুলে প্রণাম করছেন। শুধু তাই নয়, দেবালয়গুলিতে যুবক-যুবতীরাও বহুসংখ্যক যায়। ঈদের নমাজে নামাজীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক। গুরুবাদ এখন বেশ ফ্যাশানেবল, মিথ্যের কারবারি জ্যোতিষীদের চলেছে রমরমা, তারকেশ্বরের দিকে অবিরল ভক্তের স্রোত। মার্কসবাদের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে গুরুবাদ, ভক্তিবাদ, বারোয়ারি পুজো, তাবিচ-কবচ-আংটির প্রতি আসক্তি এসবও কী করে বাড়ছে, এ এক বিরাট বিস্ময়! আমরা আশা করেছিলাম, স্বাধীন ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতবর্ষে ধর্ম শুধু বিশ্বাসী মানুষের নিজ গৃহে আচরণীয় বিষয় হয়ে থাকবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিষিদ্ধ করা হবে, তা হয় নি।

ধর্মের নামে উস্কানি, প্ররোচনা, পারস্পরিক ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আজও থামে নি।

বেশির ভাগ মানুষই কি তাহলে স্বাধীন থাকতে চায় না?

৮

বাংলা সন-তারিখ-মাসের সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনো যোগ নেই এখন। টাকা পয়সার লেনদেন, অফিসের মাইনে, ছুটি, ভ্রমণ এ সবই ইংরেজি মতে হয়। সুতরাং বাংলা মাসের হিসেবের দরকারও তো নেই। এমনকি এ বছর দুর্গা পুজো কবে জিজ্ঞেস করলে যে-কেউ বলবে অতই অক্টোবর।

আমাদের স্বাধীনতা হয়েছিল ১৫ আগস্ট, সেটা কত বাংলা তারিখে তা ক'জন জানে তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু এ-দেশের অধিকাংশ শিশুদের জন্ম তারিখ অবশ্য বাংলায় লিখে রাখা হয়। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনে অবশ্য এখনো কোনো রহস্যময় কারণে, যদিও সর্বসাধারণের সুবিধের জন্য নেমন্তন্নর কার্ডে ইংরেজি তারিখটি দেওয়া থাকে যথারীতি। জন্মতিথির হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর আমাদের জন্ম তারিখ বদলাবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইংরেজি কায়দা অনুযায়ী আমরা ইংরেজিতেই নির্দিষ্ট জন্ম তারিখ ঠিক করে ফেলেছি আজকাল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনটিই ২৫শে বৈশাখের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেছে।

বিয়ে পৈতে-শ্রাদ্ধর নেমন্তন্নতে আমি বিশেষ যাই না বলে গত এক বছরে তারিখ বিষয়ে সচেতন হবার তেমন সুযোগ হয়নি। তবে বাংলা মাস ও ঋতুর এখনো বলতে গেলে একচ্ছত্র আধিপত্য আছে এক জায়গায়, বাংলা কবিতায়। সেখানে এখনো কাল বৈশাখীর বদলে মারচ মাসের ঝড় আসেনি। আশ্বিনের শাদা মেঘের বদলে সেপটেমবরের আকাশ বললে ঠিক ছবি ফোটে না, কোজাগরি পূর্ণিমা ঠিক কোন মাসে হয় খেয়াল না থাকলেও কবিরা ঐ রকমই লেখেন, জ্যৈষ্ঠের দুপুর না লিখলে ঠিক খাঁ খাঁ গরম বোধ হয় না। ইংরিজি মতে তো হেমন্তকাল বলে কিছু নেই-ই, কিন্তু বাংলায় আছে। সুতরাং কবিতা পড়বার বা লেখবার সময় বাংলা মাস ও ঋতুর কথা আমারও মনে পড়েছে বারবার। এ রকম বর্ণনায় অবশ্য রসাভাসও ঘটে মাঝে মাঝে। বাংলা বর্ণনায় 'চৈত্রের রুক্ষ প্রান্তর' এরকম বর্ণনা লেখা হচ্ছে অনেক কাল থেকে, এখনো লেখা হয়। ছবিটা হচ্ছে এই,

ফসল কাটা হয়ে গেছে, নতুন ফসল বোনা হয়নি, এমন অবস্থায় পড়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত জমি। কিন্তু ট্রেনে করে বর্ধমানের মধ্য দিয়ে যাবার সময় দেখি, ঐ সময়ে দু' পাশের মাঠে সবুজের ঢেউ খেলছে। ইরিগেশনের কল্যাণে যে চাষের সময় ওলট পালট হয়ে গেছে, তা অনেকের খেয়াল নেই। 'বাঘের থাবার মত মাঘের হিমানী' লিখেছিলেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু ইদানীং প্রায়ই আর মাঘ মাসে লেপ গায়ে দিতে হয় না। এ বছর মাঘে পাখা খুললে ভালো হতো; বরং শীত পড়লো ফাল্গুনের শেষে।

গত বছর আমি দুবার মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। একবার এখানেই, একবার পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। অশ্লেষা মঘার কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা জানি না। তবে দু' বারেই তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মতন মৃত্যু আমায় বলেছিলেন, এখন বিশেষ ব্যস্ত আছি, তবে আপনার নাম লিখে রাখছি, যথাসময়ে দেখা হবে।

আরও একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো গত বছর, তাঁর নাম সাতচল্লিশ। আগে ভদ্রলোকের সম্পর্কে ভুল ধারণা ছিল। ভেবেছিলুম উনি হবেন বিষণ্ণ কিংবা নিরুদ্যম কিংবা ভাঙাচোরা স্বাস্থ্যের কিংবা নৈরাশ্য-আক্রান্ত। কিন্তু সাতচল্লিশ সে রকম নন, একটু গাম্ভীর্য মাখানো হলেও সুরসিক, বেশ মজবুত চেহারা এবং মাথা ভরতি অনেক পরিকল্পনা। আমি একটা দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়েছিলুম, তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় বললেন, ইতস্তত করছেন কেন! উঠে আসুন। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি, এখনো অনেকটা দূরে যেতে হবে তো! ওঁর সঙ্গে খানিকটা যাবার পর উনি আর একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, তাঁর নাম আটচল্লিশ।

বেশ কয়েকটি পাহাড়ের সঙ্গেও পরিচয় হলো এই এক বছরে। একটি পাহাড় ওড়িশায়, একটি পাহাড় মধ্যপ্রদেশে একটি পাহাড় ইওরোপে, একটি ক্যানাডায়। মধ্যপ্রদেশের পাহাড়টির সঙ্গে ক্যানাডার পাহাড়টির শুধু এই-টুকুই তফাৎ যে দ্বিতীয়টিতে বরফ জমে। ওড়িশার পাহাড়টিতে উঠেছিলুম জিপে, ইউরোপের পাহাড়টিতে আরও আরামদায়ক গাড়িতে, মধ্যপ্রদেশের পাহাড়টিতে পায়ে হেঁটে আর ক্যানাডার পাহাড়টিতে বিদ্যুৎ চালিত চেয়ারে। ভারতের প্রায় সব পাহাড়ের ওপরেই একটা মন্দির থাকে, পাশ্চাত্যে কিন্তু অত উঁচুতে গীর্জা বানায় না। ধর্মের জন্য অত কষ্ট ওরা দাবি করে না।

ক্যানাডার পাহাড়টির নাম ব্যানফ, ভারি চিত্ররূপময় জায়গাটি, ওপরে শুধু খাবার জায়গা, শখের জিনিসপত্তরের দোকান আর দৃশ্য দেখবার ব্যবস্থা। পাশের জঙ্গল থেকে কয়েকটি বুনো ভেড়া সেখানে ছিটকে চলে এসেছে, লোকেরা তাদের আদর করে খাবার দিচ্ছে, কেউ তাদের খাদ্য বানাবার জন্য মারতে ছুটলো না।

ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ইওরোপ বা ক্যানাডার যে-কোনো পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালেই কিন্তু আকাশটাকে একই রকম দেখায়।

গত বছর বেশ কয়েকটি জঙ্গলও দেখা হলো।

কোনো জঙ্গলই একবার কেন, পাঁচবার দেখলেও ঠিক চেনা যায় না। কোনো জঙ্গলের সঙ্গে বেশি ভাব হয়ে গেলেও আর বেশি ভালো লাগে না। একটু ছমছমে রহস্যময় থাকাই জঙ্গলের মূল আকর্ষণ। সেই হিসেবে সুন্দরবনকে কক্ষণো ঠিক চেনা যায় না। বিশেষত আমাদের মতন শহুরে মানুষের পক্ষে। রাত্তির বেলা সপ্তমুখী নদী ধরে ভয়াল জঙ্গলের পাশ দিয়ে নৌকো চড়ে যাওয়া, কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু সেই নির্জনতার অঙ্গ হিসেবেই মাঝে মাঝে ট-র-র-র,ট-র-র-র করে একটা রাত পাখির ডাক। গরমের জন্য ছই-এর বাইরে এসে হাওয়া খাচ্ছিলুম, মাঝি বললো, বাবু কার্তিক মাসের হিম লাগাবেন না। কলোরাডোর জঙ্গল তেমন গা ছমছমে নয়, বরং বেশি নয়ন শোভন, তবু সেখানে ঘুরতে ঘুরতে পথ-প্রদর্শকটি যখন হঠাৎ বললো, সাবধান, এই সময় কিন্তু র‍্যাট্‌ল সাপ বেরোয়…তনখ আমার ঐ সুন্দরবনের মাঝিটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

প্রত্যেকটি নতুন নদী দেখারই একটা বিশেষ আনন্দ আছে। ব্রহ্মপুত্র এক রকম লাগে, মিসিসিপি অন্যরকম। তবে জঙ্গলের মাঝখান-চেরা নদী দেখলে আমার বুকের মধ্যে কিছু একটা লাফিয়ে ওঠে। সে-রকম কোনো নদীর ধারে শেষ বিকেলের নরম আলোয় দাঁড়ালে আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, আঃ, বেঁচে থাকা কী সুন্দর!

৯

আমার জন্ম জলের দেশে। খুব ছোটবেলায় আমি বড় কোনো জঙ্গল দেখিনি। কৈশোরে কলকাতা শহরে এসে এত মানুষের জঙ্গল দেখে হকচকিয়ে গেছি।

আমি প্রথম মনোহরণ অরণ্য দেখি সাঁওতাল পরগণায়। ইস্কুলের গণ্ডি পেরুতে না পেরুতেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই ছুটে গেছি সিংভূম, মানভূমের নানান ছোট ছোট জায়গায়। ধলভূম গড়, গালুডি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে খানিকটা গেলেই চোখে পড়তো শাল-মহুয়া-সেগুনের ঘন বন, তেমন বিখ্যাত কিছু না, কিন্তু একবার ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। কুসুম নামে যে কোনো বড়সড় গাছ থাকতে পারে, তা আমার ধারণাতেই ছিল না। কোনো বইতেও আগে পড়িনি, সে গাছ প্রথম দেখি সাঁওতাল পরগণায়। চাইবাসাকে কেন্দ্র করে অনেকবার গেছি হেসাডি, টেবো, বরাইবুরু, একবার কারো নামে একটি নদী দেখতে পেয়ে মনে হয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে সেই নদীটিকে আমরাই প্রথম আবিষ্কার করলুম। ছোট ছোট টিলার গায়ে মাখা জঙ্গল, লাল রঙের পাকদণ্ডি, অপ্রত্যাশিত সুখবরের মতন হঠাৎ হঠাৎ একটা ঝর্ণা, এই জায়গাগুলিকে মনে হতো বড় আপন, বড় মাদকতাময়। নির্জন ফরেস্ট বাংলোগুলিতে অনাহূত ও রবাহূত হয়ে উঠে পড়েছি প্রায় জোরজার করে, কখনো হোমরা চোমরাদের আগমনে শয্যাচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিয়েছি চৌকিদারের ঘরে। এমনকি এক গ্রীষ্মে সরাসরি জঙ্গলের মধ্যে গাছতলায় রাত কাটাবার সৌভাগ্যও ঘটে গেছে, সে জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব ছিল না অবশ্য, ভাল্লুক ও হাতির পাল সম্পর্কে অনেক গুজব শোনা গেছে। কিন্তু তারা সশরীরে এসে জ্বালাতন করেনি। মনেই পড়েনি সাপের কথা। সেই একটা বয়েস, যখন মৃত্যুকে মনে হয় খেলার সঙ্গী।

পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত তরাই অঞ্চল উত্তর বাংলায়, আর কলকাতার খুব কাছেই ভুবনবিদিত সুন্দরবন। কিন্তু আমি বিহার-উড়িষ্যার প্রচুর জঙ্গল

চষে বেড়ালেও পশ্চিম বাংলার এই দুই অরণ্য আমার দেখা হয়নি অনেকদিন। স্বাধীনতা অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের পর উত্তরবঙ্গ বেশ দুরধিগম্য হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় বা দু'এক দার্জিলিং যাবার অভিজ্ঞতা মনে আছে। বড় ট্রেনে মনিহারি ঘাট, তারপর ফেরিতে গঙ্গা পার, তারপর ওপারে নেমেই বালির ওপর দিয়ে মালপত্র সমেত দৌড়োতে হতো মিটার গেজের ট্রেনে জায়গা দখল করার জন্য। শিলিগুড়িতে নেমে আবার দেশলাই-এর বাক্সের মতন ছোট ট্রেন। তখন এত বেশি ট্যাক্সি-মিনিবাসের চল ছিল না ওদিকে। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে মোড় নেবার সুযোগ হয়নি একবারও, কারণ চেনাশুনো না থাকায় কোথায় রাত্রিবাস করবো, কীভাবে জঙ্গলে ঘুরবো, তার কোনো হদিশ জানা ছিল না। আর সুন্দরবন এত কাছে হলেও কলকাতার খুব কম লোকেই নিছক বেড়াবার জন্য সুন্দরবন যাওয়ার চিন্তা করতো তখন। সুন্দরবন নামটা শুনলেই নরখাদক বাঘ, কুমীর ও সাপের ছবি ভেসে উঠতো এবং গোটা সুন্দরবনে তখন কোথাও বাইরের লোকের কোনো থাকবার জায়গা ছিল না। ক্যানিং শহরটি সারা রাত জেগে থাকে। এই কথা শুনে আমরা একবার দলবেঁধে ক্যানিং-এ গিয়ে সারা রাত্রির মাছের বাজারে ঘুরেছি। সকালবেলা স্টিমার ঘাটে দাঁড়িয়ে প্রবল মাতলা নদীর দিকে তাকিয়ে সুন্দরবনের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি দীর্ঘশ্বাস।

বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাস পড়ে আমি পূর্ণিয়ায় গিয়েছিলাম সেই অরণ্য দেখতে। কিন্তু কোথায় সেই লবটুলিয়া? পূর্ণিয়ার ধারেকাছে কাছে গভীর জঙ্গল নেই। বিভূতিভূষণের অরণ্যটি বোধহয় অনেকখানিই কাল্পনিক, সেই জন্যই ঐ উপন্যাসের গাছপালার চেয়েও মনুষ্যচরিত্রগুলিই আমাদের মনে বেশি দাগ কেটে যায়। ভিকি বাম-এর লেখা গ্রীন ম্যানসন-এর অরণ্যের অনুভূতি আমি প্রথম পাই আসামে গিয়ে। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার আগে গোটা আসাম রাজ্যটাই যেন ছিল অরণ্যময়। কাজিরাঙা-র মতন নামজাদা জঙ্গলের চেয়েও আমার বেশি ভালো লাগতো পাহাড়ী রাস্তার দু'ধারে নামহীন বিস্তীর্ণ অরণ্য। শিলচর শহর থেকে লামডিং যাবার ছোট ট্রেনে বসে দু'দিকে অরণ্য দেখতে দেখতে প্রথম শরীরে অনুভব করেছিলাম অকৃত্রিম আদিমতার শিহরণ। জাটিংগা নামের একটি দুর্দান্ত স্রোতস্বিনী নদীর কাছেই হারাংগাজাও নামে একটি ছোট্ট স্টেশন। তার মাঝামাঝি অকারণে দাঁড়িয়ে গেছে ট্রেন। দু'দিকে সবুজ অরণ্যের ঢেউ,

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, কোনোদিন যেন ওখানে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। ইচ্ছে করছিল, ট্রেন থেকে নেমে দৌড়ে চলে যাই।

সংরক্ষিত অরণ্যগুলির মধ্য মানস-এর তুলনা নেই। বরপেটা রোড ধরে এসে জঙ্গল এলাকায় ঢোকার পরেই দু' পাশে অজস্র কাঞ্চন ফুলের গাছ। যেন একটি কাঞ্চন সরণি। সাদা কাঞ্চন আমার প্রিয় ফুল। আমি প্রথম যে-বার মানসে যাই সেবারে আসামে কিছু একটা গোলযোগ ছিল। সেই জন্য আমি ছাড়া আর কোনোও যাত্রী ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে আমি পেঁছেছিলাম জঙ্গলের অভ্যন্তরের বাংলোয়। সে অভিজ্ঞতার কথা আমি অন্যত্র লিখেছি। এই মানসেই আমি প্রথম চিড়িয়াখানার বাইরে বাঘের ডাক শুনতে পাই, খুব কাছ থেকে। যদিও চোখে দেখা যায়নি। এখানেই প্রাতঃভ্রমণকারী একা একটি বিশাল হাতিকে দেখে কিপলিং-এর উপন্যাসের হাতি-চরিত্রটির কথা মনে পড়েছিল। মানসের আর একটি বৈশিষ্ঠ্য হলো এই যে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সেখানে আবার গেলেও একটুও হতাশ হতে হয় না, বড় বড় বৃক্ষের আন্দোলিত শিখর, ময়ূর ও ধনেশ পাখির ডাক মনে হয় অবিকল একই রকম আছে। বহু দূর বিস্তৃত ঘাস বনে হরিণের পালের আন্দোলন দেখে দেখে তৃষ্ণা মেটে না। কালের হস্তাবলেপ মানসের রূপ বিশেষ ঝরাতে পারেনি।

সে কথা কিন্তু হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক কিংবা বেতলা সম্পর্কে খাটে না। কয়েক বছর অন্তর অন্তর ঐ সব জায়গায় গেলে পুরোনো চেনাশুনো অনেক গাছ দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ইদানীং কেমন যেন বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক ভাব। ছুটির দিনে বাস বাস ভর্তি লোকজন আসে, তারা মাইকে তারস্বরে হিন্দী গান বাজায়, পিকনিক করে, কয়েকটা পোষা হরিণ দেখার পর তারা রেডিমেড বাঘ কিংবা হাতি না পেয়ে অতিশয় বিরক্ত হয়।

উত্তরবঙ্গ সুগম হয় ফরাক্কায় সেতু তৈরি হবার পর। তার কিছু আগে আমি উত্তরবঙ্গে প্রথম যাই চা-বাগানের সূত্রে। লঙ্কাপাড়া টি এস্টেটটি একেবারে ভুটান সীমান্তে, খাড়া প্রাচীরের মতন পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে এক ঝটিকার মতন নদী, স্থানীয় নাম পাগলিনী। চা-বাগান সংলগ্ন প্রচুর জমিতে জলা-জঙ্গল হয়ে আছে। মধেশিয়া বস্তির পাশ দিয়ে মাঝ-রাতে চলে যায় হাতির পাল। ভুটান পাহাড় থেকে শুধু পাগলা ঝোরা

বা হাতির পালই আসে না, নেমে আসে কাজের খোঁজে গরিব নেপালীরা। তারা চা-বাগানের কিনারায় কিংবা সরকারি খাস জমিতে ঝোপড়ি বানিয়ে কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকে। জঙ্গলের কাঠ-পাতার ওপর জীবিকা নির্বাহ করে। জ্যোৎস্না রাত্রে বারান্দায় বসে দূরের সেই নেপালী বস্তিগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে সেই চা-বাগানের ম্যানেজার বলেছিলেন, দেখবেন, এদিকে নেপালীদের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়ছে, শিগগিরই একদিন ওরা নেপালীস্থান দাবি করবে।

চা-বাগানে বছরের পর বছর চাকরি করতে কেমন লাগে তা আমি জানি না, তবে দিন সাতেকের জন্য বেড়াতে যাবার জন্য এমন আদর্শ স্থান আর হয় না। চা-গাছের উচ্চতা একবুক, মাঝে মাঝে থাকে লম্বা লম্বা শেড টি। এই কাননে দু'বেলা ভ্রমণ করলে চোখ ও মস্তিষ্কের বড় আরাম হয়। আমি তিন চারটি চা-বাগানে কয়েকবার গেছি, এখনও সুযোগ পেলেই যেতে ইচ্ছে করে।

প্রথম প্রথম গিয়ে পুরো উত্তর বাংলাটাই অরণ্যময় মনে হতো। জলদাপাড়া, গোরুমারা ইত্যাদি নাম করা জঙ্গল তো আছেই, তাছাড়াও আরও কত জঙ্গল। এ যেন বাংলার এক নতুন রূপ। কলকাতা-কেন্দ্রিক সমতলের বাঙালীরা এই রূপটা খুবই কম জানে। বাংলা সাহিত্যেও এইসব জঙ্গল নিয়ে তো প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। বিভূতিভূষণও বাংলার অরণ্য নিয়ে কিছু লেখেননি। জিম করবেট উত্তরবঙ্গ কিংবা সুন্দরবনে আসেননি, বিহার পর্যন্ত এসে ফিরে গেছেন। তাই তাঁর অনবদ্য শিকার-কাহিনীগুলিতে বাংলার কোনো স্থান নেই।

আমি একবার বাসেচেপে মাদারিহাট যাচ্ছি, হঠাৎ বাসটা থেমে গেল। কেন? না, সামনেই তিনটি বুনো হাতি রাস্তা পার হচ্ছে। ওখানে এমন প্রায়ই হয়। আর একবার গিয়েছিলাম জয়ন্তী নামে একটি ছোট্ট জায়গায়, আলিপুরদুয়ার থেকে ছোট ট্রেন। মাঝখানে একটি স্টেশনের নাম রাজা-ভাত-খাওয়া। একজন সহযাত্রী বললেন, মাঝে মাঝে হাতির উপদ্রবে এখানকার স্টেশনমাস্টার ও অন্যান্যরা সন্ধের পরই পালিয়ে যান। ট্রেন লাইনটি শেষ হয়ে গেছে জয়ন্তী-তে এসে। আমরা সাধারণত জানি যে ট্রেন লাইন একটা বড় স্টেশনে শুরু হয়ে দূরের আর একটা কোনো বড় স্টেশনে শেষ হয়। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ট্রেন লাইন যে ফুরিয়ে যায়, তা আগে ধারণা ছিল না। স্টেশনটির

অদূরে একটি পায়ে হেঁটে পার হবার মতন ঝর্না, তার ওদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর এগোতেই দুম দুম করে শব্দ পাওয়া গেল। গুলির নয়, বোমার। আমার সঙ্গী আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আর এগোনো ঠিক হবে না, হাতির পাল বেরিয়েছে।

জানলুম যে বক্সাইট না ডলোমাইট কী যেন আনতে ঐ জঙ্গলের মধ্যে লরি ঢোকে। সামনে বুনো হাতির পাল এসে গেলে পটকা ফাটিয়ে তাদের ভয় দেখনো হয়। সেখানে তখন প্রচুর হাতি। প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাই প্রকৃতীশ বড়ুয়া ওয়ফে লালজী, যিনি হাতি বিক্রির ব্যবসা করেন, তিনি বাচ্চা হাতি ধরার জন্য কাছেই ক্যাম্প করে আছেন। আমি ভাবলুম, বাঙালীর জীবনে যদি হাতির এতখানি ভূমিকা থাকে, তাহলে হাতি নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি কেন? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি পোষা হাতির গল্প ছাড়া আর তো উল্লেখযোগ্য কিছু মনে পড়ে না।

জয়ন্তীর কথা আর একটি কারণে মনে আছে। ওখানেই আমি প্রথম তক্ষক দেখি। ছেলেবেলা থেকে তক্ষকের ডাক শুনে আসছি। কিন্তু এই প্রাণীটি বড়ই গোপন সঞ্চারী, সহজে দেখা যায় না।

এখন উত্তর বাংলায় গেলে মনটা হু-হু করে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ভাব। সেই নিবিড় লতাগুল্মময় বনরাজি কোন চুলোর গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে? কুচবিহার থেকে একবার চিলাপাতার জঙ্গলে গিয়ে যে প্রগাঢ় বাঙ্ময় নিস্তব্ধতা অনুভব করেছিলাম বহুক্ষণ ধরে। কয়েক বছর পরে সেখানে ফিরে গিয়ে তা কিছুই পেলাম না। শোনা গেল শুধু কাট কাটার একটা বিশ্রী শব্দ।

বাঁকুড়া-মেদিনীপুরেও এখানে সেখানে ছড়ানো অনেক জঙ্গল দেখেছি। এখন কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে জঙ্গল বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। কিছুদিন আগে একবার মুকুটমণিপুর থেকে যাচ্ছিলাম ঝিলিমিলির দিকে। পথের দু'পাশে দেখি সার বেঁধে অগণন নারী-পুরুষ আসছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় কাঠের বোঝা। তারা জঙ্গল খালি করে আসছে। বাধা দেবার কেউ নেই। প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল, মনে মনে আমিও জার্মানির গ্রীন ক্লাবের সদস্য। কোথাও কারুকে গাছ কাটতে দেখলেই ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু পরে মনে হলো, এরা গাছ কাটছে বাধ্য হয়ে। জঙ্গলের কাঠ এনে বিক্রি করাই এই জীর্ণ-শীর্ণ মানুষগুলির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, এদের ওপর রাগ করা যায় না।

অদূরদর্শী সরকার তো এদের জীবিকা কিংবা জ্বালানীর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করেনি।

একবার কারুকে কিছু না জিজ্ঞেস করে আন্দামান যাবার জন্য একখানা জাহাজের টিকিট কেটে ফেলেছিলুম। সেখান থেকে কোনো নেমন্তন্ন পাইনি। সেখানকার কারুকেই চিনি না। শুভার্থীরা জিজ্ঞেস করেছিল, হঠাৎ একা একা আন্দামান যাবে কেন? এর উত্তরে এভারেস্ট প্রসঙ্গে যে বিখ্যাত উক্তি আছে, 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার', সেটি বলতে ইচ্ছে করে। যদিও এভারেস্টের সঙ্গে আন্দামানের কোনো তুলনাই চলে না। তবু, বাঙালীর ছেলে আন্দামান দেখবো না কেন? জাহাজে আন্দামানের ভাড়াও এমন কিছু বেশি নয়, দিল্লি-বম্বে যেতে পারলে আন্দামান না যাবার কী কারণ থাকতে পারে? যারা কাশ্মীর কিংবা গোয়া বেড়াতে যায়, তারা আন্দামানের কথা চিন্তাও করে না। তাহারা কী হারাইতেছে তাহা তাহারা জানে না।

অবিভক্ত বাংলায় কত বিরাট সমুদ্র-উপকূল ছিল। তবু বাঙালী জাতি সমুদ্র-বিমুখ, একমাত্র সিলেটের খালাসীরাই যা সমুদ্র চিনেছে। পশ্চিম বাংলাতেই সমুদ্র তটরেখা কম নেই। তবু বাঙালীরা সমুদ্র দর্শনে ছুটে যায় পুরীতে। এখন দীঘা আর বকখালি টিমটিম করছে। তাও যারা সেখানে যায় তারা অনেকেই জলে নামে না। সমুদ্র-ভ্রমণ তো দূরের কথা। আর আন্দামান তো কালাপানির দূরত্বে।

বঙ্গোপসাগরের জল কিন্তু কালো নয় মোটেই, গাঢ় নীল। এমনই নীল যে মনে হয় রয়াল ব্লু কালির মতন, কলম ডোবালেই লেখা যাবে। জাহাজে যেতে চারদিন লাগার কথা, আমার বেলায় লাগলো পাঁচদিন। একদিনের প্রবল ঝড়ে জাহাজ এক জায়গায় ঠায় থেমে রইলো। আমারও বেশ বিনা পয়সায় মধ্য সমুদ্রে সাইক্লোন দেখার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের 'কর্তা কাপ্তেন কইছে ছাইক্লোন হ'তি পারে', এই লাইনটা মনে পড়ছিল বারবার। কিন্তু ভয় হয়নি। জাহাজ-ডুবির ঘটনা পৃথিবীতে এখন অতি বিরল। সেই ঝড় থামার পর ঝাঁকের পর ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ দেখেছিলাম।

আন্দামানের সৌন্দর্য শ্বাসরুদ্ধকর যাকে বলে। গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জ কিংবা ইটালির ক্যাপ্রির তুলনায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কোনো অংশে ন্যূন নয়। আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি এখানকার অরণ্য দেখে। আন্দামানের

জঙ্গল সম্পর্কে আমার আগে কোনো আন্দাজ ছিল না। আসামের জঙ্গল দেখে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল, তা বদলে যায় আন্দামানে এসে। মনুষ্যবর্জিত এক একটি দ্বীপের ঘন, দুর্ভেদ্য বন দেখে মনে হয়, এই বনই সত্যিকারের আদিম ও অস্পৃষ্ট। এব সব বন দেখে আরও রোমাঞ্চ লাগে, কারণ অধিকাংশ গাছই চিনি না। জলের কাছাকাছি মানগ্রোভ-এর ঝাড় চিনতে পারি। কিন্তু একটু গভীরে যে-সব বিশাল বিশাল মহীরুহ, সেগুলি আমার অদৃষ্টপূর্ব। পাহাড়ী-পাইন ছাড়া এত লম্বা গাছও আমি আগে দেখিনি।

নিকোবর বাদ দিয়ে শুধু আন্দামানেই দ্বীপের সংখ্যা দুশোর বেশি। সুপেয় জলের অভাবে অধিকাংশ দ্বীপেই মানুষের বসতি নেই। কিন্তু আকাশের জলে বৃক্ষ সংসার জমজমাট। একটি-দুটি দ্বীপে নেমেছি একপ্রকার গা ছমছমানি নিয়ে। পরিষ্কার বালিতে নানা রকম নুড়ি, ঝিনুক ছড়ানো, যা সবই সংগ্রহযোগ্য মনে হয়। পাশের জঙ্গল দিনের বেলাতেই অন্ধকার, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দেই ভয় লাগে। যদিও এই সব জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক নেই, বিষাক্ত সাপও নেই, কিন্তু জারোয়া নামে নিরাবরণ, অরণ্যচারী আদিবাসীদের সম্পর্কে অনেক রোমহর্ষক কাহিনী শোনা আছে। যারা সভ্য মানুষদের ঘোরতর অপছন্দ করে। আমি নিজেকে তেমন সভ্য মনে করি না। কিন্তু জারোয়ারা তা বুঝবে কী করে। আমার জামা-কাপড় দেখেই যদি তারা বিষাক্ত তীর মেরে দেয়?

নৌকোয় বা লঞ্চে বসেই এই সব দ্বীপ-জঙ্গলের শোভা দেখা নিরাপদ। অন্তত এই রকমই অবস্থা ছিল, আমি যখন যাই সেই সময়ে।

একদিন পোর্ট ব্লেয়ার থেকে লঞ্চ নিয়ে রঙ্গত নামে একটা দ্বীপে গিয়েছিলাম। সকালবেলা যাত্রা করে পেঁছেছিলাম প্রায় সন্ধের সময়, সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছে লঞ্চের ওপরে খোলা ডেকে। আন্দামানে যখন তখন বৃষ্টি আবার তার পরের মুহূর্তেই খটখটে রোদ। সুতরাং আমি পর্যায়ক্রমে বৃষ্টিতে ভিজেছি ও রোদে পুড়েছি। এই রকম কষ্টকর জার্নির মধ্যেও চোখ জুড়িয়েছে দু'ধারের দৃশ্য। সমুদ্র সেখানে মরুভূমির মতন ধু ধু নয়, একটু দূরে দূরেই ছোট বড় দ্বীপ। কোনো দ্বীপই নগ্ন নয়, গাছপালায় ঠাসা। মনে হয় যেন প্রকৃতির কুমারী-উদ্যান। একসঙ্গে এত নীল ও সবুজ রং আর কখনো দেখিনি।

যুক্ত দ্বীপটি বেশ বড়, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বাস চলাচল করে। অন্য প্রান্তের জাহাজঘাটার নামটি বড় সুন্দর, মায়া বন্দর। প্রগাঢ় বনানীর মধ্য দিয়ে একটিই মাত্র পথ। আমি কেন যেন মাঝপথে নেমে পড়েছিলাম। মাঝে মাঝে জঙ্গল সাফ করে উদ্বাস্তুদের বসতি, ধান জমি। ইস্কুল। আমি যেখানে নেমেছি, সেখানেও দু'চারখানা ঘর বাড়ি রয়েছে, পোষা কুকুরের ডাক শোনা যায়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেলাভূমিতে পেঁছে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। চার পা বাঁধা অবস্থায় একটা বিশাল হরিণ পড়ে আছে সেখানে। তখনও জীবন্ত। হরিণটির নিচের পায়ের দিকটা ডুবে গেছে জলে। শরীরের অর্ধেকটা বালির ওপর। জোয়ারের জল একটু একটু করে বাড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র ওপরে উঠে এসে হরিণটাকে গ্রাস করবে। আমাকে দেখতে পেয়ে হরিণটির দু' চোখের তারা কেঁপে উঠলো।

আন্দামানের কোনো কোনো বনে হরিণের সংখ্যা অজস্র। মূল ভূখণ্ড থেকেই কিছু হরিণ নিয়ে এক সময় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বাঘ নেই বলে হরিণদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়েছে। পোর্ট ব্লেয়ারে তখন হরিণের চামড়ার দাম তিন-চার টাকা, মাংসের কিলোর দামও ঐরকম। অন্যান্য দ্বীপে পয়সা দিয়ে কেউ হরিণের মাংস কেনে না। যেখানে উদ্বাস্তুরা চাষবাস করছে, সেখানে হরিণের পাল এসে ফসল নষ্ট করে। হরিণ একটা উপদ্রব। কোনো এক সময় কেউ একটা হরিণ মারলে সরকার থেকে একটাকা করে বখশিস দেওয়া হতো।

তবু হাত-পা বেঁধে একটি জীবন্ত হরিণকে জলে ফেলে দেওয়া হবে। এ দৃশ্য আমার কাছে অসহ্য বোধ হয়। আমি ছুটে গিয়ে একটি বাড়িতে ডাকাডাকি করে এক ভদ্রলোককে ঘটনাটি জানালুম। ভদ্রলোক আমার চাঞ্চল্য দেখেও গা করলেন না। বললেন, ঐ হরিণগুলো মহা হারামজাদা!

আমি আবার ফিরে এলুম বেলাভূমিতে। হরিণটির চোখের ভাষার মিনতি অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি চেষ্টা করলুম ওর সামনের পায়ের বাঁধন খুলে দিতে। কিন্তু কাজটা মোটেই সোজা নয়। আমার কাছে ছুরি-টুরি কিছুই ছিল না। হরিণটির মাথায় বড় বড় ডালপালার মতন ছড়ানো, ধারালো শিং, আমি কাছে যেতেই হরিণটি আরও ভয় পেয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। সে আমাকে উদ্ধারকারী হিসেবে চিনতে পারছে

না। আর একজন আততায়ী ভাবছে। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ তাকে গ্রাস করে নিয়ে গেল। আমার জীবনে সেটি একটি অবিস্মরণীয় মৃত্যু দৃশ্য।

ঐ রঙ্গত দ্বীপের জঙ্গলেই একদিন আচমকা গোটা তিনেক হাতি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। সে হাতিগুলো অবশ্য ঠিক বুনো হাতিও নয়, পোষাও নয়। মাঝামাঝি। এক সময় কোনো একজন কাঠ-ব্যবসায়ী বড় বড় কাঠের গুঁড়ি বহন করবার জন্য মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকগুলি হাতি নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তাঁর ব্যবসা ফেল পড়লে তিনি আর হাতিগুলো ফিরিয়ে আনার ঝামেলা নিতে চাননি। সেগুলোকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন। দু' এক পুরুষের মধ্যেই যে তারা আবার পুরোপুরি বুনো হাতি হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী!

আন্দামান ভ্রমণের দু' তিন বছর পর আমি প্রথম সুন্দরবনে বেড়াতে যাই। কলকাতার সবচেয়ে কাছে যে জঙ্গল সেখানে যেতে আমার এত দেরি হলো। পরিচিত একজনের সূত্রে একজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হলো। যে চাকরি বাকরি ছেড়ে সুন্দরবনে চাষবাসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। অবশ্য আগে থেকেই সাতজেলিয়া গ্রামে তাদের পারিবারিক জমি ও একটি বাড়ি ছিল। হ্যামিলটন সাহেবের কাছারি বাড়ি ছিল এই সাতজেলিয়ায়। সেখানে সেই আমলেই দু' একটি পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। সাতজেলিয়ায় আস্তানা গেড়ে সেখান থেকে নৌকো ভাড়া করে শুরু হয় সুন্দরবন পরিভ্রমণ।

সুন্দরবন এমনই একটি জঙ্গল, যেখানে পায়ে হেঁটে ঘোরার কোনো উপায়ই নেই। কাঠুরে ও মধু সন্ধানীরা বাধ্য হয়েই পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢোকে বটে, তাদের দল থেকে একজন দু'জন প্রায়ই ফেরে না। বাইরের লোকরা এভাবে জঙ্গলে ঢোকার অনুমতিই পাবে না। লঞ্চে চেপে নদীর দু' ধারের জঙ্গল দেখা আর সিনেমার জঙ্গল দেখা প্রায় একই রকম। সুন্দরবনের জলজঙ্গলের সঙ্গে যতটা সম্ভব নিবিড় পরিচয় নৌকোতেই হয়, তাতে রোমাঞ্চ আছে। সেই প্রথমবারেই নৌকো নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গভীর রাতে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। রাস্তা মানে, নদীপথ। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য নদী আর খাঁড়ি। কিছুতেই আর ফিরে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে শুনেছিলাম, বাঘের মুখে না পড়লেও ডাকাতের পাল্লায় যে পড়িনি তা আমাদের সাত পুরুষের ভাগ্য। ওখানকার ডাকাতরা

নৌকোটা তো নেয়ই, তাছাড়া জামাকাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়ে উলঙ্গ নৌকো-যাত্রীদের জঙ্গলের কিনারে নামিয়ে নিয়তির হাতে ছেড়ে দেয়।

সাতজেলিয়ার একটু আগে রাঙাবেলিয়া মোটামুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, সেখানে পরিচয় হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ঐ অঞ্চলে টেগোর প্রজেক্টের কর্ণধার তুষার কাঞ্জিলালের সঙ্গে। ফলে সুন্দরবনে আমার আস্তানার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরপর আমি নানা দিক দিয়ে সুন্দরবন গেছি, কিছুতেই সুন্দরবনের আকর্ষণ পুরনো হয় না।

আমি কোনোবারই সুন্দরবনে বাঘ দেখিনি, দেখতেও চাই না। জংলী জানোয়ার দেখার একটা উদগ্র বাসনা নিয়ে আমি কখনো জঙ্গলে যাইনি, এমনি যে-কোনো জঙ্গলে গেলেই শরীরে এক রকম মাদকতা বোধ হয়। তা সে যত ছোট জঙ্গলই হোক। তাছাড়া একবার আমি একটি জঙ্গলে গিয়ে এত জন্তু-জানোয়ার দেখেছি যে পেট ভরে গেছে। সারা জীবনে আর না দেখলেও চলবে। হয়তো শুনলে এখানে অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে যে আমি একসঙ্গে অন্তত পাঁচ সাত শো হরিণের ঝাঁক দেখেছি। খোলা আকাশের নিচে দশ ফুট দূরত্ব থেকে দেখেছি দশ-বারোটি সিংহ, দুটি লেপার্ড দু'দিক থেকে তাড়া করে হরিণ ধরছে এই দৃশ্য দেখেছি অনেকক্ষণ ধরে। হাতির পাল, গণ্ডার ও জিরাফ বহু। এমনকি রাত্তিরে আমার তাঁবুর পাশে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে জেব্রার পাল ভেবে উঁকি মেরে দেখি দুটি প্রকাণ্ড জলহস্তী। এসব সিনেমার দৃশ্য নয়। কল্পনাও নয়, এই সবই আমি দেখেছি কেনিয়ার মাসাইমারা অরণ্যে। এক সময় আমার মনে হয়েছিল, উঃ, যথেষ্ট হয়েছে, আর জন্তু-জানোয়ার দেখতে চাই না! তবে সেখানে অরণ্য বিশেষ ছিল না। এখানে আমি বিদেশের অরণ্যের প্রসঙ্গ আনছিও না।

সুন্দরবনে বাঘের চেয়েও অনেক বিপজ্জনক হচ্ছে সাপ। শীতকালের দু' মাস ছাড়া সুন্দরবনে সাপের ভয় সব সময়। যতবারই সাপ দেখি, বুক কেঁপে ওঠে,— বোধহয় সামনাসামনি কোন নরখাদককে দেখলেও এত ভয় পাবো না। একবার সুন্দরবনে একটি খামার বাড়িতে বসে সন্ধ্যেবেলা গল্পগুজব করছি, হঠাৎ একটু দূরে ধানক্ষেতে কিসের যেন একটা গোলমাল হলো। আমরা দৌড়ে গেলুম। একটি জোয়ান ছেলে আগাছা নিরোচ্ছিল। হঠাৎ তাকে সাপে কামড়েছে। ছেলেটি অত্যন্ত তেজী। তার ধারণা সাপটা ঠিক বিষ ঢালতে পারেনি, সে বাপ-মা তুলে গালাগাল দিতে দিতে

হাতের কাস্তেটা দিয়ে সাপটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো, তারপর হাসতে হাসতে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন দুপুরে আমরা নৌকো নিয়ে জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছি, রায়মঙ্গল নদী দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম ভেসে আসছে একটি কলার মান্দাস। তাতে মশারি টাঙানো, ফুলের মালা দিয়ে সাজানো, সামনে নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ আঁটা, মশারির মধ্যে সেই ছেলেটির শরীর, গতকাল সন্ধ্যেবেলা যাকে জলজ্যান্ত দেখেছিলুম!

তখনই মনে মনে শপথ করেছিলুম, আর কোনোবার গ্রীষ্মকালে সুন্দরবনে যাবো না। সে শপথ রক্ষা করা যায়নি, আরও কয়েকবার গেছি। সুন্দর রহস্যময় ঐ অরণ্যের যেন একটা নিজস্ব ডাক আছে।

'দা সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যান্টস' বইটি পড়ার পর আমি ভুল করেও কক্ষণো গাছের একটা পাতা ছিঁড়ি না। গাছ যে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, তা সত্যি সত্যি অনুভব করি এখন। গাছ মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে যত খুশী মাথা উঁচু করে, গভীর বনে কোনো অতিকায় শিমুল গাছ দেখলে মনে হয়, এই গাছের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখন জঙ্গলে গেলে যে-কোনো সুযোগেই কোনো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসি, মুনি-ঋষিদের মতন তপস্যা করি না বটে তবু কিছুক্ষণ চুপ থাকলেই মাথার মধ্যে শান্তি পাই।

বহু অরণ্যে ঘুরেছি, এখনও না দেখা রয়ে গেছে কত বনভূমি। জঙ্গলে গিয়ে কখনো সে রকম বিপদে পড়িনি, বরং অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে গাছেরাই নিঃশব্দ বার্তা পাঠিয়ে বাঁচিয়েছে।

একটা মজার ঘটনা দিয়ে শেষ করি। কয়েক বছর আগে আমাদের এক বন্ধু ও বৃক্ষলতাগুল্মতাত্ত্বিক শম্ভুলাল বসাক-এর সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার জঙ্গলে ঘুরছিলাম আমি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সমীর সেনগুপ্ত। নারায়ণপুর শহর থেকে একদিন একটা ভাড়া করা জিপে আমরা রওনা হলুম অবুঝমাড়-এর দিকে। কেন যে আমরা অবুঝমাড়ের দিকে যাচ্ছি, তার কোন কারণ নেই। অনেক জঙ্গল এর মধ্যেই ঘোরা হয়েছে। তবু আর একটি জঙ্গলে যাওয়া।

রাস্তাটি এত খারাপ যে কহতব্য নয়। কোথাও কোথাও রাস্তাই নেই।

মস্ত বড় বড় খাদ। কোথাও হাঁটু-গভীর নদী, তবু আমরা চলেছি অবুছ-মাড়ের দিকে। দু'পাশে নিশ্চিদ্র জঙ্গল, তাতে রয়েছে অনেক বাঁশঝাড় আমলকি গাছ, তেজপাতা ও লবঙ্গ গাছ। আরও বহু নাম না জানা গাছ। এমন কিছু কিছু ফুল, যা শম্ভুলালও চেনে না। কিছুক্ষণ পরে জিপটি গোলমাল করতে লাগলো। তাতে জিপটিকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, রাস্তার অবস্থার জন্য তার একটু আধটু বিদ্রোহ জানানো স্বাভাবিক। ড্রাইভারের ওপর জিপটিকে দুরস্ত করার ভার দিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরতে লাগলুম জঙ্গলের মধ্যে, প্রচুর আমলকি পাড়া হলো, হাসির আওয়াজে বন কাঁপানো হলো। তখনও আমরা ভাবতেই পারিনি যে জিপগাড়ির ড্রাইভারটি এক অতি আনাড়ি মেকানিক। সে সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলে ফেলে কিছুই আর ঠিক মতন লাগাতে পারছে না। জিপটি আগে যদি বা একটু আধটু চলছিল, এখন একেবারে অনড়, ইঞ্জিনও কোন শব্দ করে না।

জঙ্গলের মধ্যে বিকেল হতে না হতেই এক রকমের গাঢ় ছায়া নেমে আসে। অপ্সরাদের তখন ঝর্ণার জলে স্নান করার জন্য নেমে আসার সময়। তখন আমাদের খেয়াল হলো ফিরবো কী করে? যেখানে আমরা গাড়ি ভ্রষ্ট হয়েছি, সেখান থেকে অবুঝমাড় কুড়ি-বাইশ মাইল, নারায়ণপুরও সেই রকম দুরত্ব, মাঝখানে আর কোনো জনবসতি নেই। প্রথমে আমরা হেঁটেই ফিরে যাবো বলে বেশ মনের জোর নিয়ে হাঁটতে শুরু করলুম। এই পথে আমরা আর কোনো গাড়ি দেখিনি। তবে পায়ে-হাঁটা মানুষ কিছু দেখেছি। এরা সকালবেলা অবুঝমাড়ের থেকে রওনা দিয়েছে। সন্ধেবেলা নারায়ণপুরে পেঁছোবে, পরদিন হাটে যাবে। কিন্তু ওদের মতন কি আমরা হাঁটতে পারি? পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই রাস্তা। ঘণ্টাখানেক বীরদর্পে হাঁটার পর দেখা গেল আমরা আড়াই-তিন মাইলের বেশি যেতে পারিনি। এই গতিতে চললে আমাদের অন্তত সাত-আট ঘণ্টা লাগবে পেঁছোতে। তা-ও যদি একটানা সাত-আট ঘণ্টা হাঁটার সামর্থ্য থাকে। বোঝা গেল, সেটা অসম্ভব। রাত্তিরটা জঙ্গলেই কাটাতে হবে।

ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসছে। তখন খেয়াল হলো, এই জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার-টানোয়ার নেই তো? শক্তি একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলো, ভাই, এই জঙ্গলে বাঘ-টাঘ নেই তো? লোকটি খুব অবাক হয়ে উত্তর দিল, জঙ্গলে বাঘ থাকবে না তো কি শহরে থাকবে?

আমরা কাছাকাছি গোল হয়ে বসলুম। মাঝখানে জ্বাললুম আগুন। সঙ্গে অস্ত্র কিছু নেই, খাবার দাবারও নেই। কেন যেন আমরা ভেবে রেখেছিলুম, অবুঝমাড়ে পেঁছে আমরা সব কিছু পেয়ে যাবো। এখন আমাদের সারারাত পেটে কিল মেরে জেগে থাকতে হবে। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকি দেখলেও মনে হচ্ছে বাঘের চোখ। আবার জোনাকি বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। সত্যিই তো সে জঙ্গলে বাঘ আছে এবং ওদিককার ভাল্লুকগুলোও বড্ড হিংস্র। ব্যাপারটা বড্ড গল্প গল্প, অথচ সত্যি আমাদের জীবনে ঘটছে, এখনো যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

হাটের যাত্রীদের একজনের হাতে আমরা আমাদের বিপদের কথা জানিয়ে নারায়ণপুরের এস ডি ও-কে একটি চিঠি দিয়ে দিয়েছি। সেই লোকটি চিঠিটা দেবে কি না। কিংবা কখন দেবে, কিংবা এস ডি ও অন্য জায়গায় ট্যুরে গেছেন কি না। কিংবা আমাদের চিঠি পেলেও তিনি গুরুত্ব দেবেন কি না, এরকম অনেকগুলো অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিপদের ব্যাপারটা একেবারে তুচ্ছ করে সারা রাত হাসি ঠাট্টা করে কাটানোই ঠিক কাজ। কিন্তু তেমনভাবে হাসা যাচ্ছে না। বিপদের ঝুঁকিটা বড়ই বেশি। আকাশে জ্যোৎস্না নেই, জঙ্গল একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। একটা পাতা খসে পড়ার আওয়াজও ভয়ংকর মনে হয়।

খানিকবাদে পেলাম একটা যান্ত্রিক আওয়াজ, এবং গাড়ির আলো। সারাদিন সে রাস্তায় আমরা আমাদের জিপ ছাড়া দ্বিতীয় গাড়ি দেখিনি, এই গাড়িটার আলোও আসছে রাস্তা দিয়ে নয়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। আমরা হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়ালুম। সেটা একটা বাঁশ বোঝাই ট্রাক, জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ের চূড়ায় প্রচুর বাঁশঝাড় আছে। এই ট্রাকটি সেই বাঁশ আনতে যায় দিনে একবার। আমাদের দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হলো না, ট্রাক ড্রাইভারটি আমাদের তুলে নিল। যে-রাস্তায় জিপ চালানোই শক্ত, সে রাস্তায় অতবড় একটা ভারি ট্রাক চালানো যে কত বিপজ্জনক তা বলে বোঝাতে হবে না। আমরা ড্রাইভার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখানে প্রত্যেক দিন ট্রাক নিয়ে আসেন, ফিরে যান কী করে? ড্রাইভার দার্শনিকের গলায় উত্তর দিল, মানুষ পয়সা রোজগারের জন্য কত কী-ই তো করে!

মাঝ রাস্তায় আমরা আর একটা জিপের দেখা পেলুম, সেটি এস ডি ও

পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের উদ্ধারের জন্য প্রচুর বন্দোবস্ত। তবু নারায়ণপুরে ফিরে আসবার পর আমাদের মনে হলো, সারা রাত জঙ্গলে কাটালেই বোধহয় বেশ হতো! এখনো আমরা দেখা হলেই আলোচনা করি। বস্তারের ঐ জঙ্গলে আবার ফিরে যেতে হবে, আগুন জ্বেলে একটা রাত কাটানো হবে ওখানে!

১০

আমার বাবার একসঙ্গে তিনটে হাত-ঘড়ি পকেটমার হয়ে যায়।

এক একজন মানুষের ঘড়ি ব্যবহার করার কোনো মানেই হয় না। সময় তাঁদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী চলে। যেমন আমার বাবা। তাঁর সময় জ্ঞানের সঙ্গে কিছুতেই আমরা তাল দিতে পারতুম না।

সকালবেলা যাতে আমরা তাড়াতাড়ি পড়তে বসি, সেইজন্য বাবা আমাদের ডেকে দিতেন। আচমকা ঘুম ভেঙে শুনতাম, বাবা ধমক দিয়ে ডাকছেন, এই নীলু, ওঠ্‌ ওঠ্‌, কত বেলা হয়ে গেল, পোনে ন'টা বাজে, এখনো পড়তে বসার নাম নেই!

ধড়মড় করে উঠে কোনোক্রমে চোখে মুখে জল দিয়ে দেখতাম, দেয়াল ঘড়িতে বাজে ছটা দশ! আমাদের দেয়াল ঘড়িটি বেশ বিশ্বস্ত, তা ছাড়া রোদও সেইরকম নরম। বাড়িয়ে বলার একটা সীমা তো আছে, ছটা দশের জায়গায় বাবা সাতটা বলতে পারতেন, তা নয় একেবারে পোনে নটা! রাত্রি-বেলা পড়তে পড়তে ঘুমে চোখ ঢুলে এলে বাবা বলতেন, মাত্র সাতটা চল্লিশ বাজে, এর মধ্যেই ঘুম! আসলে তখন বাজে ঠিক দশটা। বিকেলে খেলা-ধুলোর পর ঠিক সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে আমাদের বাড়ি ফেরার নিয়ম। একদিন এক বন্ধু তার বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল, সেখানে আমাকে কুকুরে কামড়ালো, তাই নিয়ে খুব হুলস্থূল, সুতরাং বাড়ি ফিরতে দেরি হলো বেশ। রাস্তায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। বুক দুরু দুরু করছে। নির্ঘাৎ আটটা সাড়ে আটটা বাজে। দরজা খুলেই বাবা কড়া গলায় বললেন, বারোটা বাজতে পাঁচ, বাকি রাতটা বাড়ির বাইরে কাটিয়ে এলেই পারতি!

রাউণ্ড ফিগারের বদলে খুচরোয় বলতেন বলেই বাবার সময়-জ্ঞাপন

হঠাৎ শুনে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতো।

বাবা যে হাত-ঘড়িটি পরতেন, সেটি অবশ্য সময় দিত নিখুঁত। সেটা তাঁর বিয়ের সময়কার ঘড়ি। অন্য কেউ সে ঘড়িতে হাত দিলেই চটে যেতেন। আমরা হাত পাকাতুম দেয়াল ঘড়িটায়। পুরোনো আমলের এই ঘড়ি ডাকবার আগে দু'বার খ-র-র-র, খ-র-র-র শব্দ করে। যেন হাইজাম্প দেবার আগে কয়েক পা ছুটে আসার মতন। যদিও ঘড়িটার গায়ে সাঁটা এক টুকরো কাগজে হাতে লেখা ছিল সোমবার, তবু আমরা ভাই-বোনরা যার যখন খুশী দম দিয়ে দিতুম। ঘড়িটির পেন্ডুলামের খোপের দরজাটা ঠিক মতন বন্ধ করা যেত না, ওটা যখন তখন খুলে যেত। সেই জন্য ঐ ছোট্ট খোপটা প্রথম দিকে টিকটিকি, পরের দিকে চড়ুই পাখিদের খুব প্রিয় জায়গা ছিল। এক একদিন হতো কি, ঘড়িটা খ-র-র-র, খ-র-র-র করার পর আর টং টং করে বাজতো না। তখনই আমরা বুঝতুম, ভেতরে কেউ ঢুকেছে। একদিন ঐ অবস্থায় তদন্ত করতে গিয়ে আমার মুখের ওপর দুটো ইঁদুর লাফিয়ে পড়েছিল।

বড় দেয়াল ঘড়িটা মেরামতি বা অয়েলিং-এর তোয়াক্কাই করতো না। কিন্তু সেবার ইঁদুর-অভিযানের ফলে ঘড়িটিকে দোকানে পাঠাতেই হলো। তারপর দিনকতক আমাদের বাড়িতে বাবার হাত ঘড়িই ভরসা। তখন বাবা ইচ্ছে মতন দিনকে রাত, রাতকে দিন করে দিতে পারতেন। রবিবার দিন সাধারণত একটু দেরিতে খাওয়া দাওয়া হয়, বাড়িতে আড্ডা বসে, কিন্তু এক রবিবার বাবা হঠাৎ সকাল দশটার সময় ভাত খাওয়ার জন্য তাড়া লাগালেন। ঘড়ি দেখে বাবার মনে হয়েছিল, সেই দিনটা সোমবার!

বাবার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাঁর হাত ঘড়িটিও এক সময় বিচিত্র ব্যবহার শুরু করলো। যখন তখন শ্লো বা ফাস্ট হয়ে যায়। এমনকি এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা পর্যন্ত। রাস্তার লোক, কটা বাজে? জিজ্ঞেস করে সেই ঘড়ি দেখে আঁতকে আঁতকে উঠতো। একবার নাকি একটি কলেজের ছাত্র ঐ ঘড়িতে সময় দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। বাবার সহকর্মীরা বলতে শুরু করলেন, এবারে ঘড়িটা সারান, ওরকম ঘড়ি হাতে রাখার চেয়ে না রাখাই তো কম বিপজ্জনক! বাবা গম্ভীরভাবে বলতেন, দেবো, দেবো, সময় পাচ্ছি না।

অর্থাৎ ঐরকম দামি ঘড়ি তো পাড়ার ছোটখাটো দোকানে সারাতে দেওয়া

যায় না। সাহেবপাড়ায় অর্থাৎ পার্ক স্ট্রিটে একটি ঘড়ির দোকান বাবার চেনা আছে, সেই দোকানে এখনো একটি সাহেব ঘড়ি-মিস্ত্রির বসে, তাঁকে ছাড়া বাবা আর কারুর হাতে ঘড়ি দিতে ভরসা পান না। সাহেবটি বুড়ো হলেও ঘড়ির ব্যাপারে একেবারে ধন্বন্তরি। এবং তার ব্যবহার অতি অমায়িক। বাবার মুখে সেই সাহেবের গুণপনার বর্ণনা শুনে মনে হতে পারতো যে তিনি একেবারে সাক্ষাৎ ডেভিড হেয়ারের বংশধর। বাবার দু'জন সহকর্মী তাঁদের দুটি অচল ঘড়ি দিয়ে বললেন, তাহলে আপনি যেদিন যাবেন, আমাদের এ দুটোও সারিয়ে আনবেন।

একটা শুভদিন দেখে বাবা একদিন বাসে চেপে রওনা হলেন পার্ক স্ট্রিটের উদ্দেশে। যেহেতু তিনটি রিস্ট ওয়াচ এবং তিনটিই খারাপ, একসঙ্গে হাতে পরা যায় না, সেইজন্য ঘড়ি তিনটিকে একটা রুমালে পুঁটুলি বেঁধে পকেটে রাখলেন বাবা। বাসের পকেটমারদের পক্ষে সেই পুঁটুলিটা তুলে নেওয়া তো অতি সহজ কাজ।

আমি যতবারই আমার বন্ধু বান্ধবদের বলতে গেছি যে আমার বাবার রিস্টওয়াচ পকেটমার হয়েছিল। সবাই আমার ভাষায় ভুল ধরতে চেয়েছে। কিন্তু এই হলো হাত-ঘড়ি পকেটমারের রহস্য।

সেই সময় বেশ কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে কোনো ঘড়ির পাটই ছিল না। সময়ের সেই নৈরাজ্যে আমরা কিন্তু বেশ আনন্দেই ছিলুম, রোদ্দুরের রঙ পাল্টানো ও রাত্রির শব্দ শুনেই আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারতুম প্রহরের হিসেব।

ছেলেরা সাধারণত প্রথম হাত ঘড়িটা বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। আমার ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি। সেই রিস্টওয়াচ চুরি যাবার পর বাবা একটি গোল পকেট ঘড়ি কিনেছিলেন। পকেটমারদের ওপর রাগ করে আবার ফের পকেটেই ঘড়ি রাখার যে কী মানে হয় তা আমরা বুঝিনি।

আমি প্রথম ঘড়ি পরি একটি লটারিতে জিতে। বাড়ির কাছে চিলড্রেন্স পার্কে একজন লোক বিক্রি করতো হজমি-চুরান। দশ পয়সা দিয়ে অনেক-গুলি প্যাকেটের মধ্যে তুলে নিতে হতো যে-কোনো একটি। এর মধ্যে এক একটা প্যাকেটের মধ্যে থাকতো একটি করে উপহার। একটা পেতলের আংটি বা পাঁচটা বেলুন বা কানের দুল। একবার সেইরকম একটা প্যাকেটে আমি পেয়েছিলুম একটা প্লাস্টিকের ঘড়ি। কাঁটা না ঘুরলেও ঘড়িটি বেশ সুদৃশ্য

ছিল। কিন্তু পরদিনই স্কুলে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু একটান মেরে সেই ঘড়িটা ছিঁড়ে দেয়, তারপর ঝগড়া, মারামারি, একেবারে রক্তারক্তি পর্যন্ত। সেইদিনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে আমার ভাগ্যে কোনোদিন ঘড়ি সইবে না।

কলেজ জীবনে একটা পরীক্ষার পর আমি একটি জ্যান্ত ঘড়ি উপহার পাই। ঘড়িটি উপহার দেন আমার এক মামা। আমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মাও আমাকে সেই সময় পাঁচ-দশ টাকা করে উপঢৌকনও দিয়েছিলেন। ফার্স্ট সেকেণ্ড হবার ব্যাপার কিন্তু নয়, আমি স্রেফ পাশ করেছিলুম বলে। এঁরা সকলেই নাকি দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন আমার ফেল-সংবাদ শোনার জন্য।

মামার দেওয়া ঘড়িটি বেশ ভালো জাতের, দেখতে শুনতেও চমৎকার। আমার ছোটকাকা অবশ্য বলেছিল, তুই ও ঘড়ি নিয়ে কী করবি, ওটা আমায় দিয়ে দে, তার বদলে তোকে আমি একটা পকেট নাইফ দিচ্ছি। কিন্তু ছুরির বদলে ঘড়ি বিনিময় করতে আমি রাজি হইনি। মঞ্চে অনেক অভিনেতা যেমন তাদের হাত দুটোকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না, আমারও বাঁ হাতটা নিয়ে সেই অবস্থা হয়েছিল কিছুদিন। হাতটা ঝুলিয়ে রাখলে মনে হয় ঘড়িটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। হাতটা ওপরে তুলে রাখলে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ঘড়িটা অবশ্য আমার সঙ্গে বেশিদিন সহবাস করেনি। একদিন দক্ষিণ কলকাতা থেকে এক বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি অনেক রাতে। দোতলা বাসের ওপরে বেশ ভালো বসার জায়গা পেয়ে গেলুম। বেশ গুরু-ভোজন হয়ে গেছে, হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুরে, জানলার পাশে মাথাটা রাখতেই ঘুমে চোখ ঢুলে এলো।

এক সময় কে যেন ডাকলো, এই যে দাদা, উঠুন! উঠুন! কী ঘুম রে বাবা!

চোখ মেলে দেখি চার পাশে ঘুরঘুটে অন্ধকার। পাশে ছায়ার মতন একটা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে। প্রথমে বুঝতেই পারলুম না আমি কোথায় আছি, তারপর মনে পড়লো বাসে···কিন্তু বাস তো চলছে না, এটা তো রাস্তা নয়!

বাসটা চলে এসেছে পাইকপাড়ার গ্যারাজে। কণ্ডাক্টরবাবু আমায়

জাগিয়ে দেননি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি কে জানে। বাইরে থেকে আমার কনুইটা দেখতে পেয়ে গ্যারাজের নাইট গার্ড আমায় ডাকতে এসেছে।

কটা বাজে তা দেখবার জন্য বাঁ হাতের কব্জি ঘোরাতেই দেখলুম সে জায়গাটা ফাঁকা! অমনি বুকের মধ্যে জয়ঢাক বাজতে লাগলো।

আমার ঘড়ি? আমার ঘড়ি? বলে দু' চারবার চ্যাঁচামেচি করতেই নাইট গার্ড টর্চ জেবলে সিটের নিচগুলো একটু খুঁজে দেখলো। তারপর আমাকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বললো, এত রাত্রে ঘড়ি কোথায় পাওয়া যাবে! দেখুন গে, বাড়িতেই ফেলে এসেছেন।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, না, না, বাসে ওঠার সময়ও আমার হাতে ঘড়ি ছিল! এই দেখুন প্রমাণ!

অনবরত ঘড়ি পরলে সেই জায়গাটায় হাতের রোমগুলো ইট চাপা ঘাসের মতন হয়ে যায়। নাইট গার্ড টর্চের আলোয় আমার হাতটা পরীক্ষা করে আমার কথা মেনে নিতে বাধ্য হলো। তারপর বললো, কে খুলে নিয়ে গেছে। আর ভেবে কী হবে?

কিন্তু ঘড়ি ছাড়া আমি বাড়ি যাবো কী করে? একবার যেন মনে হলো, এই নাইট গার্ডই আমার ঘড়িটা খুলে লুকিয়ে রেখে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

সেই মর্মে একটু সামান্য ইঙ্গিত করতেই ধমক খেলুম। লোকটি হঠাৎ গলার আওয়াজ বদলে বললো, আপনার ঘড়ি হারিয়েছে তো আমরা কী করবো? থানায় গিয়ে রিপোর্ট করুন। গ্যারাজের মধ্যে আপনি বে-আইনি ভাবে ঢুকেছেন, তা জানেন?

পাইকপাড়া বাস ডিপো থেকে দু' পা বাড়ালেই থানা। সেখানে আমার অভিযোগ জানাবার আগেই এক উদ্ভট সংবাদ শুনলাম। ঐ বাস ডিপো এই থানার আণ্ডারে নয়। সুতরাং ওখানকার কোনো ঘটনা এই থানা শুনতেই রাজি নয়! একজন এস আই হাসতে হাসতে বললো, রাস্তার ওপরে যদি আপনার ছেনতাই হয়, কিংবা কেউ আপনাকে খুন করতে আসে, তা হলেও আপনাকে যেতে হবে কাশীপুর থানায়। সেখানেই চলে যান।

এত রাত্তিরে আমি কাশীপুর থানা চিনবো কী করে? চড়ে বসলুম একটা রিক্সায়। মনে হলো যেন অনেক দূরের পথ। আকাশের চেহারা দেখে মনে হয় মাঝ রাত। এই সময়েও থানায় বেশ ভিড় এবং পুরোদস্তুর

কাজকর্ম চলছে। এরই মধ্যে দারোগাবাবু বেশ আড্ডায় মেজাজে রয়েছেন। আমার কাহিনী শুনে তিনি বেশ উপভোগের সঙ্গে অট্টহাসি করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, এমন ঘুম, অ্যাঁ ? ঘড়ি খুলে নিয়ে গেল ? অ্যাঁ ? কে দিয়েছিল ঘড়ি ?

হঠাৎ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করবেন, নম্বর কত ?

বুঝতে আমার বেশ সময় লাগলো। এই প্রথম আমি জানতে পারলুম, গাড়ির মতন ঘড়িরও নাকি নম্বর থাকে, এবং ঘড়ির মালিকরা সেই নম্বর নোট বইতে লিখে রাখে। আমি সেরকম কিছু লিখে রাখিনি, সুতরাং ঘড়ির মালিক হবার যোগ্যতা আমার নেই।

আরও কিছুক্ষণ হাসাহাসির পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে, কী ঘড়ি ছিল ? খুব দামি ? কোন্ কোম্পানির।

আমি নিশ্চুপ।

তিনি আবার ধমক দিয়ে বললেন, কী ঘড়ি ছিল, বলুন! নাকি সেটাও জানেন না ?

থানার পরিবেশে আমার মাথা ঘুরে গেছে। আমার কী ঘড়ি ছিল তা তো আমি ভুলে গেছি, কোনো ঘড়ির নামই আমার মনে আসছে না। আমার মনে পড়ছে পার্কার, সেফার্স, পাইলট, ওয়াটারম্যান…। এমন বিপদে বোধহয় জীবনেও পড়িনি।

হাসিও যে মানুষকে তাড়া করতে পারে তা সেদিন জানলুম। দারোগা-বাবুর হাসির তাড়া খেয়ে ল্যাজ গুটোনো শিয়ালের মতন পালিয়ে বেঁচে-ছিলুম সেদিন।

তারপর থেকে আমি আর ঘড়ি পরবোই না ঠিক করেছিলুম। কিন্তু ঘড়ি আমাকে অনেক বিপাকে ফেলেছে। সেই ঘটনার পর থেকে আমি রাস্তায় ঘাটে প্রচুর লোককে আমার ঘড়ি হাতে পরে ঘুরতে দেখেছি। বিশেষত একাধিক বাস কণ্ডাক্টরের হাতে টিসট্। এবং তারা আমার দিকে আড়চোখে তাকায়। চোরকে আমি চিনি না, কিন্তু চোর নিশ্চয়ই আমাকে চিনে রেখেছে।

আমার এক মামাতো বোনের বিয়ে হলো দিল্লির এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে। নতুন জামাইবাবু তার শ্যালক-শ্যালিকাগোষ্ঠীর পনেরোজনকে একদিন নেমন্তন্ন করলেন এক দামি হোটেলে। এত সুসজ্জিত হোটেলে আমি আগে

কখনো ঢোকিনি। সেখানকার বেয়ারাদের মস্তক-সজ্জা পাঠান সৈনিকদের মতন।

তিনখানা টেবিল জোড়া দিয়ে আমরা সবেমাত্র বসেছি, তক্ষুনি আমার চোখে পড়লো আমার ঠিক পায়ের কাছেই পড়ে আছে একটা ঘড়ি। স্টিলের ব্যাণ্ড, সোনালি রং, নির্ঘাৎ টিসট্। ঘড়িটি শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, তার বুকটা যেন বৈদুর্যমণির মতন জ্বলছে। প্রথম দর্শনেই মনে হলো, আমার জিনিস ফিরে এসেছে আমার কাছে। বাস কণ্ডাক্টরদের মিথ্যে সন্দেহ করেছিলুম, এ অনেক বড় দরের চোরের কাজ, যারা এইসব রেস্তোরাঁয় হরদম খেতে আসে। নিয়তি নির্বন্ধে আজই সেটা চোরের হাত থেকে খসে পড়েছে।

একটু নিচু হয়ে আমি অনায়াসে ঘড়িটা তুলে নিতে পারতুম। কিন্তু তাহলেই সবাই ওটা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। আমার ঘড়িই যে আমার কাছে ফিরে এসেছে এটা কি সবাই বিশ্বাস করতে চাইবে? বিশেষত নতুন জামাইবাবুকে বেশ সন্দেহপ্রবণ মানুষই মনে হয়, উনি আবার ব্যারিস্টার! সুতরাং আমার উচিত হচ্ছে হাত থেকে একটা কিছু জিনিস ফেলে দিয়ে সেটা তোলার অছিলায় টপ করে ঘড়িটা তুলে পকেটে ভরে ফেলা। তবে, এক্ষুনি যদি একটা লোক এসে বলে, আমার ঘড়ি? আমার ঘড়ি? মুখের ভাবেই আমি ধরা পড়ে যাবো।

পা দিয়ে চেপে রাখলুম ঘড়িটি। ইত্যবসরে খাওয়া দাওয়া চলতে লাগলো। আমার চটি ভেদ করে, পায়ের শিরা উপশিরা বেয়ে সেই রিস্টওয়াচের টিকটিক শব্দ উঠে আসতে লাগলো ওপরে, আমার বুকে সেই শব্দ যেন দামামা বাজাচ্ছে। সকলেই কি তা শুনতে পাচ্ছে। সবাই চাপা গলায় কথা বলছে কেন? কেউ হাসছে না। আমার দিকে কেউ সরাসরি তাকাচ্ছে না। সৈনিকের মতন পোশাক পরা বেয়ারারা মাঝে মাঝেই আমার পিঠের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে কেন? কী দেখছে তারা? একটু বাদেই এসব সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমি মন দিলুম খাওয়া দাওয়ায়। কেউ কিছু লক্ষ্য করেনি, ঘড়ি খুঁজতে কেউ এলো না।

প্রায় একঘণ্টা বাদে সবাই যখন উঠছে তখন আমি জুতো পরতে বেশি সময় নিলুম। আমি সবার শেষে। ঘড়িটা তুলে নেওয়ার এই-ই সুবর্ণ সুযোগ। শেষ মুহূর্তে আমি পা দিয়ে ঘড়িটাকে ঠেলে দিলুম অনেক দূরে।

নিজের কাছে নিজেকে সৎ প্রমাণ করে বেশ একটা বাহবা নেওয়া গেল সঙ্গোপনে আর এই উপলক্ষে সময়কেও একখানা লাথি কষানো গেল।

আমার জীবনে দ্বিতীয় ঘড়িটি আসে অতি অযাচিতভাবে। কফি হাউসে আমার এক বন্ধুর বন্ধু একদিন আমার কাছে হঠাৎ কুড়ি টাকা ধার চাইলো। আমার পকেটে সেদিন ঠিক বাইশ টাকা ছিল বলে ধার দিতে কোনো অসুবিধেই হলো না। ছেলেটিকে আমি কম চিনি, কিন্তু সে এমন ভাবে চেয়েছিল যাতে মনে হয়, তার খুবই দরকার।

এর দিন পনেরো বাদে ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা হলো একটা আড্ডায়। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মাঝ পথে অন্য কথা থামিয়ে বলে উঠলো, ও তুমি তো আমার কাছে কুড়ি টাকা পাবে, ভুলেই গিয়েছিলুম। আমি লজ্জা পেলুম বেশ। আমার চোখে কি মহাজনসুলভ একটা ভাব ফুটে উঠেছিল? এইরকম সময়ে যা বলতে হয়, আমি মাথা নিচু করে বললুম, না, না, ওর জন্য ব্যস্ত হবার কী আছে?

ছেলেটি পকেট থেকে হাত বার করে বললো, তুমি ঘড়ি পরো না? তুমি এটা নাও!

ঝট করে সে নিজের মণিবন্ধ থেকে ঘড়িটা খুলে ফেললো। আমার ঘোরতর আপত্তি কিছুই সে শুনতে চায় না, সে শুধু বলে, তার চার-পাঁচটা ঘড়ি আছে। শুধু শুধু বাড়িতে পড়ে থাকে! অন্য বন্ধুরাও তাল মিলিয়ে বলতে লাগলো, নিয়ে নে, পাচ্ছিস যখন…!

বাধ্য হয়ে ঘড়িটা আমার হাতে গলাতে হলো। মনে মনে ঠিক করে রাখলুম, খানিকবাদে কোনো ছুতোয় ওটা ফেরত দেবো! কুড়ি টাকার বদলে একটা রিস্টওয়াচ? সেকেন্ড হ্যান্ড ঘড়ি যত সস্তাই হোক, কুড়ি টাকায় হতে পারে না!

কিন্তু সে ঘড়ি আর আমার ফেরত দেওয়া হলো না। সেদিনটা তালেগোলে কেটে গেল, তারপর দিন সাতেক কফি হাউসে সেই ছেলেটিকে আমি দেখতেই পেলুম না। তখন ঠিক করলুম, তার বাড়িতে গিয়ে ঘড়িটা পেঁছে দিয়ে আসবো। আজ যাই, কাল যাই করতে করতে একদিন জানা গেল, ছেলেটি দিল্লি চলে গেছে একটা চাকরি নিয়ে।

ঘড়িটিকে প্রথম থেকেই আমি অপছন্দ করেছিলুম। ওটার দিকে তাকালেই গ্লানি বোধ হয়। যেন একটা অন্যায় করেছি। অথচ আমার

কোনো দোষ আছে ? একটা জলজ্যান্ত ঘড়ি রাস্তায় ফেলেও দেওয়া যায় না প্রাণে ধরে। বাড়িতেও দু-একটা ছোটখাটো মিথ্যে কথা বলতে হলো ওর জন্য।

ঘড়িটা চলে কিন্তু ঠিকঠাক। চেহারাটা শৌখিন নয়, বরং গাঁট্টাগোঁট্টা মজবুত ধরনের। এক আধদিন দম দিতে ভুলে গেলেও হাঁপিয়ে যায় না। বন্ধু বান্ধবরা যারা ঘটনাটা জানে, তারা আমার হাতে ঘড়িটা দেখলে বাঁকা ভাবে হাসে, ভাবখানা এই, দারুণ দাঁও মেরে ঘড়িটা বাগিয়েছিস। আবার ওটা বাড়িতে ফেলে রাখলেও মা বলেন, ঘড়িটা পরিস না কেন, কিনেছিস যখন…। মাঝে মাঝে আমার হর্ষবর্ধনের মতন হয়ে গিয়ে সব কিছুর সঙ্গে ঘড়িটাও বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। ঘড়িটা খুলে দোলাতে দোলাতে বলি, কে নেবে ? কে নেবে ? কেউ রাজি হয় না।

আমার এক মাসতুতো দাদা দুর্গাপুরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাবে, আমাকে বললো, তোর ঘড়িটা আমায় কদিনের জন্য দিবি ? আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। আমার দাদার স্বভাব আমি জানি, আমি নিজে বারবার না চাইলে ও ঘড়ি আর কোনোদিন ফেরৎ দেবে না।

এর পর কয়েকটা দিন খুব ফুরফুরে, হালকা সময় কাটতে লাগলো। শরীরের ওপর কোনো চাপ নেই, হাত দুখানিই স্বাধীন। কোনো ধরা বাঁধা ব্যাপার নেই, যখন যেখানে খুশী যাওয়া যায়। ঘড়ি না থাকার এত সুখ !

কিন্তু এই সুখ আমার বেশিদিন সইলো না। আমার মাসতুতো দাদা একদিন নিজে থেকে আমার ঘড়িটা ফেরত দিয়ে গেল, তাও অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে। কী ব্যাপার ? আমার সেই দাদা একটা সাবানের ক্যাপসান লেখা ও ও চিত্রতারকাদের মুখ চেনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল, ফোর্থ প্রাইজ হিসেবে একটা হাতঘড়ি উপহার পেয়েছে। খবরের কাগজে সাবান বা সেলাইকলের ঐ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখি বটে। কিন্তু কোনো জ্যান্ত মানুষ যে ঐ ক্যাপসান লেখে কিংবা সত্যিই পুরস্কার পায় সে সম্পর্কে আমার ধারণাই ছিল না। মানুষ কত কী পারে, মানুষ এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে, বিজ্ঞাপন দেখে সাবানের ক্যাপসানও লেখে !

কিছুদিন পর আমি গেলুম আসামে বেড়াতে। ডিগবয় শহরটির নাম শুনলেই আমার সায়েন্স ফিকশানের কথা মনে পড়তো। যেন সাঙ্ঘাতিক কোনো রোমহর্ষক ব্যাপার ওখানে যখন তখন ঘটতে পারে। গিয়ে দেখলুম

পাহাড়ের গায়ে বেশ নিরিবিলি ছিমছাম শহর। আশ্রয় পেলাম এক সজ্জন পরিবারে, সেখানে প্রচুর খাতির যত্ন, আমার জন্য একটা আলাদা ঘর, নানা-রকমের খাওয়া-দাওয়া, গাড়িতে দূর দূর জঙ্গল-পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বেড়াতে যাওয়া। ঘড়িটা রাত্তিরে খুলে রাখি বিছানার পাশে। এক সকালে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি ঘড়িটি নেই। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। তারপর পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সে অনুপস্থিত। একজন ঢ্যাঙা চেহারার লোক আমার ঘরে খিদমদগারি করে, ওর হাতে ঘড়িটি বেশ ভালো মানাবে। পাছে সে লজ্জা পায় তাই আমি তার চোখে চোখ ফেলি না পর্যন্ত।

কিন্তু সে বাড়ির গিন্নির প্রখর নজর। গোয়েন্দা বিভাগে যদি শুধু মহিলাদের নিয়োগ করা হতো, তাহলে টপাটপ সব অপরাধীরা ধরা পড়ে যেত। বিকেলবেলা বেড়াতে বেরুচ্ছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে ঘড়ি ছিল না? ঘড়ি পরেই তো এসেছিলে—। আমি বললুম, আছে···সব সময় পরি না···। পরদিন সকালে উঠেই তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘড়িতে দম দাও তো? কই, ঘড়িটা কোথায়? আমি আমতা আমতা করে বললুম, আছে কোথাও, ঠিক যে কোথায় রেখেছি, মনে পড়ছে না···পরশুদিন জঙ্গলে গিয়ে বোধহয়···। তিনি আমার কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করলেন না, বাড়ির পেছন মহলে গিয়ে কাকে যেন খুব বকাবকি করতে লাগলেন। আবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি আমার সেই শ্রীমান ঘড়ি ফিরে এসে যথাস্থানে জ্বলজ্বল করছে।

ইচ্ছে হলো ঘড়িটাকে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারি। এমন অমর গোঁয়ার ঘড়ি আর কেউ দেখেছে! একবার ভাবলুম, ঘড়িটা যে চুরি করেছিল, তাকেই ডেকে দান করে দিই। কিন্তু বাড়ির গিন্নি নির্ঘাৎ আপত্তি করবেন। ডিগবয় থেকে চলে আসার দিনে শেষ মুহূর্তে ঘড়িটা খুলে রেখে এলাম আমার ভূতপূর্ব ঘরের টেবিলে। গাড়ি ছাড়বো ছাড়বো এমন সময় গৃহকর্ত্রী বললেন, আবার ঘড়ি ফেলে যাচ্ছো, আচ্ছা ভুলো মন তো তোমার!

প্লেনের জানলা যদি খোলা যেত তা হলে আমি আকাশে ছুঁড়ে মারতে পারতুম ঘড়িটা। আকাশই তো ওদের জায়গা। তবে একটা ভয় ছিল, ঘড়িটাকে ঐভাবে তাড়াবার চেষ্টা করলে নির্ঘাৎ ওখানেই প্লেন ক্র্যাশ হতো এবং আমার পঙ্গু শরীরে অনুগত ভৃত্যের মতন ফিরে আসতো ঐ ঘড়ি।

এর পর আমি ঐ ঘড়ি হাতে দিয়ে নদীতে সাঁতার দিয়েছি, বেহালায় এক

বাগান বাড়িতে পিকনিক করতে গিয়ে কাঁচা আম পাড়ার জন্য ওটাকে ঢিল হিসেবে ব্যবহার করেছি, কিন্তু ওর কোনো লয়-ক্ষয় নেই। ঘড়ি তো আর পুরাতন ভৃত্য নয় যে কোনো এক সময় হঠাৎ স্মল পক্সে মারা যাবে। পুরো দাম দিয়ে কিনলেও এ ঘড়ির নষ্ট হবারং বা চুরি যাবার ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকতো, কিন্তু এ যে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। কুড়িটা টাকা মানুষের যখন তখন খরচ হয়ে যায়, কিন্তু তার বিনিময়ে পাওয়া ঘড়ি আমাকে একেবারে মরণ কামড়ে আঁকড়ে ধরে রইলো। আর সেই যে সেই ছোকরা দিল্লি চলে গেল, তারপর তার পাত্তাই নেই!

তখন আমি ওকে সোজা পয়জনে মারবো ঠিক করলুম। সুযোগ পেলেই দম দেওয়া বন্ধ করে দি। দেখি ও না খেতে পেয়েও কতদিন বাঁচে। দু' তিন দিনের জন্য বাইরে গেলে তো দম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওরও জেদ সাংঘাতিক। তিন দিন পরে দম দিলেও আবার বেশ চলতে শুরু করে। কোনো প্রতিবাদ নেই। কোনো কলকব্জায় জং ধরার সাহসই পায় না।

এর পর একটা কাণ্ড হলো, তাতে আমার কোনো হাত নেই। অল্প-চলন্ত বাস থেকে নামতে গিয়ে একদিন আছাড় খেয়ে পড়লুম রাস্তায়। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর দেখলুম, আমার ঘড়ির কাঁচটা নেই, একটা কাঁটাও নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে দুটি পাওয়া গেল না।

তবু এক কাঁটাতেই সেই ঘড়ি দিব্যি চালু রইলো। ছোট কাঁটাটা রয়েছে, তাতে দিব্যি সময় বোঝা যায়। মরতে ও কিছুতেই রাজি নয়। এ অবস্থাতে ঘড়িটি বাবার চোখে পড়লো। আমি এক কাঁটার ঘড়ি হাতে দিয়ে আছি, এটা যেন সাংঘাতিক একটা পাপ কাজ। সুতরাং বাবা ওটা সারিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন, তাঁর চেনা পার্ক স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত দোকানে। অতি সাবধানে গিয়ে সেটি জমাও দিয়ে এলেন একদিন। দিন পনেরো বাদে বাবা এক সন্ধেবেলা কাচুমাচু মুখে আমাকে একটা অত্যন্ত সুসংবাদ দিলেন। পার্ক স্ট্রিটের সেই ঘড়ির দোকানটা নাকি হঠাৎ উঠে গেছে। কাছাকাছি লোকেরা কোনো খবরও দিতে পারেনি। ও ঘড়ি আর পাবার আশা নেই।

তবু আমার আশঙ্কা ছিল, সাহেব জাতের নীতিবোধ বড় কড়া, দোকান উঠে গেলেও বুড়ো সাহেব হয়তো বাড়ি বয়ে এসে ঘড়ি ফেরত দিয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটলো না।

অনুশোচনায় পীড়িত হয়ে বাবা আমাকে একটি নতুন ঘড়ি কিনে দিলেন। আমি যথেষ্ট আপত্তি করেছিলুম, কিন্তু মা আর বাবা দু'জনেই ধরে নিলেন সেটা আমার অভিমান। নতুন ঘড়িটা তো শুধু ঘড়ি নয়, সেটা একটা যন্ত্র-দানব। তাতে শুধু চব্বিশ ঘণ্টার হিসেব নয়, তার ওপর রয়েছে তারিখ ও বার। এবং সে ঘড়িতে দম দেবার দরকার নেই, হাতে পরে থাকলেই হলো। সে ঘড়ি নিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই আমার একেবারে নাজেহাল অবস্থা।

কোনো মাস তিরিশ দিনে, কোনো মাস একতিরিশ দিনে। যেই এক-তিরিশ দিনে মাস হলো অমনি আমার হাল ফ্যাসানের ঘড়িতে দিন আর তারিখের সব গোলমাল হয়ে গেল। কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথা ঘুরে যাবার মতন অবস্থা। একেই সময়ের তাল সামলানো শক্ত, তার ওপরে দিনও ভুল, তারিখও ভুল। ঘড়ি দেখেই যদি দিন আর তারিখ জানতে হবে, তা হলে ক্যালেণ্ডার রাখার কী দরকার!

এই ঘড়িতে চাবি দিতে হয় না বটে, কিন্তু দিনে দশ-বারো ঘণ্টা হাতে পরে থাকতে হয়। কী জ্বালা! ছুটির দিনে আমি বাড়ি থেকে বেরুলাম না, শুধু পা-জামা পরে খালি গায়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে আরাম করবো, তার উপায় নেই, হাতে ঘড়ি পরে থাকতে হবে। হাত-কড়া বাঁধার সঙ্গে তফাত কী? প্রতিদিন হিসেব রাখতে হবে দশ-বারো ঘণ্টা, হিসেবে কমতি হয়ে গেলে বাথরুমেও ঘড়ি হাতে দিয়ে পুষিয়ে নিতে হবে। অন্য যে কোনো কাজ থেকে তিন চারদিন ছুটি নেওয়া যায়, কিন্তু ঘড়ির হাত থেকে ছুটি নেই। সাধারণ ঘড়ি আট দশ দিন পরে দম দিলেও আবার চলতে শুরু করে কিন্তু এই সব ঘোরালো ধরনের ঘড়ি চলতে শুরু করলেও সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র সব ওলোট পালোট করে দেবে। সোমবারকে করে দেবে শনিবার। মাসের আঠাশ তারিখকে করে দেবে এক তারিখ।

স্নেহ-মমতা দিয়ে জড়ানো সময় বড় দ্রুত পালিয়ে যায়। ন্যায্য দাম দিয়ে কেনা ঘড়ি বেশিদিন এক জায়গায় স্থির থাকে না। আমার এই আদিখ্যেতাপূর্ণ ঘড়িটিও একটি ট্রেন জার্নি'র সময় উধাও হয়ে গেল। কী করে গেল তা আমি জানি না। সম্ভবত আমাকে অপছন্দ করে ডানা মেলে নিজেই উড়ে চলে গেল যোগ্য কোনো হাতে।

অমন দামি একটা ঘড়ি হারিয়ে ফেলার জন্য বাবা আমাকে আর ঘড়ি

কিনে দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। আমিও বেঁচে গেলুম।

তারপর থেকে আমি ঘড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখি নি। সুখী জীবন ও বন্ধু লাভের উপায় আমি নিশ্চিত জেনে গেছি। আমি এখন খাঁটি ভারতীয়। আমি আজকাল ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাই, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত রোদ্দুরের রং বদল লক্ষ্য করি, শীত-গ্রীষ্মের ছোট-বড় রাত্রি-দিন অনুভব করি শরীর দিয়ে।

কয়েক শতাব্দী ধরেই ঘড়ি তৈরি করার জন্য সুইসরা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। কেউ একজন মন্তব্য করেছিল, সেইজন্যই সুইজারল্যান্ড সময়ের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। আমার ঘড়ির সঙ্গে আড়ি, সেইজন্য সময়ের স্রোতে যখন তখন হাবুডুবু খেতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

১১

কৌতূহল বশে এক রবিবার বাংলা কাগজের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটি পড়ে দেখলুম। প্রথমেই আশ্চর্য হলুম এই দেখে যে পাত্র ও পাত্রীদের চাহিদার মধ্যে সমতা নেই। প্রতিটি বিবাহেই একজন নারী ও একজন পুরুষ তো লাগবেই, কিন্তু পাত্রী চাইয়ের বিজ্ঞাপনের তুলনায় পাত্র চাইয়ের বিজ্ঞাপন প্রায় ছ'গুন বেশি। অর্থাৎ শতশত কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকেরা ব্যাকুলভাবে পাত্র চাইছে, এখনও বাঙালি পরিবারে ছেলের বিয়ের চেয়ে মেয়ের বিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনেক বাবা-মাকে বলতে শুনেছি, মেয়েটার বিয়ে না দিয়ে শান্তিতে মরতেও পারবো না! যেন, কোনো কন্যা সারাজীবন অপরিণীতা থাকলে মহা অনর্থ ঘটে যাবে। এদেশে এখনও ছেলেরাই শুধু বিয়ে করে, আর মেয়েদের বিয়ে হয়।

পাত্রী চাইয়ের পঞ্চাশটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে অন্তত পঁয়তাল্লিশটিতে প্রায় একই রকম কন্যা চাওয়া হয়েছে, শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা, গৌরাঙ্গী, লম্বা। কোথাও কোথাও 'ঘরোয়া' বিশেষণটিও যুক্ত হয়েছে, এর মানেটি ঠিক বোঝা গেল না। যে-মেয়ে একা একা রাস্তায় বেরুতে ভয় পায়, তাকেই কি ঘরোয়া বলে? তাহলে সে উচ্চশিক্ষিতা হবে কী করে? স্কুল-কলেজে

মামা-কাকা বা দারোয়ানের সঙ্গে গেছে ? ছেলেরা উচ্চশিক্ষা করলে তাদের গৃহকর্ম শিখতে হয় না, কিন্তু মেয়েরা এম-এ পড়লেও তাদের রান্নাবান্না শিখতে হবে ! পঞ্চাশটির মধ্যে মাত্র পাঁচটি বিজ্ঞাপনে ফর্সা বা গৌরাঙ্গী এরকম শব্দ নেই। তাঁরা কি লিখতে ভুলে গেছেন ? যত উঁচু চাকরি, তত দাবি বেশি। গভঃ উ. প. কর্মচারী বা যাঁরা গেজে-অফি, তাঁরা চান 'প্রকৃত সুন্দরী' ও 'উজ্জ্বল গৌরবর্ণা'। কয়েকজন লিখেছেন, 'অসবর্ণে আপত্তি নাই', এইটুকুই যা সামাজিক অগ্রগতির চিহ্ন পাওয়া গেল। সারা পৃথিবীর চোখে আমরা ভারতীয়রা একটি কালো জাতি। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ জওহরলাল নেহরুও কালো, উত্তরপ্রদেশের কোনো খানদানি মুসলমানও কালো। আমাদের দেশে যে যতই নিজেকে ফর্সা মনে করুক, সাহেবদের চোখে সে কালো ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু আমরা নিজেদের কালো বলে মেনে নিতে পারি না, ফর্সা রঙের প্রতি আমাদের একটা তীব্র হ্যাংলামি আছে। শ্বেতাঙ্গ জাতি বহুবার আমাদের কালো বলে অবজ্ঞা করেছে, তবু আমরা ওদের গা ঘেঁষাঘেঁসি করার জন্য লালায়িত। শিকাগো শহরে একজন নিগ্রো সাংবাদিক একবার আমাকে চরম শ্লেষের সঙ্গে বলেছিল, আমি দেখেছি ভারতীয়রা অনেকেই এদেশে পড়াশুনো করতে এসে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে, আজ পর্যন্ত কেউ কি একটিও কালো মেয়ে বিয়ে করেছে ? কোনো ভারতীয় আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় না। তোমরাও বুঝি নিগ্রোদের ঘেন্না করো ?

আমি উত্তর দেবার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলুম। আমেরিকায় নিগ্রোদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতে কত বক্তৃতা, কত প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। নিহত মার্টিন লুথার কিং-এর নামে লেখা হয়েছে কত কবিতা। মার্টিন লুথার কিং নিজেকে গান্ধীজীর শিষ্য বলতেন, অথচ মহাত্মা গান্ধীর নিজের দেশের লোকেরা কালোদের সঙ্গে মেশে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ নীতির আমরা কঠোর সমালোচক, সারা পৃথিবীকে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তি দেবার আন্দোলন চালাচ্ছি, অথচ নিজেদের দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরে আমরা আরও নিকৃষ্ট ধরনের বর্ণবিদ্বেষী। আফ্রিকার প্রায় সব কটি দেশ থেকে এখন যে ভারতীয়দের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার কারণ ভারতীয়রা কক্ষনো সেখানকার কালো মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেনি। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সাহেবদের

পা চাটে এবং স্থানীয় নিরীহ কালো মানুষদের নির্লজ্জভাবে ঠকায়, এবং এখনও ঠকিয়ে চলেছে, এ আমার নিজের চোখে দেখা।

বিলেত-আমেরিকার কোনো স্কুলের বাইরে যদি নোটিস ফেলে যে "শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য", তাহলে আমরা দারুণ অপমানিত বোধ করি, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই, কিন্তু আমরা খবরের কাগজে যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞাপন ছাপাতে পারি যে শুধু ফর্সা পাত্রীই বিবাহযোগ্যা। ভারতীয়দের মতন এমন ভণ্ড জাতি বোধহয় ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয়টি নেই।

কেন আমাদের এই ফর্সা-প্রীতি? আমরা নিজেদের এখনও আর্যদের বংশধর মনে করি বলে? কিসের আর্য আমরা? প্রকৃত আর্য চেহারা এই ভারতীয় উপ-মহাদেশে আছে শুধু কাবুলিওয়ালাদের।

আমাদের প্রাচীন কাব্য সাহিত্যে শুধু গৌরবর্ণা নারীদের রূপের বর্ণনাতেই যত রাজ্যের ছন্দ-অলংকারের ব্যবহার। অনেকের ধারণা, কালিদাস বুঝি কালো মেয়েদের গৌরবান্বিত করেছেন একটি শ্লোকে: তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী...ইত্যাদি। এখানে 'শ্যামা' কথাটির মানে কী কালো? শ্যামা ও শ্যামবর্ণার মধ্যে অনেকখানি তফাত আছে। শ্যামা শব্দের অর্থ এই রকম:

"শীতে সুখোষ্ণ সর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখ শীতলা
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভ সা শ্যামা পরিকীর্তিতা।"

অর্থাৎ যে রমণীর শরীর শীতকালে স্পর্শ করলে সুখকর উষ্ণ মনে হয়, আর গ্রীষ্মকালে স্পর্শ করলে মনে হয় মনোরম শীতল, সেই তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা নারীই শ্যামা নামে পরিচিতা। মহাকবি কালিদাস একটি মাত্র শব্দে শুধু তপ্তকাঞ্চন বর্ণের কথাই বললেন না। খানিকটা শৃঙ্গার রসেরও ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন।

একটি কালো মেয়ের অসাধারণ বর্ণনা আছে বাণভট্টের কাদম্বরীতে। একটি চণ্ডাল কন্যা, সে যেন অসুরদের কাছ থেকে অমৃত হরণ করার সময় বিষ্ণুর সেই ছদ্মবেশে মোহিনী মূর্তি, সে যেন ইন্দ্রনীল মণিতে গড়া একটি চলন্ত পুত্তলী; তার নীল কঞ্চুকের ওপর রক্তিমাভ অবগুণ্ঠন, যেন নীল পদ্মের বনে এসে পড়েছে অপরাহ্নের বর্ণচ্ছটা, যেন সে কিরাতবেশিনী ভবানী, যেন সে স্বয়ং লক্ষ্মী। নারায়ণের বক্ষলগ্না বলেই শ্যামবর্ণা, যেন বলরামের

ভয়ে পলায়নে উদ্যতা যমুনা নদী···ইত্যাদি। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই রমণী চণ্ডাল কন্যা, উচ্চবংশীয়া নয়।

আমাদের দেবীরা সবাই দুধে-আলতা রঙের, একমাত্র কালী ছাড়া। কালী মূর্তি ভয়ংকারী ও শক্তিদায়িনী, কিন্তু রূপসী বলে খ্যাতি নেই। আমাদের দেশে এখনও আদর্শ নারী বলতে বোঝায়, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। অবশ্য সরস্বতী যে ব্যভিচারিণী তা অনেকের মনে থাকে না। আমাদের সমস্ত কাব্য-পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রটি ফর্সা নয়। দ্রৌপদীর তুল্য রমণী পৃথিবীর সাহিত্যেও আর আছে কী? ট্রয়ের হেলেন, অযোধ্যার সীতাও দ্রৌপদীর তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ। মহাভারতের এতবড় একটা যুদ্ধ যতটা ভূমি দখলের জন্য, তার চেয়েও বেশি কি দ্রৌপদীর জন্য নয়? পাঁচজন স্বামীকে নিয়ে অবলীলাক্রমে সংসার করেছেন যিনি, তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত প্রেমিকের সংখ্যাও কম নয়। মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণ তাঁর সখা, বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ তাঁর ব্যর্থ প্রেমিক, দুর্যোধনও তাঁকে কামনা করেছিলেন, জয়দ্রথ তাঁকে হরণ করেছিলেন, কীচক তাঁর জন্য মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছিলেন। এতগুলি পুরুষের মস্তক ঘূর্ণিত করেছিলেন যে বরবর্ণিনী ও তেজস্বিনী, তিনি কিন্তু ছিলেন সচ্চরিত্রা, তবু তিনি ভারতের আদর্শ নারী নন। একালের হীনবল পুরুষেরা বোধহয় দ্রৌপদীর মতন নারীকে ভয় পায়। মানুষের রূপ তার গায়ের রঙে নয়, শরীরের গঠনেও নয়, তার চরিত্রে। তার মানসিক গঠনের। আমাদের দেশে কালোর তুলনায় ফর্সার সংখ্যা কম বলেই ফর্সা রং প্রথমে আমাদের চোখ টানে। টানা টানা চোখ ও চোখা নাক নারী পুরুষের সংখ্যাও কম বলে প্রথম দর্শনে সুন্দর মনে হয়। সিনেমা-থিয়েটারে এই জন্যই আমরা ফর্সা, টিকালো নাক ও টানা টানা চোখের নট-নটী দেখতে চাই, কারণ, তারা ব্যতিক্রম, তাদের শুধু আমরা চোখে দেখি, তাদের সঙ্গে আমরা জীবন কাটাই না। কিন্তু বাস্তব জীবনে যে কোনো নারী বা পুরুষের যদি নিজস্ব একটা চরিত্র না থাকে, একটা ভেতরের সৌন্দর্য না থাকে, তবে তাদের বহিরঙ্গ রূপের কোনো মানেই নেই। ওঃ, কত তথাকথিত সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে দু'দিন আলাপের পরেই আমার অসহ্য লেগেছে। ধরা যাক, কোনো মেয়ের গায়ের রং একেবারে যুঁই ফুলের মতন, মুখখানি যেন কুমোরটুলীর শিল্পীদের বানানো, ঠোঁট দুটি টুসটুসি ইত্যাদি। কিন্তু তার যদি অহংকারে নাক উঁচু ও চোখ দুটি আধ খোলা

থাকে, সে যদি অন্যদের সম্পর্কে ঠোঁট বেঁকিয়ে নিজের সুরে কথা বলে আর কাঁচের গেলাসে জল খাবার সময় তার যদি দাঁতের মাড়ি দেখা যায়, তাহলে তার সঙ্গে কি দশ মিনিটের বেশি সময় কাটানো যায় ? এমনকি মঞ্চে বা পর্দাতেও নিখুঁত কোনো রূপসীর অভিনয়ে যদি ব্যক্তিত্ব ফুটে না ওঠে, তার রূপের বদলে গুণের প্রকাশ না পাই, তা হলে তাকেও তো সহ্য করা যায় না। মনে হয় কাঠের পুতুল! বিউটি কনটেস্টে যারা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা হয়, তাদের অধিকাংশই সিনেমার নায়িকা হিসেবে ব্যর্থ!

ছাত্র বয়েসে আমি কোনারক মন্দিরের সুরসুন্দরী মূর্তির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম দারুণ ভাবে। তখন কড়াকড়ি বিশেষ ছিল না, আমরা কয়েক বন্ধু মন্দিরের গা বেয়ে বেয়ে উঠে গিয়েছিলাম প্রায় চূড়ার কাছে। অনেক ওপরে সেই পূর্ণাবয়ব মূর্তি, তার ঠোঁটের হাসির দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারিনি। আমার আজও মনে হয়, মোনালিসার হাসির চেয়েও সুরসুন্দরীর হাসি অনেক বেশি রহস্যময়। সেই সুরসুন্দরীর প্রেমে পড়ার পর প্রায় বছর খানেক বাদে আমি শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় এক যুবতীকে দেখে চমকে উঠি। অবিকল যেন সেই সুরসুন্দরী জীবন্ত হয়ে এসেছে, মুখে সেইরকম হাসি। ভিড়ের মধ্যে তাকে আমি হারিয়ে ফেললাম, কাছে যাওয়া হলো না। অনেকদিন মনে সেই দুঃখ পোষা ছিল। সেই মেয়েটি কালো না ফর্সা ছিল ? তা তো আমার মনে পড়ে না। সুরসুন্দরী কালো না ফর্সা! আমি এ জীবনে যে-ক'জন প্রকৃত সুন্দরী দেখেছি, তাদের মধ্যে অন্যতমা হলো ধলভূমগড়ের আদিবাসী মেয়ে ফুলমণি।

এলিজাবেথ টেলরের চেয়ে তার নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি। অবশ্য ফুলমণির গায়ের রং দোয়েল পাখির মতন বলেই সে বেশি রূপসী নয় এবং এলিজাবেথ টেলরের গায়ের রং তুষার শুভ্র হওয়াটাই কোনো খুঁত নয়।

আমি বোধহয় বর্ণকালা, যে-সব মেয়েদের মধুর ব্যবহার, সারল্য, প্রতিভা কিংবা আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হই, তাদের গায়ের রং ফর্সা না কালো, তা আমি বুঝতেই পারি না। আমাদের দেশে কালো মেয়েদের বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে অনেক। এখন কি সেই অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে ? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখলে তো মনে হয়, সম্বন্ধ করা বিয়েতে কালো মেয়েদের বিশেষ মূল্য নেই! পণ নেওয়া যেমন বেআইনী হয়েছে সেই রকমই পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে গায়ের রঙের উল্লেখ

করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। এটা আমাদের সমাজের কলঙ্ক। কোনো কোনো কালো মেয়েকে দেখেছি, তাদের গায়ের রঙের জন্য একটা হীনমন্যতা বোধ আছে। তাদের দোষ নেই, ছোটবেলা থেকে নানা লোকের মুখে গঞ্জনা শুনে শুনে তাদের মনে একটা ছাপ পড়ে যেতে পারে। কারুর কারুর মুখে একটা তিক্ততার ছাপ পড়ে যায়, শরীরেরও যত্ন নেয় না তারা। গায়ের রং নিয়ে মানুষ জন্মায়, কিন্তু শরীরটা ইচ্ছে মতন গড়ে নেওয়া যায়। আজকাল মেয়েরা ইচ্ছে করলে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল না হয়েও জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। বিয়ে করাটাই তাদের জীবনের মোক্ষ হবে কেন? কালো মেয়েদের জীবনে হতাশাই বা আসবে কেন, তাদের সামনে তো দ্রৌপদীর আদর্শ রয়েছে?

আবার ফর্সা হয়ে জন্মানোটাও দোষের কিছু নয়। ফর্সা মেয়েদেরও দুঃখিত হয়ে থাকবার দরকার নেই। অনেক কালো মেয়ে অসাধারণ সুন্দরী হয় বটে, আবার ফর্সা মেয়েরাও সুন্দরী হতে পারে, যদি তারা নিজেদের গায়ের রঙের কথাটা ভুলে যেতে পারে। যে মেয়ে রূপের অহংকার করার বদলে পরিপূর্ণ নারীত্বের অহংকার করতে পারে, সে-ই সত্যিকারের সুন্দর।